ইসলামী ফিক্‌হের ঐতিহাসিক পটভূমি

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামী ফিক্‌হের ঐতিহাসিক পটভূমি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী

ইসলামী ফিক্‌হের ঐতিহাসিক পটভূমি

অনুবাদ
আবদুল মান্নান তালিব

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

ইসলামী ফিক্‌হের ঐতিহাসিক পটভূমি

বি আই এল আর এল এ সি-১৩

ISBN : 978-984-33-3069-3

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৪
সফর ১৪৩৬

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২- ৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
Web : www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ সেন্টার

মুদ্রণ
নিউ সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

দাম : ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) US $ 15

ISLAMI FIQHER OITIHASHIK PATABHUMI (Islami Fiqh ki Tarikhi Pase Manzar), written by Moulana Muhammad Taqi Amini, translated by Abdul Mannan Talib and Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh, Phone : 02-9576762, Mobile : 01761-855357
Price : Tk. 350, US $ 15

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী আইন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর-এ ব্যাপারে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের মধ্যে কোন সংশয়ের অবকাশ না থাকলেও বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার ধারক-বাহকগণ এ ব্যাপারে সংশয় পোষণ করেন। তাদের এই সংশয় অজ্ঞানতা বশত এবং অগভীর চিন্তার ফসল। বস্তুবাদী চিন্তার নিরীখে তৈরী আইন যে সর্বক্ষেত্রে সকল মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে না, এর নজীর সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে নিয়ে অন্তত হিজরী একাদশ শতাব্দি পর্যন্ত ইসলামী আইনের সর্বজনীন কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা অব্যাহত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে শিল্পবিপ্লবের ঢেউ সারা বিশ্বে আছড়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে তুরস্ক কেন্দ্রিক মুসলিম শাসনব্যবস্থায় অচলাবস্থা দেখা দেয়। সেই সাথে ইজতিহাদ তথা আইন গবেষণা কাজেও ভাটা পড়ে এবং স্থবিরতা দেখা দেয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার হয় গোটা মুসলিম বিশ্ব। অমুসলিম শাসকদের নিস্পেষণের শিকার হন মুসলিম স্কলার ও ইসলামী আইন। স্তিমিত হয়ে পড়ে ইসলামী আইনের ইজতিহাদী গবেষণা। এর ফলশ্রুতিতে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে ইসলামী আইনের উজ্জীবনী শক্তি। অথচ মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম-এর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-ইসলামী আইন কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং সকল মানবতার জন্যই এই আইন আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত।

ইসলামী ফিকহ ও উসূলে ফিকহ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় যে কয়টি পাঠ্যপুস্তক অনূদিত হয়েছে সেগুলোর বিন্যাস ও আলোচনা যথেষ্ট জটিল ও দুর্বোদ্ধ। তা ছাড়া আরবী মাধ্যমে পড়ুয়া ছাড়া এগুলোর মর্মোদ্ধার অনেকের পক্ষেই কঠিন। এ বিষয়টি সামনে রেখে উপমহাদেশের প্রখ্যাত গবেষক-আলিম মাওলানা তাকী আমিনী কর্তৃক রচিত "ইসলামী ফিক্হ কি তারিখী পাছে মানজার" গ্রন্থটি "ইসলামী আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি" নামে বঙ্গানুবাদ প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। ইসলামী সাহিত্যাঙ্গনের অন্যতম দিকপাল মরহুম মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব এটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। তিনি এ কাজটি করেছিলেন প্রায় তিন দশক আগে। অনেক দিন অতিবাহিত

www.pathagar.com

হওয়ার কারণে অনেক জায়গায় পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার দুরূহ ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশের লক্ষ্যে সম্পাদনার নামে পাণ্ডুলিপি এভাবে মসিলিপ্ত করা হয় যে, অপসম্পাদনার কবল থেকে পুনরুদ্ধার করে তা প্রকাশের জন্য আবদুল মান্নাত তালিব নিজেই কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁর পক্ষে বেশীদূর এগুনো সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে ল' রিসার্চ সেন্টার-এর ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শহীদুল ইসলাম তার উস্তাদের কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন সংস্থার গবেষণা কর্মকর্তা শাহাদাৎ হুসাইন খান। এরা দুজন কুরআন-হাদীসসহ গ্রন্থে উল্লেখিত উদ্ধৃতি গুলো যাচাই করে তথ্যসূত্র বস্তুনিষ্ঠ করার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ফলে গ্রন্থটি প্রকৃত অর্থেই উসূলে ফিক্হের একটি বস্তুনিষ্ঠ ডকুমেন্টারি ও সহজবোধ্য গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষায় উসূলে ফিক্হের গ্রন্থের তালিকায় এটি একটি যুগান্তকারী সংযোজন।

কোন মূলনীতির আলোকে আধুনিক সমস্যাবলীকে ইসলামের আলোকে সমাধান করতে হবে এবং আইন রচনা ও গবেষণার পদ্ধতি ও পন্থা কী হবে, সুন্দরভাবে এ গ্রন্থে তা বিবৃত হয়েছে। ফিকহী পরিভাষাগুলোর অনুবাদের ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিব যে দক্ষতা ও প্রাজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা নিঃসন্দেহে তার উঁচুমানের পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। এ গ্রন্থ আইন, ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী ফিক্হের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং গবেষক ও ইসলামী আইন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সকলমহলের জন্যেই উপকারী একটি অনন্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ্ তা'আলা লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন-এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ইসলামী শরীয়তের চৌহদ্দির মধ্যে ইসলামী ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের উৎপত্তি ও বিকাশ ইসলামের সত্যতারই প্রমাণ পেশ করে। ইহুদী রাব্বীগণ তাওরাতের বিধানগুলোর অনর্থক যেসব চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাওরাতকে বাস্তবে অকার্যকর করার তৎপরতা চালিয়েছিলেন, কুরআন মজীদ-এর নিন্দা করে। মূলত ইসলামী ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের বিকাশের পেছনে তেমন কোনো তৎপরতা বা ভাবধারা দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যই এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। তাছাড়া যে বিধান প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে দুনিয়ার সব এলাকার বহু মানুষের একমাত্র সত্য ও জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাকে অতীত শতাব্দীগুলোর মতো অবশ্যই সব যুগের মানুষের সব ধরনের সমস্যার সমাধান পেশ করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের বিকাশ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সম্প্রসারণের আর এক নাম। এ বিকাশই চৌদ্দশো বছর পরেও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধানকে মানব জীবনে প্রয়োগের ধারা অব্যাহত রেখেছে। বিগত কয়েকশো বছর থেকে ফিক্‌হে ইসলামীর মৌলিক ইজতিহাদের ধারা বিশুষ্ক রয়ে গেছে। বিশেষ করে গত দু' তিনশো বছরে এই ধারার উপধারাগুলোও শুকিয়ে মরা ও মজা নদীর রূপ নিয়েছে। কিন্তু এই মরা ও মজা নদীতে আজ জোয়ারের প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ এবং দেশে দেশে ইসলামকে একটি সচল ও গতিশীল জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমরা আজ সক্রিয়। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসার আগ্রহ তাদের মধ্যে দিনের পর দিন প্রবলতর হচ্ছে। ইসলামী জীবন বিধান অনুশীলনের ক্ষেত্রে অতীতের কয়েক শতাব্দীর অনুসৃত কার্যক্রম সম্পর্কে মিল্লাতে ইসলামিয়ার

www.pathagar.com

সদস্যদের যথার্থ উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। অতীতের এই কার্যক্রমই মিল্লাতের বর্তমান মূলধন।

অতীতে ইসলামী ফিক্‌হের বিকাশধারা, বিশেষত এই বহমান ধারা প্রসূত বিপুল ও বিচিত্র উপাদান ও উপকরণের সাথে বাংলাভাষী পাঠক সমাজের বলতে গেলে এ পর্যন্ত পরিচয়ই ঘটেনি। অথচ এদের সংখ্যা বিশ্ব মুসলিম জনসমষ্টির এক দশমাংশের কম নয়। একদিক দিয়ে এই অনবহিতি, অন্যদিকে অনৈসলামী জীবন ধারার সয়লাব এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার কথায় আতঙ্গের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই বাংলা ভাষায় ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে হলে বাংলাভাষী পাঠকের সামনে ইসলামী ফিক্‌হের অতীত ইতিহাস ও তার বিস্ত ারিত রূপ তুলে ধরতে হবে। সেই সাথে তার সক্ষমতা এবং যুগ সমস্যার সমাধানে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাবার আলোচনাও আসতে হবে।

এ বইটি এ ব্যাপারে একটি মাইলফলকের কাজ করবে বলে মনে করি। আশা করি এ বইটি পড়ার পর একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠক অনুভব করতে পারবেন কুরআন ও সুন্নাহ ইসলামী শরীয়তের এমন দু'টি প্রস্রবণ যার বারিধারা কোনো দিন শেষ হবেনা, ব্যাহতও হবে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যদি (কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উৎস থেকে) সঠিক পথ নির্দেশনা লাভ করতে পারে, তাহলে জীবন ক্ষেত্রে এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে না যার সমাধান করে সে জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ইনসাফকে সুনিশ্চিত করতে পারবে না।

গ্রন্থটির মূল লেখক মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী ভারতের আজমীরের মুঈনীয়া দারুল উলূম মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের একজন কৃতি আলেম ও প্রখ্যাত গবেষক। ইতোপূর্বে ফিক্‌হ, উসূলে ফিক্‌হ, ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর কিছু অত্যন্ত উঁচুমানের গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করে। গ্রন্থটি রচনায় তিনি ইসলামী দুনিয়ার বিগত সাত-আটশো বছরের মধ্যে প্রকাশিত এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠ রচনা ও গ্রন্থরাজির সাহায্য নিয়েছেন।

www.pathagar.com

অনুবাদের ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ রাখার চেষ্টা করেছি। পারিভাষিক শব্দগুলো সহজ বাংলায় রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং দৃষ্টি রেখেছি যাতে এ রূপান্তর দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিকটু না ঠেকে। পারিভাষিক শব্দগুলোর আরবী রূপও পাশাপাশি লিপিবদ্ধ করেছি। ইসলামী ফিক্‌হ সম্যক আত্মস্থ করতে চাইলে তার পরিভাষা আয়ত্ত করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ এগুলো ইসলামী বিধানের ব্যাখ্যা বিন্যাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও পারিভাষিক শব্দগুলোর অনূদিত রূপ অনেক ক্ষেত্রে সঠিক তাৎপর্য প্রকাশে সক্ষম হয় না, তবে পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ গ্রন্থের কলেবর সংযত রাখতে সাহায্য করে।

বাংলা ভাষার অঙ্গনে উসূলে ফিক্‌হের এমন যুথিবদ্ধ বিস্তারিত আলোচনামূলক গ্রন্থ হয়তো এটিই প্রথম। বাংলায় ইসলামী জ্ঞানের এই শাখার অনুশীলন খুব বেশী হয়নি বলে ভাষার দিক দিয়ে যে সীমাবদ্ধতা অনুভূত হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠা যথেষ্ট আয়াসসাধ্য ব্যাপার। বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এ দিকটা অবশ্য বিবেচনায় রাখবেন বলে মনে করি। আল্লাহ জাল্লা শানুহ এ প্রচেষ্টা সফল করুন, কবুল করুন। আমীন

আবদুল মান্নান তালিব
১৮০, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১.ভূমিকা ১৭

২. প্রথম অধ্যায় ২৫-৪২
২.১. ফিক্‌হের স্বরূপ ও তার অর্থের ক্রমসংকোচন ২৫
২.১.১. ফিক্‌হের স্বরূপ ২৫
২.১.১.১. আল-কুরআনে ফিক্‌হের ভিত্তি ২৭
২.১.১.২. হাদীসে ফিক্‌হের অর্থ ২৮
২.১.১.৩. হিকমত শব্দের অর্থ ৩০
২.১.১.৪. হিকমতের অধিকারীদের পর্যায় ও মর্যাদা ৩৪
২.১.২.১. প্রথম যুগে ফিক্‌হ ৩৫
২.১.২.২. প্রথম যুগে ফিক্‌হের অর্থ ৩৬
২.১.২.৩. ফিক্‌হের পরিধির ক্রমসংকোচন ৩৮
২.১.২.৪. সংকোচনের পর ফিক্‌হের সংজ্ঞা ৩৯

৩. দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৩-৬০
৩.১. ইসলামী ফিক্‌হের বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি ৪৩
৩.১.১. প্রথম যুগ : জীবনের মৌলশক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ ৪৩
৩.১.২. দ্বিতীয় যুগ : রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ৪৫
৩.১.৩. তৃতীয় যুগ : ফিক্‌হ সংকলনের ভিত্তি স্থাপন ৪৮
৩.১.৪. চতুর্থ যুগ : ফিক্‌হ লিপিবদ্ধ ও সংকলন ৫৪

৪. তৃতীয় অধ্যায় ৬১-২৪৮
৪.১. ফিক্‌হের উৎস ৬১

www.pathagar.com

৪.১.১. আল-কুরআন : ফিকহের প্রথম উৎস ৬৫-৯৬
৪.১.১.১. কুরআনী আহকামের সামগ্রিক রূপ ৬৮
৪.১.১.২. মারূফ ও মুনকারের ব্যাখ্যা ৬৯
৪.১.১.৩. তায়্যেবাত ও খাবায়েস ৭০
৪.১.১.৪. বোঝা (اصر) ও শিকলের (اغلال) ব্যাখ্যা ৭১
৪.১.১.৫. কুরআন মাজীদ নাযিলের সামাজিক পঠভূমি ৭৩
৪.১.১.৬. আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি ৭৫
৪.১.১.৬.১. প্রথম মূলনীতি : সংকীর্ণতা বর্জন ৭৫
৪.১.১.৬.২. দ্বিতীয় মূলনীতি : কষ্টের স্বল্পতা ৭৭
৪.১.১.৬.৩. তৃতীয় মূলনীতি : পর্যায়ক্রম ৭৯
৪.১.১.৬.৪. চতুর্থ মূলনীতি : নাস্‌খ (রহিতকরণ) ৮১
৪.১.১.৬.৫. পঞ্চম মূলনীতি : শানে নুযূল....................৮৪
৪.১.১.৬.৬. ষষ্ঠ মূলনীতি : হিকমত ও ইল্লাত-এর বিবেচনা.........৮৬
৪.১.১.৬.৭. সপ্তম মূলনীতি : আরবের সামাজিক অবস্থার জ্ঞান ৮৭

৪.১.২. সুন্নাত : ফিক্‌হের দ্বিতীয় উৎস ৯৭-১১৬
৪.১.২.১. সুন্নাতের সংজ্ঞা ৯৭
৪.১.২.২. সুন্নাত : নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারত তুল্য ৯৭
৪.১.২.৩. কুরআনে সুন্নাতের ভিত্তি ৯৮
৪.১.২.৪. সুন্নাতের ব্যাপারে সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি ৯৯
৪.১.২.৫. ইমামগণের দৃষ্টিভঙ্গি ১০০
৪.১.২.৬. সুন্নাতের ব্যাখ্যার কতিপয় ধরন ১০১
৪.১.২.৭. আইন প্রণয়নে সুন্নাতের স্থান অনুধাবনের উপায় ১০৮
৪.১.২.৮. রসূলুল্লাহ স.-এর উক্তিগুলোর প্রকারভেদ ১০৯
৪.১.২.৯. আইন প্রণয়নে (ফিক্‌হ) সুন্নাত সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়...১১১
৪.১.২.১০. হাদীস সংকলনে সতর্কতা ১১১

www.pathagar.com

৪.১.৩. ইজমা : ফিক্‌হের তৃতীয় উৎস..............................১১৭-১২৮
৪.১.৩.১. ইজমা'র অর্থ ও তাৎপর্য ১১৭
৪.১.৩.২. ইজমা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজন......................................১১৭
৪.১.৩.৩. কুরআনে ইজমা'র ভিত্তি ১১৮
৪.১.৩.৪. ইসলামের শূরা ব্যবস্থা ১১৯
৪.১.৩.৫. সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর কর্মপদ্ধতি ১২১
৪.১.৩.৬. ইজমা'র যৌক্তিকতা..১২১
৪.১.৩.৭. ইজমা'কারীদের যোগ্যতা..১২২
৪.১.৩.৮. কমপক্ষে তিন ব্যক্তির ঐকমত্য ইজমা' রূপে গণ্য.........১২৪
৪.১.৩.৯. ইজমা'র বাস্তব রূপ যুগের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল.......১২৫
৪.১.৩.১০. ইজমা'র পরিধি ১২৫
৪.১.৩.১১. ইজমা' ভিত্তিক ফায়সালার মর্যাদা...........................১২৬
৪.১.৩.১২. মৌন (সুকুতী) ইজমা'...১২৭
৪.১.৩.১৩. একটি বিভ্রান্তি ১২৮

৪.১.৪. কিয়াস : ফিক্‌হের চতুর্থ উৎস ১২৯-১৮০
৪.১.৪.১. কিয়াস-এর সংজ্ঞা ও তাৎপর্য.....................................১২৯
৪.১.৪.২. কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজন......................................১৩০
৪.১.৪.৩. কুরআনে কিয়াসের ভিত্তি ১৩২
৪.১.৪.৪. কিয়াসের বিরুদ্ধ মতবাদ ১৩২
৪.১.৪.৫. কিয়াস মূলত 'ইল্লাত নির্ভর ১৩৮
৪.১.৪.৬. হিকমত ও 'ইল্লাতের পার্থক্য ১৪২
৪.১.৪.৭. বুদ্ধির সাথে 'ইল্লাতের সম্পর্ক ১৪৪
৪.১.৪.৮. 'ইল্লাতের কাঠামো ১৪৫
৪.১.৪.৯. হিকমত ও 'ইল্লাত কীভাবে জানা যায় ১৪৭

www.pathagar.com

৪.১.৪.১০. কুরআনে বর্ণিত হিকমত ১৪৮
৪.১.৪.১১. সুন্নাতে হিকমতের উল্লেখ ১৫০
৪.১.৪.১২. হিকমত সন্ধানের পদ্ধতি ১৫১
৪.১.৪.১৩. 'ইল্লাত, শর্ত, কারণ ইত্যাদি চেনার পদ্ধতি..................১৫২
৪.১.৪.১৪. কুরআন ও সুন্নাহতে 'ইল্লাতের উল্লেখ........................১৫২
৪.১.৪.১৫. ইজমা'র মাধ্যমে 'ইল্লাত নির্ধারণ ১৫৯
৪.১.৪.১৬. ইজতিহাদের সাহায্যে 'ইল্লাত বের করার কতিপয় পদ্ধতি...১৫৯
৪.১.৪.১৭. ফকীহগণের বর্ণনাকৃত 'ইল্লাতের প্রকারভেদ ১৭২
৪.১.৪.১৮. 'ইল্লাতের প্রতিবন্ধকের বর্ণনা ১৭৪
৪.১.৪.১৯. কার্যকারণের বিধান ও তার প্রকারভেদ ১৭৫
৪.১.৪.২০. শর্তের বিধান ও প্রকারভেদ ১৭৬
৪.১.৪.২১. কিয়াসের শর্তের বর্ণনা ১৭৮
৪.১.৪.২২. কিয়াসের ক্ষেত্র ও হুকুম..১৮০

৪.১.৫. ইস্‌তিহ্‌সান : ফিক্‌হের পঞ্চম উৎস ১৮১-২০০

৪.১.৫.১. ইস্‌তিহ্‌সান-এর সংজ্ঞা ১৮১
৪.১.৫.২. ইস্‌তিহ্‌সানের গুরুত্ব ও প্রয়োজন ১৮১
৪.১.৫.৩. প্রাচীন আইনে ইস্‌তিহ্‌সান সদৃশ একটি নীতি ১৮৩
৪.১.৫.৪. কুরআনে ইস্‌তিহ্‌সান ১৮৪
৪.১.৫.৫. হাদীসে ইস্‌তিহ্‌সান ১৮৫
৪.১.৫.৬. সাহাবীগণের কার্যধারায় ইস্‌তিহ্‌সানের প্রমাণ..............১৮৫
৪.১.৫.৭. ইস্‌তিহ্‌সানের চারটি ভিত্তি..১৮৬
৪.১.৫.৮. চার প্রকার ইস্‌তিহ্‌সান ১৮৮
৪.১.৫.৯. ইস্‌তিহ্‌সানের বিরোধিতা..১৯৯

www.pathagar.com

৪.১.৬. **ইস্তিস্লাহ্ বা মাসালিহ্ মুরসালা : ফিক্‌হের ষষ্ঠ উৎস**..২০১-২০৮
৪.১.৬.১. ইস্তিস্লাহ্-এর সংজ্ঞা..২০১
৪.১.৬.২. মাসালিহে মুরসালার শর্তাবলী ২০২
৪.১.৬.৩. মাসাহিলে মুরসালার সাথে সম্পর্কিত 'ইল্লাতের বিবরণ...২০৩
৪.১.৬.৪. ইসতিসলাহ্-এর ব্যাপারে ফকীহ্ ইমামগণের অবস্থান ২০৫
৪.১.৬.৫. মাসালিহে মুরসালাহ ব্যবহারের স্থান ২০৮

৪.১.৭. **ইস্তিদ্লাল : ফিক্‌হের সপ্তম উৎস** ২০৯-২১৮
৪.১.৭.১. ইস্তিদ্লাল -এর সংজ্ঞা..২০৯
৪.১.৭.২. ইস্তিদ্লালের কয়েকটি রূপ.......................................২০৯
৪.১.৭.৩. অভিমত প্রমাণের কতিপয় পদ্ধতি ২১৮

৪.১.৮. **পূর্ববর্তী শরীয়ত : ফিক্‌হের অষ্টম উৎস** ২১৯-২২৬
৪.১.৮.১. উৎস হিসেবে পূর্ববর্তী শরীয়ত................................২১৯
৪.১.৮.২. কুরআন হাকীমে-এর প্রমাণ....................................২১৯
৪.১.৮.৩. পূর্ববর্তী শরীয়ত সম্পর্কে ফকীহগণের মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ...২২০
৪.১.৮.৪. ইসলামী ফিক্‌হ কি অন্যান্য ধর্মীয় আইন থেকে গৃহীত?...২২১
৪.১.৮.৫. ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু অনুকরণের ব্যাপারে ইসলামী নীতি...২২৩

৪.১.৯. **তা'আমুল : ফিক্‌হের নবম উৎস** ২২৭-২৩০
৪.১.৯.১. কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ.................................২২৮
৪.১.৯.২. ফকীহগণের মত ২২৯

৪.১.১০. **স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের অভিমত : ফিক্‌হের দশম উৎস** ২৩১-২৩৪
৪.১.১১. **'উরূফ ও রেওয়াজ : ফিক্‌হের একাদশ উৎস** ২৩৫-২৪২
৪.১.১১.১. 'উর্ফের সংজ্ঞা...২৩৫
৪.১.১১.২. আদত-এর সংজ্ঞা..২৩৬

www.pathagar.com

৪.১.১১.৩. ফকীহগণের কাছে 'উর্ফের মর্যাদা ২৩৭
৪.১.১১.৪. 'উরফের ওপর নির্ভর করার বিস্তারিত রূপ.................২৩৯
৪.১.১১.৫. মানুষের গড়া আইনে 'উরফের অবস্থান ২৪০
৪.১.১১.৬. 'উরফ ও রেওয়াজের আরো কতিপয় রূপ ২৪১

৪.১.১২. দেশজ আইন : ফিক্‌হের দ্বাদশ উৎস ২৪৩-২৪৬
৪.১.১২.১. দেশজ আইনের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. কী করেছিলেন? ..২৪৩
৪.১.১২.২. ভিনদেশের মুসলিমদের সংস্পর্শ- তাদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ ২৪৪
৫. উপসংহার ২৪৭

৬. চতুর্থ অধ্যায়...২৪৯
৬.১. ফিক্‌হের মূলনীতি ও সামগ্রিক নীতি ২৪৯-৩২২

৭. পঞ্চম অধ্যায় ৩২৩-৩৩৪
৭.১. ফিক্‌হী বিধানের লঘুকরণ...৩২৩
৭.১.১. সফরের কারণে বিধানের তাখফীফ.................................৩২৩
৭.১.২. রোগের কারণে বিধানের তাখফীফ বা রুখ্‌সাত..................৩২৪
৭.১.৩. জবরদস্তী বা বলপ্রয়োগ-এর ক্ষেত্রে রুখ্‌সাত ৩২৪
৭.১.৪. বিস্মৃতির কারণে রুখ্‌সাত..৩২৮
৭.১.৫. অজ্ঞতার ক্ষেত্রে রুখ্‌সাত...৩৩০
৭.১.৬. উস্‌র ও উমূমুল বালওয়া-এর দরুণ রুখ্‌সাত....................৩৩১
৭.১.৭ নাকস্‌-এর ক্ষেত্রে রুখ্‌সাত..৩৩৩

৮. ষষ্ঠ অধ্যায়...৩৩৫-৩৪২
৮.১. ফকীহগণের মতবিরোধের কারণ...৩৩৫

৯. গ্রন্থপঞ্জি...৩৪৩-৩৪৬

www.pathagar.com

ভূমিকা

প্রত্যেকটি কাজের একটি অনুকূল পরিবেশ থাকা চাই এবং প্রত্যেকটি পরিকল্পনার জন্য একটি উপযোগী সময় থাকতে হয়। প্রতিকূল পরিবেশে কোনো কাজ এবং অসময়ে কোনো পরিকল্পনা সফল হয় না। বরং উল্টো প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে। অনুরূপভাবে "ফিক্‌হের নতুন সংস্করণ বা সংকলনের বিষয়টিও স্থান ও পরিবেশের নাজুকতার সাথে সম্পর্কিত। যতদিন এই নাজুকতাকে সামনে রেখে এর চৌহদ্দি ও রূপরেখা নির্ধারণ করা না হবে ততদিন আশানুরূপ সফলতা লাভ সম্ভব নয়। তাই কাজ শুরু করার পূর্বে পরিবেশের আনুকূল্য যাচাই করতে হবে। মুসলিম সমাজের ধারণ ক্ষমতা ও সহনশীল শক্তির পরিমাপ করতে হবে এবং যে পর্যায়ের আনুকূল্য ও যে পরিমাণ বরদাশ্‌ত ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যাবে সেই পর্যায়ে এবং পরিমাণে কাজ করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

তাছাড়া আইনের একটি বিশেষ প্রকৃতি (مزاج / মেজাজ) থাকে। বিশেষ ধরনের এক প্রাণশক্তি (روح / রূহ) তার শিরা উপশিরায় সঞ্চরণমাণ থাকে। এই রূহ ও মেজাজের প্রতি দৃষ্টি না রাখলে আইনের মাধ্যমে কোনো সমাজের হেফাজত করা যায় না এবং যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে আইন রচনা করা হয় তাও অর্জিত হওয়া সম্ভব হয় না।

ধর্মীয় আইনের ব্যাপারে রূহ ও মেজাজের বিবেচনা অধিকতর নাজুকতা সৃষ্টি করে। কারণ আইনের প্রয়োগ এবং পরিণামের সম্পর্ক থাকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রূহ ও মেজাজের সাথে। এ ব্যাপারে গাফলতি বা শিথিলতা প্রদর্শন করলে আইন 'প্রভাবশীল' হবার পরিবর্তে 'প্রভাবিত' হয়ে পড়ে অর্থাৎ আইন কার্যকরী হয় না বরং পরিবেশ তাকে দুমড়ে দেয় এবং ক্রমে ক্রমে আইন নিজের আকর্ষণ ক্ষমতা (জনগণের শ্রদ্ধা) হারিয়ে সামাজিক অস্থিরতা এবং মানবিক দুর্বলতার সাথে সমঝোতা করে নেয়। ফলে তখন তা কাগুজে আইনে পর্যবসিত হয় এবং তার কল্যাণপ্রসূ ভূমিকা প্রায় শেষ হয়ে যায়।

এই পর্যায়ে এসে ধর্ম নিজেই নিজের দুশমনে পরিণত হয়। অর্থাৎ সত্যিকার ধর্ম নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য "প্রথাগত ধর্মের" সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। কারণ এই সংঘাত ছাড়া ধর্ম জনগণের শ্রদ্ধা অর্জনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং সমাজেও তা নিজ কল্যাণকর রূপ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয় না।

www.pathagar.com

আইনের শিক্ষা এবং তাকে চালু রাখার বিষয়টিও বড়ই গুরুত্বের দাবীদার । যতক্ষণ আইন শিক্ষা ও তার শিক্ষা পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা না হবে, তাকে চলমান রাখার ব্যাপারে ক্ষেত্রের বিচার না করা হবে এবং আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাহায্যে তাকে গ্রহণ না করা হবে ততক্ষণ আইনের যথার্থতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন প্রণয়নে কোনো বিশেষ ফলোদয় হবে না। যদি এসব ব্যাপারে যথাযথ ও যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে আইন খেলনায় পরিণত হয়ে যাবে।

নিচে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে যার সাহায্যে সামাজিক অবস্থা এবং জনগণের ধারণ ও বরদাশ্‌ত করার যোগ্যতার পরিমাপ করা সহজ হবে। তাছাড়া বর্তমান অবস্থায় কোন পর্যায়ের আইন 'প্রণয়ন' গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং তার নকশা কী হওয়া উচিত তাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলিম সমাজের তিনটি শ্রেণী

মুসলিম সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য।

১. একটি শ্রেণীর দৃষ্টিতে না বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা ও সমস্যাবলী আছে আর না আছে ইসলামী আইনের প্রকৃষ্টতা ও বিবর্তনশীল রূপরেখা। তারা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে কায়েম করার কথা চিন্তাই করতে পারে না এবং তার প্রয়োজনও অনুভব করে না। একটি সীমাবদ্ধ পরিসরে কতিপয় খুঁটিনাটি ও ছোটখাট ব্যাপার তাদের সামনে রয়েছে এবং সেই সীমিত পর্যায়েই তারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রবক্তা হওয়ার দাবীদার। কিন্তু জনগণের বেশীর ভাগ তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এই শ্রেণীটির দ্বারস্থ হয়। তাই এদেরকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা যাবে না।

২. দ্বিতীয় শ্রেণীটির জ্ঞান অত্যন্ত অগভীর এবং তাদের পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ। এরা নিজেদের 'আমানত প্রকোষ্ঠে'র খাঁটি মণিমুক্তার বিনিময়ে বিজাতীয়দের কাছ থেকে 'পাথরকুচি' ও 'উপলখণ্ড' কিনে নিয়েছে। নিজেদের অগভীর ও সীমিত পরিসর জ্ঞানের কারণে ঐগুলোকেই আসল মণিমুক্তা মনে করে বসেছে। ফলে এই শ্রেণীটি নিজেদের মহান গৌরবোজ্জ্বল অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের একটি 'নতুন সংস্করণ' তৈরী করতে চাচ্ছে। যার প্রায় প্রত্যেকটি জিনিস হবে বাহির থেকে আমদানী করা ।

যেহেতু রক্ষণশীলতার মূল্য ও মর্যাদা তাদের অন্তর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং যেহেতু অতীতের সেই মহান গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যসমূহ যার ওপর জাতীয়

www.pathagar.com

জীবনের ভিত গড়ে ওঠে তাদের দৃষ্টিতে তা জরা-জীর্ণ ও অনুন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির স্মৃতিচিহ্নে পরিণত হয়েছে, তাই এই শ্রেণীটি ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর তুলনায় অনেক বেশী ভয়ংকর। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের টেকনিকের সাথে এই শ্রেণীটি বেশী পরিচিত। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে এরা নিজেদের পরিবর্তিত করার কায়দাও ভালো করেই জানে। তাই আশা করা যায়, যে জিনিসটি একবার চালু হয়ে যাবে এরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও স্বার্থে তাকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকবে।

৩. মাঝামাঝিতে অবস্থানকারী শ্রেণীটি প্রাচীনের ভক্ত। তারা প্রাচীনকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করে। তবে অবস্থা ও চাহিদার আলোকে তারা পুরাতন জিনিসগুলোকে নতুনভাবে বিন্যস্ত ও নতুন সাজে সজ্জিত করতে চায়। তারা নতুন পদ্ধতি ও নতুন প্রকাশভঙ্গিমার দাবী করে। যাতে তার উপকারিতা অব্যাহত থাকে। উপরন্তু যাতে অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক ছিন্ন না হয় এবং জাতি তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের ভিত্তির ওপর বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইমারত রচনা করতে সক্ষম হয়। আসলে এই শ্রেণীটিই মুসলিম সমাজের জাগরণের পতাকাবাহী। এ দলটি যতই ভারী হবে এবং জ্ঞান ও কর্মের ময়দানে যতই এদের উন্নতি পরিলক্ষিত হতে থাকবে, জাতি ততই উন্নত বলে বিবেচিত হতে থাকবে।

ফিক্‌হের নতুন সংস্করণের দাবী

আধুনিক ফিক্‌হশাস্ত্র রচনার আওয়াজটি এই শ্রেণীটিরই অস্থির ও অশান্ত হৃদয় তন্ত্রীর আওয়াজ। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নতুন সংস্করণ রচনার কাজটি করতে হবে। যদি এই শ্রেণীর স্বাভাবিক ইচ্ছা ও বৈধ প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয় তাহলে এর নিশ্চিত ফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ এ অবস্থায় এ শ্রেণীটি হয় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে অথবা তথাকথিত সংস্কারকদের জালে আটকা পড়ে নিজেদেরকে ইসলামের মনগড়া ব্যাখ্যার কাছে সোপর্দ করবে।

আইনের স্থায়ীত্বের জন্য আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তার পবিত্রতার অনুভূতির প্রয়োজন

আইনের স্থায়িত্ব ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য মনস্তাত্বিক ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে দু'টি জিনিস একান্ত অপরিহার্য। সে দু'টি জিনিস হচ্ছে : শ্রদ্ধা ও পবিত্রতার অনুভূতি। শ্রদ্ধার মাধ্যমে মানবমনে আইনের মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর পবিত্রানুভূতির মাধ্যমে আইনের প্রতি বিশেষ ধরনের হৃদয়গ্রাহিতা ও আকর্ষণ অনুভূত হয়। কোনো আইন ও বিধি-ব্যবস্থা থেকে যদি এ দু'টি জিনিস বের হয়ে যায় তাহলে তা মানব জীবনে নিজের স্থান করে নিতে ব্যর্থ হয় এবং তার আসল ভূমিকার প্রকাশও সম্ভব হয় না।

www.pathagar.com

ধর্মীয় আইনের ভিত্তিই শ্রদ্ধা ও পবিত্রতাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানুষের জীবন ধর্মীয় আইনের দ্বারা যে পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছে নির্ভেজাল পার্থিব আইনের দ্বারা তার দশভাগের এক ভাগও হয়নি। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে, ধর্ম শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা বোধের সংরক্ষণ করে। এ জন্য এ দু'টির ওপর আঘাত হানার অথবা আইন পরিবর্তনের মানসিকতা ব্যাপকতা লাভ করার আশংকা থাকলে ফিক্‌হের আধুনিক সংস্করণ রচনার কোন আওয়াজই গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যপক্ষে যদি কখনও কেউ ফিক্‌হের আধুনিক সংস্করণ প্রণয়নে ব্রতী হয় তাহলে তাকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

আধুনিক সংস্করণের ব্যাপারে সতর্কতার উপায় স্বরূপ আইনকে নিম্নোক্ত দু'ভাগে ভাগ করতে হবে :

১. যে অংশের সম্পর্ক রয়েছে 'আকীদা' (বিশ্বাসমূলক ব্যাপার), ইবাদত ও নৈতিক চরিত্র ইত্যাদির সাথে;
২. যে অংশের সম্পর্ক রয়েছে সামাজিকতা, রাজনীতি ইত্যাদির সাথে।

প্রথম অংশের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র আধুনিক বিন্যাস ও কোনো কোনো অধ্যায়কে অগ্রে এবং কোন অধ্যায়কে পশ্চাতে স্থান দানের মাধ্যমে এ কাজ হতে পারে।

যদি এর মধ্যে কাটছাঁট করা হয় তাহলে পরিবর্তনের মানসিকতা জনগণের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে যাবে, আইনের মর্যাদাবোধ তাদের মন থেকে উবে যাবে এবং তাদের ওপর ধর্মের বাঁধন শিথিল হয়ে যাবে। ফলে পার্থিব আইনের মতো ধর্মীয় আইনও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় অংশে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে নকশা তৈরী করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রেও যে সমস্ত বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সমকালীন মুফতী যেসব বিষয়কে অকার্যকর বলে ফতওয়া দিয়েছেন যথা ক্রীতদাস সংক্রান্ত বিধানাবলী- সেগুলোকে আলোচনা থেকে বের করে দেয়া হলে পরিবর্তন হতে পারে ইজতিহাদমূলক বিধি-বিধানগুলোতে। সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হবে ইসলামের পরবর্তী যুগসমূহে যে সকল ইজমা' হয়েছে সেগুলো।

যদিও কোনো কোনো মহলে ইসলামী আইনের নবতর সংস্করণ প্রণয়নের আওয়াজ ওঠেছে তবুও এ কথা স্বীকার্য যে, বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের মতানৈক্যকে সামনে রেখে একটি নতুন ফিক্‌হ তৈরী করা এবং সমগ্র ইসলামী

www.pathagar.com

বিশ্বকে তা কার্যকর করার জন্য আহ্বান জানানোর সময় এখনো আসেনি। পাকিস্তানে মুসলিম পারিবারিক আইন (Family Law) প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যে ঝড় ওঠেছিল তা এ কথার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মুসলিম জাতির মধ্যে আইনের ছোটখাট ও খুঁটিনাটি বিষয়ে 'বিশ্বজনীনতা'র ধারণা আত্মস্থ করার মতো সহ্যশক্তি ও সহিষ্ণুতা এখনো সৃষ্টি হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম দেশগুলোয় ইসলামের তুলনায় জাতীয়তাবাদী উপাদানের অংশ অনেক বেশী। তাই আন্তর্জাতিক ফিক্হকে কার্যকর করার উপযোগী পরিবেশ যেমন নেই তেমনি এর ফলও ভালো হবার আশা নেই, বরং ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কা অত্যন্ত শক্তিশালী।

যেদেশে যে ফিক্হের প্রচলন হয়েছে সে দেশে তাকে সামনে রেখেই আধুনিক ফিক্হের নতুন সংস্করণের কাজ শুরু করে দেয়াই সমীচীন উপায় বলে মনে হচ্ছে। তবে অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী যে সব বিধানের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেবে অথবা নতুন সমস্যার সমাধানের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে সে সব ক্ষেত্রে অন্যান্য ফিক্হ বিশেষত ফকীহগণের ইখ্তিলাফ (ভিন্ন মত) থেকে অবশ্যি সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ এ ছাড়া এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দ্বিতীয় আর কোনো সহজ পথ নেই।

উল্লিখিত কর্মপদ্ধতিতে তৈরী নতুন সংস্করণকে 'জাতীয় ফিক্হ'র নামে আখ্যায়িত করার ভ্রান্ত মতবাদ কিছুটা শক্তিশালী হবার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু কোনো বড় ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে এ ধরনের কিছু ছোট ছোট বিষয়কে উপেক্ষা করা ছাড়া বর্তমান যুগে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দীনী খিদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভবপর নয়।

আইনের আধুনিক সংস্করণ প্রণয়নে ইজমা'

ফিক্হের আধুনিক সংস্করণ প্রণয়নের ব্যাপারে ইজমা'কে সক্রিয় করতে হবে। ইসলামী আইনের এ উৎসটি যেমন অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন অবস্থার কারণে তার প্রতি বর্তমান অনাগ্রহও দেখানো হয়েছে। ব্যক্তি শাসনের যুগে একে উৎসাহিত করা হয়নি এই কারণে যে, ব্যক্তিতান্ত্রিক সরকারগুলো সাধারণত ইজমা'ভিত্তিক কোনো প্রতিষ্ঠান বরদাশত করতে প্রস্তুত হয় না। কারণ এই ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন অবস্থা ও সমস্যাবলী সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা এবং স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও ফয়সালা দানের দায়িত্ব বহন করবে, অন্যদিকে তেমনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ জনগণের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টির সুযোগ পাবে। তাই

www.pathagar.com

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে ইসলামের ইতিহাসে ইজমা'র মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় করার সুযোগ হয়নি। পরবর্তীকালে এই ধারণাটি ব্যাপকতা লাভ করে যে, ইজমা'র জন্য যেহেতু সমগ্র উম্মতের একমত হওয়া জরুরী এবং এইরূপ ঐকমত্য প্রায় অসম্ভব, তাই ইজমা' অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র. বলেছেন :

"শরীয়তের তৃতীয় উৎস হচ্ছে ইজমা'। অথচ সমকালীন লোকদের ধারণা, সমগ্র উম্মতের একমত হওয়া ইজমা'র জন্য জরুরী, এমনকি একজনও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে স্পষ্টভাবে দ্বিমত পোষণ করলে ইজমা' হবে না। এই ধরনের ইজমা' আসলে অসম্ভব, এ ধরনের ইজমা' কোনো দিন অনুষ্ঠিত হবে না"।[১]

বেশীর ভাগ ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে উম্মতের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং ফয়সালা দানের যোগ্যতাসম্পন্ন মুজতাহিদবর্গের তথা বিভিন্ন দেশের ফকীহগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। এ ব্যাপারে ফারূক-ই-আযম হযরত উমর রা. থেকে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে তা হলো- ইজমা' হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উম্মতের নেতৃস্থানীয় ফকীহগণের ঐকমত্য ।

এ ব্যাপারে অপর একটি মত হচ্ছে, ইজমা' অনুষ্ঠিত হবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিপুল সংখ্যকের ঐকমত্য এবং বাকি লোকদের নীরবতা জরুরী।

ইজমা'র কার্যকর ব্যবস্থা

ইজমা'র জন্য মুজতাহিদগণের একটি মজলিস গঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক হতে পারে এবং উভয় অবস্থায় এ মজলিস বে-সরকারী হওয়াই উত্তম; যাতে মুজতাহিদগণ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন। এ মজলিসের সদস্য নির্বাচনও হতে হবে সরকারী প্রভাবমুক্ত এবং স্রেফ 'ইলমী (শরয়ী জ্ঞানগত) যোগ্যতার ভিত্তিতে।

ইজতিহাদের আবশ্যকতা

আমাদের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয়জীবন সমস্যা-সংকুল এবং সংকটময়। এ পরিস্থিতিতে ইজতিহাদের প্রয়োজন সমধিক, অথচ এক শ্রেণীর লোকের দৃষ্টিতে ইজতিহাদের দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে, এমনকি তার চাবিটিও হারিয়ে গেছে। আনন্দের কথা, পুরাতন ও নতুন উভয় শ্রেণী থেকে এমন একটি

---

১. ইযালাতুল খাফা।

www.pathagar.com

শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে যাদের জ্ঞান স্পৃহা প্রবল এবং আশা করা যায় তারা ইজতিহাদে ভারসাম্য রক্ষা করে মুসলিম উম্মাহ্র পথের দিশারী হতে পারবেন।

অন্যপক্ষে আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ ইজতিহাদের মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে গেছেন এবং যে নীতিপদ্ধতির আওতায় কাজ করে দেখিয়ে গেছেন, এসবই সুলিখিত ও সুবিন্যস্ত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। এই বিপুল সম্পদ থেকে লাভবান হওয়ার শ্রম স্বীকারে আমরা বিমুখ অথবা অহমিকার বশে আত্মপ্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে এর গুরুত্বই অনুভব করছি না। এর চাইতে বড় বঞ্চনা ও অদূরদর্শিতা আমাদের জন্য আর কী হতে পারে?

যেসব সম্পদ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে

ফিক্হ সংকলন ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপকরণগুলো থেকে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পেতে পারি :

১. কুরআনে আলোচিত বিষয়সমূহের পরিবেশ পরিস্থিতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স.-এর সীরাত/জীবনী ও সাহাবাগণের রা. জীবনী থেকে ফায়দা হাসিল করা;
২. হাদীসের ব্যাপারে রেওয়ায়াত (বর্ণনা পরম্পরা) ও দেরায়াত (বুদ্ধি বৃত্তিক পর্যালোচনা) উভয়টিকে ব্যবহার করা;
৩. কিয়াস;
৪. ইস্তিহ্সান;
৫. ইস্তিস্লাহ বা মাসালিহে-মুরসালাহ;
৬. ইস্তিদ্লাল;
৭. তা'আমুল;
৮. উর্ফ ও রেওয়াজ;
৯. সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের রায়;
১০. দেশের আইন (যেগুলো শরীয়তের কোনো পূর্ণাঙ্গ মূলনীতিকে আঘাত করে না);
১১. ফিক্হী উসূল ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা;
১২. ফিক্হী বিধানে হালকা ও সহজ নীতি অবলম্বনের কারণসমূহ;
১৩. ফকীহগণের ইখতিলাফের (মতপার্থক্য) কারণসমূহ।

www.pathagar.com

সমষ্টিগতভাবে এই সম্পদ সম্ভার এত বেশী ব্যাপকতা ও পূর্ণতার অধিকারী যে, এগুলোর সাহায্যে বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজনের উপযোগী আইনের চমৎকার ও উত্তম বিধি-বিধান রচিত হতে পারে এবং ইজতিহাদের রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত করা যায়। এই গ্রন্থে উক্ত বিপুল সম্পদের রূপরেখা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। নিজের স্বল্প জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতার অভাবের ব্যাপারে আমি পুরোপুরি সচেতন। কোথায় কোন্ দিক দিয়ে কীভাবে পদস্খলন হয়ে গেছে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে নজর রেখেছি যাতে নির্ভরযোগ্য সনদ ছাড়া এবং মানসিকভাবে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত না হয়ে কোথাও কোনো বিষয় উপস্থাপিত না করা হয়। এ প্রসঙ্গে এটা আমার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার নামই জীবন বলে জানি।

আল্লাহ তা'আলা তার একজন অক্ষম বান্দার এই সামান্যতম প্রচেষ্টাটি কবুল করে নিয়ে কওম ও মিল্লাতের জন্য একে সুফলদায়ক করে দেবেন, তাঁর কাছে এটিই আমার ঐকান্তিক দু'আ। আমীন!

- মুহাম্মদ তাকী আমিনী

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ফিক্‌হের স্বরূপ ও তার অর্থের ক্রমসংকোচন

ফিক্‌হের স্বরূপ

ফিক্‌হ (فقه) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'বিদারণ (شق) ও 'উন্মোচন' (فتح)। আল্লামা যামাখশারী তাই বলেছেন : الفقه حقيقته الشق والفتح "ফিক্‌হের আসল অর্থ হচ্ছে অনুসন্ধান-গবেষণা করা ও উন্মুক্ত করা"।[১]

ইমাম গাযালী রহ. ফিক্‌হের পারিভাষিক অর্থের ইঙ্গিতে বলেছেন, ফিক্‌হ হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, উপলব্ধি, গভীর চিন্তা-ভাবনা ও দীনের ব্যাপারে গভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি।[২] বাস্তবে এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এই প্রেক্ষিতে তত্ত্বানুসন্ধানী আলেমগণ ফকীহ্ শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন :

الفقيه العالم الذي يشق الاحكام ويفتش عن حقائقها و يفتح ما استغلق منها

> "ফকীহ্ হচ্ছেন এমন 'আলেম যিনি শরীয়তের বিধি বিধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণা করেন এবং আইনের মৌল সত্তা ও তার প্রকৃত তাৎপর্য (حقيقة) অনুসন্ধান করেন এবং কঠিন ও জটিল বিষয় সমূহ সুস্পষ্ট করেন।"[৩]

ফিক্‌হের এই গভীরতায় পৌঁছার জন্য একদিকে যেমন জ্ঞান ও গবেষণাগত 'ইলমি যোগ্যতার প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে প্রয়োজন হৃদয় ও মস্তিষ্ক তথা চিন্তার পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মিক পবিত্রতার। কারণ এগুলো ছাড়া চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কাঙ্খিত পরিপক্কতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই সত্যটি উপলব্ধি করেই ইমাম হাসান বসরী রহ. ফকীহ্‌র মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা অপরিহার্য গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন ফকীহ্ হচ্ছেন এমন ব্যক্তি:

১. যিনি দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন না (অর্থাৎ দুনিয়া তার জীবনের মূল লক্ষ্য হয় না);
২. যিনি আখেরাতের ব্যাপারেই অধিক উৎসাহী;
৩. যিনি দীনের ব্যাপারে পূর্ণ অন্তরদৃষ্টির অধিকারী;
৪. যিনি আল্লাহ্‌র হুকুম সর্বক্ষণ মেনে চলেন এবং পরহেজগারীর পথ অবলম্বন করেন;

---

১. হাকীকাতুল ফিকহ, খ. ১
২. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, খ. ১, পৃ. ২৪
৩. হাকীকাতুল ফিকহ, খ. ১

www.pathagar.com

৫. যিনি কোন মুসলমিকে বেইজ্জত করা ও তার অধিকার হরণ করা থেকে দূরে থাকেন;
৬. যাঁর দৃষ্টি থাকে সামগ্রিক স্বার্থের প্রতি (অর্থাৎ জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেন);
৭. অর্থ-সম্পদের লোভ যার থাকে না।[৪]

ইমাম গাযালী রহ.ও ফকীহ্‌র জন্য প্রায় একই ধরনের গুণাবলী অপরিহার্য গণ্য করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর নিম্নোক্ত বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ :

فقيها في مصالح الخلق في الدنيا

"ফকীহ্ হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকূলের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।"[৫]

এ কারণেই 'আল্লামা ইবনু আবেদীন নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছেন :

ومن لم يكن عالا باهل زمانه فهو جاهل

"যে ফকীহ তাঁর যুগের লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ তিনি আসলে মূর্খ।"[৬]

মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌র মধ্যে পার্থক্য

আ'মাশ রহ. মুহাদ্দিস ও ফকীহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। এ থেকে ফকীহ্‌র জ্ঞানের গভীরতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة

"হে ফকীহগণ! তোমরা হচ্ছো চিকিৎসক, আর আমরা ঔষধ প্রস্তুতকারী (Chemist and Druggist)।"[৭]

অর্থাৎ মুহাদ্দিগণের কাজ হচ্ছে ভালো ভালো ঔষধ একত্রিত করে সাজিয়ে রাখা, আর ফকীহ্‌দের কাজ হচ্ছে সেখান থেকে ঔষধ বাছাই করা, রোগ নির্ণয় করা এবং রোগ ও রোগীর প্রকৃতি অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দেয়া। সাধারণভাবে যদিও এই পার্থক্যটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ ইমাম বুখারী রহ. প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের একাধারে হাদীস এবং ফিক্‌হ্ উভয় শাস্ত্রের বিজ্ঞতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবুও প্রত্যেক দলের কাজের ধরন ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ পার্থক্য বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়।

উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ফকীহ্ হবার জন্য অনুসন্ধান ও গবেষণার উন্নত মানের যোগ্যতা, জাতীয় তথা জনগণের স্বভাব-প্রকৃতি-মেজাজ

---

৪. ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, খ. ১
৫. ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, খ. ১
৬. হাকীকাতুল ফিকহ্, খ. ১
৭. নাশরুল উরফ, পৃ. ১২৯, (মা'আরিফ থেকে)

www.pathagar.com

অনুধাবন ক্ষমতা, মাস্‌লিহাত অর্থাৎ কল্যাণকর ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা, সমস্যা ও সমস্যার কারণ, ব্যক্তি, পূর্বাপর পরিস্থিতি জানা ইত্যাদি বিষয় অপরিহার্য।

আল-কুরআনে ফিক্‌হের ভিত্তি

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি হচ্ছে ফিক্‌হের ভিত্তি। এখানে এর অন্তর্নিহিত অর্থটির প্রতিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"তবে কেনই বা মু'মিনদের প্রত্যেকটি গ্রুপ থেকে একটি করে দল বের হয়ে (সফরে) আসেনি, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান ও অন্তরদৃষ্টি অর্জন করতে পারে এবং শিক্ষা লাভের পর যখন তারা নিজেদের কওমের মধ্যে ফিরে যাবে তখন (অশিক্ষা ও গাফলতির পরিণাম থেকে) লোকদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (দুস্কৃতি থেকে) বাঁচতে পারে।"[৮]

আয়াতে যে ভাষায় ফিক্‌হের জ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে তাতে মনে হয়, ফিক্‌হের জন্য হৃদয় ও মস্তিষ্কের একটি বিশেষ কাঠামো নির্ধারিত রয়েছে এবং সেই মোতাবেক ঐ দু'টিকে ঢেলে সাজাতে হবে। এভাবে হৃদয় ও মস্তিষ্ককে ঢেলে সাজানো সম্ভব না হলে অবস্থা ও ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইপ্সিত ফিকহী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হয় না।

এ কারণে ইমাম গাযালী রহ. 'তাফাক্কুহ্‌ ফিদ্‌দীন' (تفقه في الدين)-এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন :

১. প্রবৃত্তিজাত বিপদগুলোর সূক্ষ্মতা অনুধাবন করা;
২. আমল বিনষ্টকারী ব্যাপারগুলো অনুধাবন করা;
৩. আখেরাতের জ্ঞান লাভ;
৪. পরকালীন নিয়ামতগুলোর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করা;
৫. দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করার সাথে সাথে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার ক্ষমতা;
৬. হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ের প্রাধান্য;

নিজ বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে ইমাম গাযালী রহ. ইসলামের প্রথম যুগে ফিক্‌হ শব্দের অর্থের ব্যাপকতার বিষয়টি পেশ করেছেন। উপরন্তু উল্লিখিত কথাগুলোকে আয়াতাংশ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন।[৯]

---

৮. সূরা আত-তাওবা : ১২২
৯. ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, খ. ১, পৃ. ২৪

www.pathagar.com

উসূলবিদগণের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা থেকে এর সমর্থন মেলে :
"সত্য আকীদার প্রতি বিশ্বাস ও মিথ্যা আকীদা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে দীনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়। এ ছাড়াও হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সাথে যেসব কাজের সম্পর্ক রয়েছে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য সেগুলোকে এমনভাবে সম্পাদন করতে হবে যাতে শরীয়ত প্রবর্তকের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়।"[১০]

উল্লিখিত নীতিগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে দীনি মেজাজ গঠিত হয় এবং মন-মস্তিষ্কের পরিশীলন হয়। অতঃপর চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয় যা ফিক্‌হের জন্য অপরিহার্য।

হাদীসে ফিক্‌হের অর্থ

নিম্নোল্লিখিত হাদীসগুলোও ফিক্‌হ অর্থের গভীরতার সমর্থক :

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ করতে চান তিনি তাকে দীনের তাফাক্কুহ (تفقه) বা সূক্ষ্ম অন্তরদৃষ্টি দান করেন।"[১১]

রসূলুল্লাহ স. একবার সাহাবায়ে কেরাম রা. কে বলেন :

وإن رِجالاً يأتونَكمْ مِنْ أقْطار الأرْضِ يَتفقّهُونَ فِي الدِّينِ فإذا أتوكمْ فاستَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً

"লোকেরা দীনের ব্যাপারে তাফাক্কুহ হাসিল করার জন্য তোমাদের কাছে আসবে নানা স্থান থেকে; যখন তারা আসবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। এটা আমার অসিয়ত।"[১২]

তিনি আরো বলেন :

فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

"অনেক সময় ফিক্‌হ বহনকারী অর্থাৎ নতুন অবতীর্ণ কোন আয়াত বা রসূলুল্লাহ স.-এর কোন নির্দেশের বাহক বা বর্ণনাকারী নিজে ফকীহ হয় না, আবার অনেক সময় ফিক্‌হের বাহক এমন কারো কাছে ফিক্‌হ বহন করে নিয়ে যায় যে অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী ফকীহ।"[১৩]

---

১০. শারহু মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ১১
১১. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-ইলম, বাব : মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহহু ফিদ্দীন, হাদীস নং-৭১
১২. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : আল-ইলম, বাব : আল-ইসতীসাউ বিমান ইয়াতলুবুল ইলমা, হাদীস নং-২৬৫০; হাদীসটির সনদ যঈফ।
১৩. সুনান ইবনি মাজাহ, কিতাব : ইফতিতাহুল কিতাবি ফিল ঈমানি ওয়া ফাযাইলিস সাহাবাতি ওয়াল ইলম, বাব : মান বাল্লাগা ইলমান, হাদীস নং-২৩০

www.pathagar.com

বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি প্রসূত বিচক্ষণতা

ফিক্‌হী বিধান দেয়ার জন্য যে ধরনের তাফাক্কুহের কথা বলা হয়েছে তাতে বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি উভয়ের প্রেরণায় কাজ করা এবং উভয়ের মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য গণ্য করা হয়। যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ঐ দু'টির মধ্য থেকে কোনো একটির নেতৃত্ব ও নির্দেশনা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে অথবা এ দুয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে না (তা অন্য কোনো কাজের জন্য যদিও বা সহায়ক হতে পারে, ফিক্‌হী বিধান উদ্ভাবন তথা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকা সম্ভব হবে না। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে, 'ইলম (জ্ঞান) ও উপলব্ধির একমাত্র উৎস হচ্ছে বুদ্ধি (عقل)। অথচ কুরআন মজীদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, 'ইলম ও উপলব্ধির আর একটি উৎস আছে এবং সেটি হচ্ছে কল্‌ব (قلب) বা হৃদয়।

যেমন বলা হয়েছে :

لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا

"তাদের হৃদয় আছে বটে কিন্তু সে হৃদয়ে তাফাক্কুহ (গভীর তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধির ক্ষমতা) নেই।"[১৪]

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

"আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন।"[১৫]

أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"অথবা তাদের হৃদয়ে তালা মেরে দেয়া হয়েছে কি?"[১৬]

فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ

"তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, তাই তারা বুঝে না।"[১৭]

এই আয়াতগুলোয় হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধির অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। তবে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করা হয়নি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, বুদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করা সত্ত্বেও অনেক মানুষ সূক্ষ্ম অন্তরদৃষ্টির অধিকারী হতে পারেনি।

আধুনিক যুগের কোনো কোনো লেখক উপরে উদ্ধৃত আয়াতে উল্লিখিত 'কল্‌ব' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'বুদ্ধিবৃত্তি'। তাঁদের এ ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের কারণ, আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধান 'কল্‌ব'কে কোনো বিশেষ স্থান দিতে প্রস্তুত নয়।

---

১৪. সূরা আল-আ'রাফ : ১৭৯

১৫. সূরা আল-বাকারা : ৭

১৬. সূরা মুহাম্মাদ : ২৪

১৭. সূরা মুনাফিকুন : ৩

www.pathagar.com

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান কালের গবেষণা ও অনুসন্ধান কি মানব জগতের সকল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে? তা ছাড়া এ পর্যন্ত মানুষ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে কেবলমাত্র সেগুলোই কি মানব প্রকৃতির চূড়ান্ত কথা? সেগুলো ছাড়া কি আর কিছুই নেই? যদি এর জবাব নেতিবাচক হয় এবং নিঃসন্দেহে এর জবাব নেতিবাচক, তাহলে 'কল্‌ব'কেও 'ইল্‌ম ও উপলব্ধির একটি মাধ্যম হিসেবে মেনে নিতে হবে। 'কল্‌ব' বলতে তো একটুকরো গোশত বুঝায় না, যা মানুষের দেহে ফানুসের আকারে বক্ষদেশের বামদিকে ঝুলানো থাকে। বরং 'কল্‌ব' হচ্ছে গোশতের ঐ টুকরোটির সাথে সম্পর্কিত একটি অদৃশ্য শক্তি। উসূলবিদগণ এ শক্তিটিকে 'কলবের চোখ' (عين القلب) আখ্যা দিয়েছেন।[১৮] ঐ টুকরোটির সাথে কল্‌বের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন বিশেষিতের সাথে বিশেষণের সম্পর্ক এবং যেমন স্থানের সাথে অবস্থানকারীর সম্পর্ক হয়।

আর এরই মাধ্যমে সেই ফিরাসাত (فراسة-অন্তর্দৃষ্টি) সৃষ্টি হয়, যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

"মু'মিনের ফিরাসাতকে ভয় করো, কারণ সে আল্লাহ্‌র নূর দিয়ে দেখে।"[১৯]

হিকমত শব্দের অর্থ

বুদ্ধি ও কল্‌বের সমন্বয়ে যে ধরনের 'ইলম এবং ফিরাসাত-এর সৃষ্টি হয় আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যার সহায়তা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, কুরআন মাজীদ তাকে একটি ব্যাপক অর্থবাচক শব্দ 'হিকমত' দিয়ে প্রকাশ করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"আল্লাহ যাকে চান 'হিকমত' (حكمة) দান করেন। আর যাকে হিকমত (রূপ সম্পদ) দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।"[২০]

রসূলুল্লাহ স.এর নিম্নোক্ত হাদীসেও 'হিকমত' শব্দটির আসল তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ করতে চান তাকে তিনি দীনের তাফাক্কুহ (সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি) দান করেন।"[২১]

---

১৮. নূরুল আনওয়ার, পৃ. ১১৮

১৯. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : তাফসীরুল কুরআন, বাব : সূরা আল-হিজ্‌র, হাদীস নং-৩১২৭; হাদীসটির সনদ যঈফ।

২০. সূরা আল-বাকারা : ২৬৯

২১. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-ইলম, বাব : মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাক্কিহহু ফিদ্দীন, হাদীস নং-৭১

www.pathagar.com

ইমাম মালিক রহ. একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং মালিকী মাযহাব-এর প্রাণপুরুষ। তিনি বলেন :

الحكمة والعلم نور يهدى به الله من يشاء

"হিকমত ও 'ইলম হচ্ছে 'নূর'। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এ নূরের মাধ্যমে পথের দিশা দিয়ে থাকেন।"[২২]

অন্যত্র তিনি বলেন :

ليس العلم بكَثْرَةِ الروايات ولكنه نور يجعله الله فى القلوب

"অনেক বেশী রেওয়ায়াত আসলে 'ইলম নয় বরং 'ইলম হচ্ছে এমন একটি নূর আল্লাহ যা স্থাপন করেন কল্‌ব-এ।"[২৩]

'ইলম ও হিকমতের অধিকারীর আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি এক স্থানে বলেন :

لكن عليه علامة ظاهرة وهو التجافى عن دار الغرور والانابة الى الخلود

"হিকমতের অধিকারীর পরিষ্কার আলামত হচ্ছে : মায়াময় জগৎকে এড়িয়ে চলা (অর্থাৎ দুনিয়াবী স্বার্থকে নিজের জীবনের মূল লক্ষ্যে পরিণত না করা) এবং চিরন্তনের (আখিরাতের) দিকে প্রত্যাবর্তন করা।"[২৪]

এখানে 'ইলম' বলতে 'ইলমে নবুওয়ত' এবং 'হিকমত' বলতে এমন ধরনের উন্নত ও উচ্চতম যোগ্যতা নির্দেশ করা হয়েছে যা নবুওয়তের মেজাজ ও প্রকৃতি চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয় এবং দীনের গূঢ় রহস্য ও আইনের সূক্ষ্মতম পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

মুহাক্কিক (গভীর তত্ত্বানুসন্ধানী) ও মুফাস্‌সিরগণের বর্ণনায় হিকমতের অর্থ

মুহাক্কিক ও মুফাস্‌সিরগণ হিকমতের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম রাগেব ইসফাহানী বলেন :

الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل

"ইলম ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে 'সত্যে' পৌঁছে যাওয়াই হচ্ছে হিকমত।"[২৫]

লিসানুল 'আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে :

الحكْمَةُ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم

"শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জিনিসকে সর্বোত্তম 'ইলমের মাধ্যমে জানাই হচ্ছে হিকমত।"[২৬]

---

২২. তরজমানুস সুন্নাহ, খ. ১
২৩. তরজমানুস সুন্নাহ, খ. ১
২৪. তরজমানুস সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ৫০
২৫. মুফরাদাত, পৃ. ১২৬
২৬. লিসানুল আরব, খ. ৫

www.pathagar.com

হিকমতের অন্যান্য অর্থগুলো হচ্ছে :

১. বুদ্ধির পথ নির্দেশনা ও কলবের অন্তর্দৃষ্টি;
২. বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানা;
৩. প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযথ স্থান দানের যোগ্যতা;
৪. হক ও বাতিলের মধ্যে ফয়সালা করার শক্তি;
৫. নফস এবং শয়তানের সূক্ষ্মতম অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি;
৬. শয়তানী ও মানবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা;
৭. অসৎবৃত্তিগুলোকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করে তার প্রতিরোধের সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন;
৮. সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার জ্ঞান;
৯. এমন তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান যার মাধ্যমে মানবতা পূর্ণতায় পৌঁছে যায়;
১০. বিশেষ ধরনের বিচক্ষণতা ইত্যাদি।[২৭]

ফলকথা, এমন সব যোগ্যতা ও ক্ষমতা যার মাধ্যমে মানুষ বস্তুর আসল রূপ ও তাৎপর্য জানতে পারে এবং কার্যকারণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে তাকে হিকমত বলে। আল্লামা ইবনে মিসকাওয়াইহ রহ. নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও হিকমতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন : মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞাবোধ, উপলব্ধি ও বিচার বিবেচনা শক্তি, স্বচ্ছ চিন্তা ও সহজে শিক্ষার ক্ষমতা। এ সবগুলো উল্লেখ করার পর তিনি আরো বলেন :

وبهذه الاشياء يكون حسن الاستعداد للحكمة

"এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে হিকমতের সুষম যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।"[২৮]

'ইলমের তিনটি পর্যায়

উল্লিখিত হিকমত ও আলোচ্য 'তাফাক্কুহ'-এর তাৎপর্য বুঝবার জন্য নিম্নলিখিত আয়াতটিও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ.

"নিঃসন্দেহে মু'মিনদের ওপর আল্লাহ ইহ্‌সান করেছেন যখন তিনি তাদের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেন একজন রসূল, যিনি হচ্ছেন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যিনি আল্লাহ্‌র আয়াতগুলো তাদের পড়ে শোনান, তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করেন এবং তাদেরকে শেখান কিতাব ও হিকমত যদিও ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।"[২৯]

---

২৭. আরাইসুল বায়ান ফী হাকাইকিল কুরআন, পৃ. ৬
২৮. তাহযীবুল আখলাক, পৃ. ৮
২৯. সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪

www.pathagar.com

এই আয়াতটিতে রসূলের কর্মের তিনটি পর্যায় বর্ণিত হয়েছে :

১. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه (রসূল তাদেরকে তাঁর আয়াতগুলো পাঠ করে শোনান)। আরবী ভাষা জানার মাধ্যমে এই পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব যাতে কুরআন মাজীদের উপদেশ ও স্মারক উপলব্ধি করতে পারে। যে কেউ চেষ্টা করলে এ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে বলে কথাটির অর্থে সর্বজনীনতা আছে। আর এই অর্থের প্রেক্ষিতে ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"উপদেশ গ্রহণের জন্য আমরা কুরআনকে সহজ বানিয়েছি। কোনো উপদেশ গ্রহনকারী আছে কি?"[৩০]

২. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ (তিনি তাদেরকে কিতাবের তালিম দেন)। এই তালিমের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করা যাতে সে আয়াতের অর্থ বুঝতে পারে, কুরআনে যেসব মূলনীতি ও মৌল বিষয় বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর যথার্থ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্ধারণ করতে পারে এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকেও চিহ্নিত করতে পারে। এই পর্যায়ে উন্নীত হবার জন্য চাই কুরআন মাজীদের আয়াতের পূর্বাপর (سياق وسباق)-এর প্রতি দৃষ্টি দান, সূরাগুলোর মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন, সূরাগুলো যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নাযিল হয়েছিল তার জ্ঞান লাভ, পরোক্ষ ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করা যাতে শিক্ষার্থী নতুন অবস্থা বা প্রশ্নাদির সম্মুখীন হলে তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সাহায্যে রায় (رأى) দিতে সক্ষম হয়, প্রয়োজন বোধ করলে অন্য আলিমদের সাথে আলোচনা করে বিধান দান করতে পারে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"যদি তোমরা না জেনে থাকো, তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা জ্ঞান বুদ্ধি রাখে।"[৩১]

অর্থাৎ জ্ঞান গবেষণার অগম্য বিষয়ে অপরের জ্ঞান-গবেষণার সাহায্য গ্রহণ করো।

৩. وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ (তাদের হিকমত শিখান)। হিকমত 'ইলমের সবচেয়ে উঁচু পর্যায় এবং ফকীহের যোগ্যতার শীর্ষে অবস্থিত। কার্যকারণ অনুসন্ধান করে উৎস ও লক্ষ্য জেনে নেয়াই হিকমত।

আইনের জগতে এই পর্যায়ে উপনীত হবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জ্ঞান অপরিহার্য গণ্য করা হয় :

---

৩০. সূরা আল-ক্বামার : ১৭

৩১. সূরা আল-নাহল : ৪৩

www.pathagar.com

১. আইনের ঐতিহাসিক পটভূমির জ্ঞান;
২. আইনের ভূমিকা সম্পর্কিত জ্ঞান;
৩. 'ইল্লত (علة) ও কার্যকারণ অনুধাবন;
৪. মনস্তত্ত্বের গভীর জ্ঞান;
৫. প্রকৃতিগত আকর্ষণ ও প্রবণতার অনুধাবন;
৬. জাতীয় ও দলীয় মেজাজ সম্বন্ধে জ্ঞান;
৭. জাতীয় জীবনের বিভিন্ন যুগ এবং জাতির উত্থান-পতন ইত্যাদির জ্ঞান। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটিতে এই তৃতীয় পর্যায়টির উল্লেখ করা হয়েছে :

وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

"আর যাকে হিকমত দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।"[৩২]

আর لِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ (প্রত্যেক সীমানার জন্য উৎপত্তিস্থল রয়েছে[৩৩]) হাদীসে সম্ভবত এই পর্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ হাদীসে উল্লিখিত মাতলা (مطلع) এমন একটি স্থানকে বলা হয় যা উঁচুতে থাকে। মানুষ উঁচুতে উঠে তার মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। অনুরূপভাবে 'ইলম এমন এক সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যার ফলে মানুষ সেই উচ্চতায় উপনীত হয়ে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করে প্রত্যেক বস্তুর গভীরে পৌঁছে যায়। অতঃপর তার সমস্ত দিকগুলো সামনে রেখে একজন তথ্যাভিজ্ঞ পর্যালোচক হিসেবে আলোচনা করে। এটিই হচ্ছে ফকীহ্‌র 'ইলমের আসল স্থান। অন্যান্য স্থান থেকেও কিছুটা ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, আইন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার মতো মস্তিষ্ক থাকতে হবে এবং আইনের ভূমিকা ও তার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে।

হিকমতের অধিকারীদের পর্যায় ও মর্যাদা

সুউচ্চ ও সুগভীর হিকমতের অধিকারীরা বিভিন্ন পর্যায় ও মর্যাদায় বিভক্ত। হিকমতের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন আম্বিয়া আ.। তারপর আইন উদ্ভাবনের ব্যাপারে নবীদের সাথে যে যতটা নৈকট্যের অধিকারী ছিলেন এবং যার যত বেশী সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল সেই প্রেক্ষিতেই তার স্থান নির্ধারিত হয়।

হিকমতের একটি পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন সাইয়্যিনা উমর রাযিআল্লাহু আনহু ও অন্য কতিপয় সাহাবা রা.। তাঁরা শরীয়ত ও শরীয়তের মেজাজের সাথে এতই

৩২. সূরা আল-বাকারা : ২৬৯
৩৩. আল-মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং-৮৬৬৭

www.pathagar.com

একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে, তার ফলে একাধিক বিষয়ে তাঁদের মতের অনুকূলে ওহী নাযিল হয়েছিল। অনুরূপভাবে অনেক পারদর্শী সাহাবা রা. এমন পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন যে তার ফলে কেবলমাত্র ইলহাম (الهام) ও ব্যক্তিগত ঝোঁক (رجحان) প্রবণতাই তাদেরকে শরীয়তের দিকে পথ প্রদর্শনে সহায়তা করতো। মানুষের মেজাজ, প্রকৃতি ও প্রবণতা যখন শরীয়তে ইলাহিয়ার সাথে একাত্ম হয়ে তার মধ্যে মিশে যায় তখন সেই প্রবণতাই শরীয়তের কাঙ্খিত চাহিদায় পরিণত হয়।

প্রথম যুগে ফিক্‌হ

নিচে আমরা প্রথম যুগে ফিক্‌হের সংজ্ঞা ও অর্থের গণ্ডি কিভাবে ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ হয়ে আসছিল তার আলোচনায় আসছি।

নবী স.-এর বরকতময় যুগে ফিক্‌হশাস্ত্র যথারীতি গ্রন্থিত হয়নি এবং তার সীমারেখাও নির্ধারিত হয়নি। সাহাবা-ই-কিরাম রা. রসূলুল্লাহ স.-কে যে কাজটি যেভাবে করতে দেখতেন সেকাজটি সেভাবে করাকে তারা দীন ও দুনিয়ার সাফল্য ও সৌভাগ্য মনে করতেন। তাঁর কোন কাজটির গুরুত্ব কোন পর্যায়ের, এ ধরনের কোনো প্রশ্ন কখনো সাহাবীদের মনে উদয় হয়নি। কোন কাজটি তিনি চিরাচরিত অভ্যাস হিসেবে করেছেন আর কোনটি ইবাদত হিসেবে, কোন কাজটি অপরিহার্য আর কোনটি অপরিহার্য নয় এমন প্রশ্নও তাদের মনে জাগতো না। রসূলুল্লাহ স.-এর ইত্তেবা (اِتِّبَاع) অর্থাৎ আনুগত্যকে তারা প্রাণের চাইতেও বেশী ভালোবাসতেন।[৩৪]

রসূলুল্লাহ স.-এর ওফাতের পর যখন এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হতো যার কোন নযীর এবং সে প্রেক্ষিতে তাঁর কোন হেদায়াত পাওয়া যেতো না, তখন যাঁরা বেশী 'ইলমের অধিকারী হতেন না, তাঁরা অধিক 'ইলমের অধিকারী সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করে فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতেন। অধিক 'ইলমের অধিকারীরা কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের আলোকে ঐ নতুন অবস্থার পর্যালোচনা করতেন। কুরআনে বর্ণিত হুকুমের উদ্দেশ্য ও 'ইল্লত অনুসন্ধান করে উদ্ভূত নতুন অবস্থার মৌল উদ্দেশ্য (غرض) ও 'ইল্লতের সাথে তার সামঞ্জস্যশীলতার প্রেক্ষিতে নতুন অবস্থাটির জন্য ঐ একই হুকুম জারী করে দিতেন। যেমন শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. বলেছেন :

احتهد برأيه وعرف العلة التي أدار رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها الحكم في منصوصاته فطرد الحكم حيثما وجدها لا يألو جهدا في موافقة غرضه عليه الصلاة و السلام

৩৪. আল-ইনসাফ, পৃ. ২

www.pathagar.com

"তাঁরা নিজেদের রায়ের মাধ্যমে ইজতিহাদ করতেন, তাঁরা সেই ইল্লতটি (কার্যকারণ) জানার চেষ্টা করতেন। যার ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ্ স. নসের মধ্যে হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। অতঃপর যেখানে সেই ইল্লতটি পাওয়া যেত সেখানে তাঁরা এ হুকুমটি জারী করতেন। তবে হুকুমের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ স.-এর মুখ্য উদ্দেশ্য জানার জন্য তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। আর তার-ই সামঞ্জস্যশীলতার প্রেক্ষিতে একটির হুকুম অন্যটির ওপর লাগাতেন।"[৩৫]

ব্যাখ্যা : যে সাহাবী উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্মুখীন তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠার জন্য ইজতিহাদ করতেন। অর্থাৎ যে 'ইল্লতের ভিত্তিতে অনুরূপ কোন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর প্রকাশ্য উক্তিতে যে হুকুম জারী করেছিলেন, তদ্রূপ কোনো 'ইল্লত উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কি-না সে বিষয়ে গবেষণার বেলায় চেষ্টার কোন ত্রুটি করতেন না, 'ইল্লতের সন্ধান পাওয়া গেলে অনুরূপ হুকুম চালাবার পক্ষে মত স্থির করতেন। 'ইল্লতের অনুসন্ধানে এবং হুকুমের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ স. যে হুকুম দিয়েছেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য (غرض) জানার জন্য তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন এবং সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যের প্রেক্ষিতে বিধান দান করতেন।

সাহাবায়ে-কিরামের রা. পর এলো তাবেঈদের যুগ। তাঁরা কুরআনের জ্ঞান রসূলুল্লাহ্ স.-এর হাদীস ও সাহাবাগণের রা. বাণী ও কার্যাবলী সাহাবাগণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেন এবং অবস্থা ও সমস্যাবলীর ব্যাপারে ইজতিহাদের অনুরূপ কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেন; যা সাহাবাগণ করেছিলেন। এমন কি-

وكان سعيد بن المسيب وابراهيم وامثالها جمعوا ابواب الفقه باجمعها وكان لهم في كل باب اصول تلقوها من السلف

"সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রহ. ও ইবরাহীম রহ. প্রমুখ তাবেঈগণ ফিক্‌হের নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেন। প্রত্যেক প্রসঙ্গের কতিপয় মূলনীতিও তাঁরা হাসিল করেছিলেন সাহাবীদের কাছ থেকে।"

এরপর এলো তাবে-তাবেঈদের (تبع تابعين) যুগ। তাঁরা পূর্ববর্তীদের সমগ্র জীবন এবং অবস্থা ও সমস্যাবলী অনুধাবন করেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপরোক্ত রূপে ইজতিহাদ করেন এবং ফিক্‌হ গ্রন্থাদি রচনা শুরু করেন।

প্রথম যুগে ফিক্‌হের অর্থ

'ফিক্‌হের ক্রমোন্নতি' শিরোনামে প্রত্যেক যুগের ফিক্‌হের বিস্তারিত অবস্থার ওপর মন্তব্য পরবর্তী পর্যায়ে এসে যাবে। এখানে কেবল আমি শুধু এতটুকুই

---

৩৫. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

বর্ণনা করবো যে, প্রথম যুগে ফিক্‌হের অর্থ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামী জীবনের সমস্ত বিভাগের সমুদয় প্রশ্নের বিধান ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন উসূল গ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে :

ان الفقه فى الزمان القديم كان متناولا لعلم الحقيقة وهى الا لهيات من مباحث الذات والصفات وعلم الطريقة وهى مباحث المنجيات والمهلكات وعلم الشريعة الظاهرة

"প্রাচীন যুগে ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত ছিল : (১) علم الحقيقة তথা আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান; (২) علم الطريقة পথনির্দেশক জ্ঞান তথা নাজাতদানকারী ও ধ্বংসকারী কার্যাবলীর জ্ঞান এবং (৩) علم الظاهرية الشريعة অর্থাৎ দৃশ্যমান কর্ম সম্পর্কীয় বিধানের জ্ঞান।"

সুতরাং সে যুগে ফিক্‌হের পরিসর ছিল সর্বব্যাপী। সর্বপ্রকার দীনি 'ইল্‌ম ছিল ফিক্‌হ পদবাচ্য। ফিক্‌হের অর্থ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা রহ. ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণের বর্ণনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে : দীনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি এবং ইস্তিমবাত (استنباط) (deduction, উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব অর্থাৎ বিধান উদ্ভাবন ক্ষমতা)-এর দু'য়ের সমন্বয়ের নাম ফিক্‌হ; যার মাধ্যমে শরীয়তের হুকুম আহকাম মারেফতের গূঢ় রহস্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, উপরন্তু নিত্য নতুন খুঁটিনাটি (جزئيات) প্রশ্নের উত্তর উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তি এই গভীর দীনি অন্তর্দৃষ্টি ও বিধান উদ্ভাবনের ক্ষমতা রাখেন তাকেই ফকীহ্ বলা হয়।[৩৬]

ইমাম আবু হানীফা রহ. ফিক্‌হের যে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها

"ফিক্‌হ হচ্ছে নাফ্‌স-এর পরিচয় লাভ করা তথা কী কী তার অনুকূল (উপকারী) এবং কী কী তার প্রতিকূল (ক্ষতিকারক) সে সম্বন্ধে জ্ঞান।"[৩৭]

ما لها وما عليها কথাগুলোর ব্যাখ্যা তারা করেছেন এরূপ :

ما ينتفع به النفس وما يتضرر به فى الدنيا والاخرة

"যার সাহায্যে নফস দুনিয়া ও আখেরাতে ফায়দা হাসিল করে আর যার কারণে দুনিয়া ও আখেরাতে নফস ক্ষতির সম্মুখীন হয়।"[৩৮]

ফিক্‌হের উপরোল্লিখিত সংজ্ঞায় কোনো 'ইলম বা 'ইলমের কোন শাখাকে বিশেষায়িত করা হয়নি বরং ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ তথা লাভ-লোকসান এর মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি উপকারী 'ইলম ও এর শাখাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এবং প্রত্যেকটি ক্ষতিকর বিষয়কে এ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

---

৩৬. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ১০

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

www.pathagar.com

ফিক্‌হকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার কারণে ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাইদের একটি কিতাব লেখেন এবং তার নাম দেন "ফিক্‌হে আকবর" (الفقه الاكبر)।[৩৯] দীর্ঘকাল যাবৎ ফিক্‌হের এই অর্থই প্রচলিত এবং কার্যকর থাকে।

ফিক্‌হের পরিধির ক্রমসংকোচন

দীর্ঘকাল পর্যন্ত ফিক্‌হের এই অর্থ প্রচলিত থাকে। এই অর্থের ভিত্তিতে তার সকল বিধান কার্যকর হতে থাকে। পরবর্তীকালে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো (আকাইদ) তাদের সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি হারিয়ে ফেলে এবং তৎসংক্রান্ত আলোচনা দীর্ঘ এবং যুক্তিতর্কের সার পূর্ণ হয়ে পড়ে। তখন আকাইদ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। অত:পর 'ইলমুল-কালাম" (তর্কশাস্ত্র) নামে তা খ্যাতি লাভ করে। এই পর্যায়েও বিজদানীয়্যাত[৪০](وجدانيات) অর্থাৎ মনোজগতের ব্যাপারগুলোর সম্পর্ক ফিক্‌হের সাথে স্থিত ছিল। অর্থাৎ ফিক্‌হের আওতায় তার আলোচনা হতো। তাই 'শারহে মিনহাজ' ইত্যাদি কিতাবে 'মনস্তাত্ত্বিক' বিষয়গুলোকে ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোল্লিখিত সুস্পষ্ট বক্তব্যটি অনুধাবন করা যায় :

ان تحريم الحسد والرياء من الفقه

> "হিংসা ও রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছায় লোক দেখানো 'ইবাদত) হারাম হওয়ার বিষয়টি ফিক্‌হের সাথে সম্পর্কিত।"

প্রকৃতপক্ষে হিংসা ও রিয়া এবং এই ধরনের আরো কর্ম, চিন্তা ও মনোবৃত্তি ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারপর গ্রীক দর্শন ইত্যাদি বাইরের প্রভাবসমূহ যখন প্রাধান্য বিস্তার করে তখন "বিজদানীয়্যাত" ও একটি পৃথক শাস্ত্রের রূপ গ্রহণ করে এবং "তাসাউফ" নামে পরিচিতি লাভ করে। ফলে আকাইদ এবং নৈতিকতা এই দু'টি বিষয় ফিক্‌হের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে জ্ঞানের স্বতন্ত্র দু'টি শাখা ('ইলম-ই- কালাম এবং 'ইলম-ই-তাসাউফ)-এর রূপ লাভ করলো।

মুহাক্কিকগণের (محقق / সত্যানুসন্ধিৎসু) দৃষ্টিতে পরিসর সংকোচন

গভীর মনোযোগ সহকারে অবশ্য একথাটি বিশ্লেষণ করতে হবে যে, মিল্লাতে ইসলামিয়ার মুফাক্কির (مفكر / চিন্তাবিদ) এবং মুহাক্কিক আলিমগণ ফিক্‌হের এই

---

৩৯. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ, পৃ. ২৮, ৩০

৪০. وجدانيات-এর আভিধানিক অর্থ : হৃদয়াভ্যন্তরের অনুভূতি, আলৌকিক ব্যাপার, ইলহামও এর অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

পরিসর সংকোচন-এই পৃথকীকরণকে সুনজরে দেখেননি, বরং তারা এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইমাম গাযালী রহ. বলেন :

"ফিক্‌হ শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে ফিক্‌হ বলতে বোঝান হচ্ছে কতগুলো অভিনব ও অদ্ভুত ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান, তাদের 'ইল্লাত ও কার্যকারণের অবগতি এবং অযথা বাক্য ব্যয়। এমনসব কথা সংরক্ষণকে ফিক্‌হ বলা হচ্ছে যাদের সম্পর্ক খুঁটিনাটি বিষয়ের সাথে এবং তাদের 'ইল্লাত ও কার্যকারণের সাথে। যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত ব্যাপারগুলোর মধ্যে বেশী মশগুল থাকে তাকেই ফিক্‌হের বড় আলেম মনে করা হয়।"[৪১]

অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি অন্যত্র বলেন :

"ফিক্‌হী জ্ঞান অর্জন করার উদ্দেশ্য কুরআন হাকীমে বর্ণনা করা হয়েছে لينذروا قومهم- (যাতে তারা নিজেদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে)। আর প্রথম যুগের ফিক্‌হকে কার্যকর করলেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। তালাক, 'ইতাক[৪২], লি'আন[৪৩] ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। বরং কেবলমাত্র ঐ বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে অনেক সময় হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র ভয় তিরোহিত হয়ে যায়।[৪৪]

সংকোচনের পর ফিক্‌হের সংজ্ঞা

বস্তুত এভাবে ফিক্‌হের পরিসর সংকোচনের তথা আকাইদ এবং তাসাউফ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার যে সংজ্ঞা প্রচলিত এবং খ্যাত হয়েছে তা আমরা উসূলের কিতাবগুলোতে পাই। সর্বাপেক্ষা গভীর অর্থব্যঞ্জক ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হচ্ছে এইরূপ :

الفقه حكمة فرعية شرعية

"ফিক্‌হ হচ্ছে এমন 'হিকমত' যার সাহায্যে নানা শাখায় শরীয়তের আহকাম উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়।"[৪৫]

অধিকাংশ ফকীহ ফিক্‌হের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية

---

৪১. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

৪২. عتاق = ক্রীতদাসের মুক্তি

৪৩. لعان = ব্যভিচার প্রমাণের জন্য সাক্ষীর অভাবে পক্ষদ্বয়ের পারস্পরিক لعنت - এর প্রার্থনা

৪৪. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খ. ১, পৃ. ২৪

৪৫. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ৩

www.pathagar.com

"ফিকহ হচ্ছে শরীয়তের আহকামের জ্ঞান যা তার বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণ সহকারে অর্জিত হয়।"[৪৬]

এই সংজ্ঞায় ফিক্‌হকে মানুষের জ্ঞান-সম্পর্কিত একটি গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বের সংজ্ঞার তুলনায় এই সংজ্ঞা নিম্নমানের। কারণ উক্ত সংজ্ঞায় ফিক্‌হকে হিকমত বলা হয়েছে, আর হিকমত হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের 'ইলম। তবুও ভালো, এই সংজ্ঞায় উদ্ভাবনী শক্তি এবং যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু নিম্নোল্লিখিত সংজ্ঞাটি এদিক দিয়ে একেবারেই হতাশা ব্যঞ্জক। এতে বলা হয়েছে :

الفقه مجموعة الاحكام المشروعة فى الاسلام

"বিধিবদ্ধ ইসলামী আহকাম সমষ্টির নাম ফিক্‌হ।"

এই সংজ্ঞায় ফিক্‌হকে শুধু বিধান সংক্রান্ত কতগুলো তথ্যের সমষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে যাতে 'ইলম এবং হিকমতের সাথে এর সম্পর্ক গৌণ মনে হচ্ছে। উসূলবিদগণ ফিক্‌হের এই পর্যায়টির জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন :

ثم لا صارت العلوم صناعات غلب الاستعمال فى المسائل

"তারপর যখন সব 'ইলম কতগুলো শিল্পের আকার ধারণ করলো তখন ফিক্‌হ শব্দের প্রয়োগ প্রধানত মাসায়েলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো।"[৪৭]

আলোচ্য বিষয়গুলোর বিভাগ

ফিক্‌হের পরিসর সংকোচন তথা ইলম-এ-কালাম ও ইলম-এ-তাসাউফ এর স্বতন্ত্রীকরণের পর ফিক্‌হের সম্পর্ক থেকে যায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর সাথে :

১. **ইবাদাত** (عبادات) : যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়।

২. **মু'আমালাত** (معاملات) : সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান যাতে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথভাবে কাজ করার নীতি-পদ্ধতি। যেমন : কেনা-বেচা, ঋণ, ভাড়া, আমানত, যামানত ইত্যাদি।

---

৪৬. নূরুল আনওয়ার ইত্যাদি

৪৭. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ

www.pathagar.com

৩. **মানাকিহাত (مناكحات)** : মানবের বংশ-রক্ষা সংক্রান্ত বিধি-বিধান যার মধ্যে রয়েছে বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, অভিভাবকত্ব, অসীয়্যত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

৪. **উকূবাত (عقوبات / দণ্ডবিধি)** : অপরাধ যথা হত্যা, চুরি, ব্যভিচারের অপবাদ ইত্যাদি এবং তার শাস্তি যথা মৃত্যুদণ্ড, শোনিতপণ ইত্যাদি।

৫. **মুখাসামাত (مخاصمات / দ্বিপাক্ষিক বিরোধ)** : এর মধ্যে রয়েছে বিচারিক বিষয়সমূহ যথা অভিযোগ বিধি, বিচার বিধি, প্রমাণ প্রয়োগ বিধি ইত্যাদি।

৬. **হুকুমত ও খিলাফত (حكومة وخلافة)** : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ, শান্তি ও সন্ধি, মন্ত্রিত্ব, কর আরোপ ও আদায় ইত্যাদির যেসব বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। কিতাবুস সিয়ার ও কিতাবু আহকামিস সুলতানিয়্যা জাতীয় গ্রন্থে হুকুমত ও খিলাফত সম্পর্কিয় আলোচনা রয়েছে। ফিক্‌হের এই আলোচ্য সমষ্টি এবং এই প্রকারভেদ হঠাৎ এক সময় অস্তিত্ব লাভ করেনি একথা অতি সহজে বোঝা যায়। বরং অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং বিবর্তনের বহু পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থানে উপনীত হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ফিক্‌হের বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতি

বিবর্তনমূলক ক্রমোন্নতির বিবেচনায় ইসলামী ফিক্‌হের চারটি যুগ চিহ্নিত করা যায়:

১. রসূলুল্লাহ স.-এর জীবনকাল তথা দশম হিজরী পর্যন্ত ফিক্‌হের প্রথম যুগ।

২. সাহাবা রা.-এর আমল তথা ৪১ হিজরী পর্যন্ত ফিক্‌হের দ্বিতীয় যুগ।

৩. বয়োকনিষ্ঠ সাহাবা রা. ও তাবেঈগণের রহ. আমল তথা হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত তৃতীয় যুগ।

৪. দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে চতুর্থ হিজরী শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত চতুর্থ যুগ।

প্রথম যুগ

জীবনের মৌলশক্তি ও গুণাবলীর বিকাশ

রসূলুল্লাহ স.-এর আমলে ফিক্‌হ সম্পর্কিত বিষয় পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্কিত ছিল। আইন প্রণয়ন, বিচার-ফায়সালা ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজেই সম্পাদন করতেন। তাঁর প্রদত্ত ফায়সালা ও আইন কানুনগুলো যথারীতি আলোচিত এবং অবশ্যই অনুসৃত হতো কিন্তু সংকলিত হয়নি। তৎকালীন জীবন যাত্রার প্রয়োজন সীমিত হবার কারণে এর তেমন প্রয়োজনও ছিল না।

রসূলুল্লাহ স.-এর আমল ছিল মানব জীবনের মৌলশক্তি ও গুণাবলীকে বিকশিত করার এবং ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যুগ। এজন্য শরীয়তের শিক্ষা দান, গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রতিই ছিল সবার দৃষ্টি। তদুপরি তাদের উপর ন্যস্ত ছিল কঠোর জিহাদের দায়িত্ব যথা সংযমের জিহাদ, প্রচারের জিহাদ, আত্মরক্ষার জন্য স্বশস্ত্র জিহাদ। অন্যপক্ষে তখন লেখা পড়ার চর্চাও ছিল সীমিত। সাহাবা রা. কুরআন মাজীদের আয়াতের অনুলিপি রাখতেন, হাদীস লিখে রাখতে রসূলুল্লাহ স. নিজেই বারণ করেছিলেন। একটি সৎ, সরল ও অনাড়ম্বর সমাজ জীবনের যেসব প্রশ্ন ও কল্যাণকর ব্যবস্থা হতে পারে সেগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক বিশ্লেষণের মধ্যেই রসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাহাবা রা. এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই শিক্ষা বাস্তবায়নের মধ্যে। রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালা লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করলেও তাতে ছিল বারণ।

www.pathagar.com

কিন্তু সাধারণত এ শিক্ষাগুলো ছিল মূলনীতি ও শাসনতান্ত্রিক ধাঁচের। এগুলোর ভিত্তিতেই আইনের ইমারত তৈরী করা হয়। অনেকগুলো খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছিল অবস্থা ও সময়ের চাহিদার ভিত্তিতে। কোন কোন ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. নতুন আইন প্রবর্তন করেছিলেন। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনগুলোর মধ্যে মামুলি ধরনের পরিবর্তন ও সংশোধন করে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

ফিক্‌হের উৎস

রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে ফিক্‌হের মাত্র দু'টি উৎস ছিল–

১. কুরআন হাকীম;
২. রসূলের ব্যাখ্যা।

কুরআনে মূলনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিধান ছাড়া একটি সৎ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও সমস্যাবলীও আলোচিত হয়েছে। যখন যেমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেই অনুযায়ী কুরআনী বিধান নাযিল হয়েছে। এই সঙ্গে বিপদের প্রতিরোধ ও ব্যবস্থার জন্যও বিধান এসেছে। যখম যেমন ওহী নাযিল হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. তার বাচনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। খুব বেশী জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন তখন দেখা দেয়নি।

রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণের রা. কাজের বিবরণ

রসূলুল্লাহ স.-এর কাজ ছিল নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ্‌র কিতাবের শিক্ষা দেয়া;
২. আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাখ্যা দান। হিকমত শিক্ষাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত।
৩. উম্মতের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। এ জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারিত ছিল না। প্রদত্ত বিধি-বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে সাফল্য অর্জিত হতো। রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্য এতই প্রভাবশীল ছিল যে তাঁর অনুকরণে সমাজ জীবনের কাঠামোই পুরোপুরি বদলে যেতো।
৪. সমষ্টিগত জীবনের এমন প্রশিক্ষণ দান করা যাতে জীবনপথের প্রতিটি মোড় ও প্রতিটি অবস্থান অতিক্রম করে ইসলামী কার্যক্রম অনবরত এগিয়ে যেতে পারে।
৫. সামগ্রিকভাবে এমন একটি জামা'আত গঠন করা যে, নবুওয়তের অবসানের পর নবুওয়তের দায়িত্ব নবুওয়তেরই নকশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা যেতে পারে। রসূলুল্লাহ স. দুনিয়া থেকে ঠিক তখনই বিদায় নিলেন যখন ইসলামের বুনিয়াদ সব দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে বলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। একদিকে তিনি ইসলামী আইনের ভবিষ্যৎ সংকলনের প্রয়োজন মিটাবার একটি পক্ষে পূর্ণাঙ্গ একটি কাঠামো তৈরী করে দেন; অন্যদিকে আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তীদের জন্য কার্যকর পন্থা সৃষ্টি করেন।

www.pathagar.com

অন্যপক্ষে সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কর্ম ছিল রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে তারা যে কুরআন তা'লীম পেতেন তা মুখস্থ করা, বুঝা ও আমল করা। তারা রসূলুল্লাহ স.-এর বাচনিক ও কর্মমূলক ব্যাখ্যাসমূহ থেকে উপকৃত হয়ে সেগুলো নিজেদের জীবনে সংযোজিত করতেন। এ ছাড়া আত্মশুদ্ধি, চরিত্র সংশোধনমূলক বিশেষ হেদায়াতসমূহকে তাঁরা মনেপ্রাণে অনুধাবন করে গ্রহণ করতেন। তাঁরা নিজেদের জান-মালের বড়-বড় কুরবানী দিয়ে নবীর মিশন ও ইসলামী কার্যক্রমকে অগ্রগামী করতেন।

দ্বিতীয় যুগ

রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব

বহু সংখ্যক বিজয় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ধারার মুখোমুখি হবার কারণে এই যুগে নতুন নতুন বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। অবস্থা ও যুগের দাবীর প্রেক্ষিতে সমস্যাবলী সমাধানের নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথম যুগের যে বিধানসমষ্টি মনের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত এবং কার্যকর ছিল, সমকালীন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তার সম্প্রসাণের প্রয়োজন দেখা দিল এবং তারা সেই সম্প্রসারণ কর্ম এমনভাবে করলেন যাতে অন্য কোন উৎস থেকে আলো ধার করার প্রয়োজন হল না।

ইজমা' ও রায়

এ যুগে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে দু'টি প্রক্রিয়ার ব্যবহার শুরু হয়। এ দু'টি হচ্ছে : ১. ইজমা' ও ২. রায় (اجماع - رای যথাক্রমে ফকীহদের সম্মিলিত মত এবং তাদের ব্যক্তিগত মত)।

এ দু'টিকে কাজে লাগানোর প্রেরণা কুরআন ও সুন্নাহ্য় ছিল। যেহেতু রসূলুল্লাহ স.-এর পর পরবর্তী যুগের লোকেরাই আল্লাহ্‌র দীনের হেফাজতকারী ও আমানতদার ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের আমল অর্থাৎ কর্মধারা থেকে ফায়দা হাসিল করা নবুওয়তের কর্মধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই তাঁরা নিজেদের গুরু দায়িত্ব অনুভব করে ফিক্‌হকে ব্যাপকতর করার পথ উন্মুক্ত করেন। এভাবে তাঁরা পরবর্তীকালের লোকদের জন্য অনেক সম্পদ জমা করে দেন।

এ যুগে ইজমা'কে সংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করা হয়। এজন্য যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের একটি কমিটি গঠিত হয়। এই সঙ্গে যতদূর সম্ভব, যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের বাইরে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুরআন ও সুন্নাহ্য় উদ্ভূত কোন বিষয়ে ফায়সালা না পাওয়া গেলে তাঁদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে যে ফায়সালা গৃহীত হতো তা আইনের মর্যাদা লাভ করতে থাকে। অবশ্য ফকীহের 'রায়' প্রদানে এবং গ্রহণের ব্যাপারে ফিক্‌হের বিধি-বিধান ও

www.pathagar.com

মূলনীতি পরবর্তী পর্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়। শরীয়তের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহের আওতাধীনের রায় অর্থাৎ সুযোগ্য ফকীহদের সুচিন্তিত ইজতিহাদপ্রসূত অভিমতের ব্যবহার হতো। কিন্তু যে ব্যক্তিগত মত বা রায় ইসলামের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতির ওপর আঘাত হানতো তা প্রত্যাখ্যান এবং তার তীব্র বিরোধিতা করা হতো।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাথে আইনের উৎসরূপে ইজমা' এবং রায় যুক্ত হলেও এ যুগের ফিক্‌হের উপজীব্য ছিল বাস্তবতা নির্ভর ও ঘটনাভিত্তিক। যখন যে প্রয়োজন দেখা দিতো অথবা যে সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধানের দাবী করতো কেবলমাত্র তারই সমাধান পেশ করা হতো। আনুমানিক ও কাল্পনিক সমস্যাবলী এবং পরবর্তীকালে যেসব সমস্যা ও ঘটনার উদ্ভব হতে পারে সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ফুরসতই তাঁদের ছিল না। বিভিন্ন প্রকার ফায়দার পরিপ্রেক্ষিত ইসলামী প্রয়োজনসমূহ এতোবেশী ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল যে, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করাটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই যুগের কিছু কিছু বিষয়ে সাহাবাগণের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। এর কারণ ছিল নিম্নরূপ :

সাহাবীগণের মতবিরোধ

কতিপয় ব্যাপারে এ যুগে সাহাবায়ে কিরামের রা. মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়; কারণ :

১. কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ : ফলে বিধান দানেও মতপার্থক্য ঘটে। কয়েকটি অবস্থায় কুরআনের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য দেখা দিত :

(ক) দ্ব্যর্থবোধক কয়েকটি আরবী শব্দের ব্যবহার যেমন قرء [তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর 'ইদ্দত (عدة) সম্পর্কে ব্যবহৃত] শব্দটি। কোনো কোনো সাহাবী একে এক অর্থে (حيض : ঋতুস্রাব) গ্রহণ করেছেন এবং অন্যেরা একে গ্রহণ করেছেন (طهر : দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়) পরিচ্ছন্ন অবস্থার অর্থে।

(খ) আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী আয়াতের প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলে, যথা : যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে তার 'ইদ্দত' যে আয়াতে চার মাস দশ দিন বলা হয়েছে, সে আয়াতটির অর্থ ব্যাপক; ফলে গর্ভবতী নারীর স্বামীর মৃত্যুতে ও ইদ্দতের একই বিধান বলে অনুমিত হয়। কিন্তু তালাক-প্রাপ্তা গর্ভবতী নারী সম্পর্কিত আয়াতে সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার 'ইদ্দত' নির্দেশ করা হয়েছে। গর্ভবতী নারীর স্বামী মারা গেলে সে কোন আয়াতের আওতাধীন হবে? তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন হবে? না সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত? কোনো কোনো সাহাবী প্রথম আয়াত অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন, কেউ দিয়েছেন দ্বিতীয় আয়াত অনুযায়ী ।

www.pathagar.com

(গ) **স্থান ও কাল নির্ধারণের ব্যাপারে মতবিরোধ** : অন্য সাহাবীদের সাথে উমর রা.-এর অধিকাংশ মতবিরোধ এই কারণেই হয়েছে।

(১) কোন হাদীস সম্পর্কে কতিপয় সাহাবীর অনবহিত থাকার কারণে ফতোয়ার বিভিন্নতা। সাধারণত অধিকাংশ হাদীস সাহাবীদের রা. জানা ছিল কিংবা এ সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ স.-এর আমল তাদের সামনে ছিল। আবার কতিপয় হাদীস সম্বন্ধে বহু সাহাবী অনবহিত ছিলেন এবং এ সংক্রান্ত রসূলুল্লাহ স.-এর আমলও ছিল অল্প কয়েকজন সাহাবীর জ্ঞাত, অন্যেরা ছিলেন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। কারণ সাধারণভাবে হাদীস বর্ণনা করার রেওয়াজ তখন ছিল না। গ্রন্থাকারে হাদীস লিপিবদ্ধও ছিল না। কাজেই হাদীসের বরাত দেয়া সহজ ছিল না।

(২) **হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে পদ্ধতিগত বিরোধ** : কোন হাদীস যে সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সে সূত্রটি নির্ভরযোগ্য কি না এ ব্যাপারে মত পার্থক্যের কারণে ফতোয়ার মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেয়।

(৩) **রায় দানের ব্যাপারে মতবিরোধ** : সাহাবীগণ রা. 'রায়' প্রদান করার ক্ষেত্রে মাসালিহে (مصالح : জনকল্যাণ), দীনের মূলনীতি ও ফিক্‌হের প্রাণসত্তা তথা হিকমত এ সবের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। তাঁদের আমলে ফিক্‌হের নিয়ম কানূন রচিত বা বিধিবদ্ধ ছিল না। বিধানদানের ব্যাপারে ইস্‌তিহ্‌সান (استحسان) (যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও জনকল্যাণের বিবেচনা) এবং ইস্‌তিস্‌লাহ (استصلاح) (অবস্থা দৃষ্টে কল্যাণকামিতা)-এর নীতি গ্রহণের প্রমাণ সাহাবী রা.-এর আমলেও পাওয়া যায়। যদিও তাঁরা শরীয়তের বিভিন্ন বিধানের স্থান-কাল নিজেদের চোখে দেখেছিলেন এবং নবুওয়তের প্রকৃতির সাথে পরিচিতির মাধ্যমে শরীয়ত ব্যবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন; তবুও সকল সাহাবা একই দৃষ্টিকোণ থেকে "মাসালিহাত" তথা সার্বিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন এমন কথা বলা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য দেখা দিত। ফলে ফতোয়ার মধ্যেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হত। তবে সেই আমলে ফিক্‌হ ছিল ঘটনাভিত্তিক ও বাস্তবধর্মী, তাই মতবিরোধ ছিল সীমাবদ্ধ। অন্যপক্ষে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিশ্চয়তা অর্জন করার পর যে সমস্যার সমাধান করা হতো তার মধ্যে মতবিরোধের অবকাশই থাকতো না।

এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ফকীহ্ এবং গভীরতত্ত্ব জ্ঞানীদের নাম নিচে দেয়া হলো :
আবূ বকর রা., উমর রা., উসমান রা., আলী রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আবূ মূসা আশ'আরী রা., মু'আয ইবনে জাবাল রা., উবাই ইবনে কাব রা. এবং যায়েদ ইবনে সাবিত রা.।

www.pathagar.com

মুসলিম জামা'আতের বিভক্তি

এ যুগে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র তিনটি ভাগে বিভক্তি ফিক্‌হের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। দলগুলো হচ্ছে :

১. **সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ** : যারা আমীর মু'আবিয়া রা.-এর খিলাফত মেনে নিয়েছিলেন।

২. **শিয়া সম্প্রদায়** : যাদের বিশ্বাস রসূলুল্লাহ্ স.-এর পর আলী রা. ছিলেন খিলাফতের বৈধ অধিকারী এবং খিলাফত অবশ্যই আহলে বায়ত (اهل بيت : নবী পরিবারের সদস্য)-দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৩. **খারেজী সম্প্রদায়** : যারা উসমান রা., আলী রা. ও মু'আবিয়া রা.-এ তিন জনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো।

মতবিরোধ রাজনৈতিক বা যে ধরনেরই হোক না কেন তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বপক্ষীয়দের রেওয়ায়াত বর্ণনা ও 'রায়' অধিকতর গুরুত্ব পেতে থাকলো, ফলে ফতোয়ায় বিভিন্নতা দেখা দিল। যারা পরিচিত, তারা ভালোভাবেই জানেন, গণমানুষের মধ্যে অধিকাংশ বিভক্তি হয় রাজনৈতিক। নিছক স্বার্থ উদ্ধারের দলীয় মতবাদে বিভক্তিকে ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত করা হয়। তারা ধর্মকে স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ারে পরিণত করে। ফেরকাবাজী ও দলবাজির এই ইতিহাস অত্যন্ত করুণ ও হৃদয় বিদারক।

তৃতীয় যুগ

ফিক্‌হ সংকলনের ভিত্তি স্থাপন

এ যুগটি আমীর মু'আবিয়া রা. শাসনামলে ৪১ হিজরী সন থেকে শুরু হয়ে দ্বিতীয় হিজরী শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ফিক্‌হের সংকলন, বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করার সমস্ত মাল-মসলা এ যুগেই তৈরী হয়। এজন্য একে ফিক্‌হের বিন্যাস ও গ্রন্থনার ভিত্তিযুগ বলাই সঙ্গত।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য

এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ফিক্‌হের উপরও প্রভাব বিস্তার করে :

১. ফেরকাবাজির দরুন প্রত্যেক ফেরকার প্রবণতা হল কোন কোন পর্যায়ে দলীয় লোকদের রেওয়ায়াত ও রায়কে অগ্রাধিকার দান করা।

২. কেন্দ্রের প্রতি আগের মতো আকর্ষণ না থাকার কারণে এবং এই সঙ্গে ইসলামী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তাগিদে উলামা ও ফকীহগণ বিভিন্ন বিজিত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তথায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁদের শিক্ষায় তাবেঈদের একটি নতুন প্রজন্ম যোগ্যতার মাপকাঠিতে

www.pathagar.com

সাহাবীদের যোগ্য স্থলাভিষিক্ত প্রমাণিত হয়। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো তাবেঈ যথার্থই বিধান উদ্ভাবন ও ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে সাহাবীগণের প্রায় সমকক্ষ হয়ে ওঠেছিলেন।

৩. হাদীস বর্ণনা ও শ্রবণ শিক্ষারীতি ও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে থাকে। সাহাবীদের যুগে এ কাজটি কতকটা সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ রসূলুল্লাহ স.-এর বিধানগুলো তখন লোকদের সামনে বাস্তব কর্মরূপে মূর্ত ছিল, তাই হাদীস বর্ণনার তেমন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন রসূলুল্লাহ স.-এর কথা কাজ ও জীবনধারা যা সাহাবীগণ নিজেদের জীবনে চিত্রায়িত করে রেখেছিলেন শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে যত ব্যাপকভাবে সম্ভব প্রচলিত করাই ছিল শরীয়তের কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার পথ। কাজেই সাহাবীগণ নিজেদের জ্ঞাত সকল হাদীস এবং নিজেদের পবিত্র জীবনধারা তাবেঈদের হাতে সমর্পণ করেন। রসূলুল্লাহ স.-এর অন্তর্ধানের পর তাদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সমাধান দিতে হয়েছিল, তথা খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুসলিম মিল্লাত যেসব আকীদা এবং অনুষ্ঠানের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাহাবাগণ রা. সে সবই তাবেঈদের সামনে তুলে ধরেন।

৪. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'আজমী' (عجمي / অনারব) লোকদের একটি বিরাট দল তৈরী হয়। তাঁরা ইসলামী বিশ্বের সকল শহরে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। যোগ্যতার দিক দিয়ে তারা আরবদের চাইতে কম ছিলেন না, বরং কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ফিক্‌হ ও হাদীসের ক্ষেত্রে আজমীদের অবদান ছিল আরবদের চেয়ে বেশী। যদি বেশী নাও হয়, তুল্য অবদানের ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। এভাবে শরীয়ত ব্যবস্থা অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও নতুন আঙ্গিকে চিন্তা করার যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় অনারব লোকদের জন্য।

৫. 'রায়' ও হাদীস প্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারণে মতভেদ দেখা দেয়। এর ফলে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। একটি দল এমন সব হাদীসের ভিত্তিতে ফতোয়া দিতো যেগুলো তাদের গোচরীভূত ছিল এবং যেগুলোর সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর ছিল। এজন্য তাদের ফতোয়া দানের গণ্ডি ছিল তুলানামূলকভাবে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় দলটি শরীয়তকে বুদ্ধি ও নীতিভিত্তিক মানদণ্ডে বুঝতে চেষ্টা করতো এবং কোনো ক্ষেত্রে হাদীস না পাওয়া গেলে তারা 'রায়' এর আশ্রয় গ্রহণ করতো। এ জন্য ফতোয়াদানের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টির পরিসর ছিল প্রথমোক্ত দলটির তুলনায় ব্যাপক। হিজাযবাসীগণের প্রবণতা ছিল প্রথমোক্ত দলটিকে অগ্রাধিকার দানের দিকে এবং তাদের কেন্দ্র ছিল

www.pathagar.com

মদীনা। আর দ্বিতীয় দলটির প্রতি অনুরক্ত ছিল ইরাকবাসী এবং তাদের কেন্দ্র ছিল কূফা। একথা সুস্পষ্ট, হিজাযবাসীদের পক্ষে হাদীসের সন্ধান করা যতটা সহজ ছিল ইরাকবাসীদের ততটা সহজ ছিলনা। তবে সাহাবীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর হিজাযবাসীদের জন্যও হাদীসের সন্ধান ও সংগ্রহ আর ততটা সহজ থাকেনি। সে সময় বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন ছিল না যাতে হাদীসভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়। অন্যদিকে 'রায়' ব্যবহারকারী দলটি 'ইল্লাত' ও কার্যকারণ সন্ধান করে মূলনীতির আওতায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাসায়েল ও বিধি-বিধানকে যুঁথিবদ্ধ করতে পারতো। এছাড়া প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটি তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার অধিকতর বৈচিত্র জনিত অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলে অনেক বেশী। এখানে বাইরের প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। বিভিন্ন তামাদ্দুন ও মতবাদের ধারক এখানে বেশী ছিল। এ কারণে দু'দলের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য হওয়া ছিল অনিবার্য। ফলে তাদের ফতোয়া ও ফায়সালার মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

কিয়াস ইস্‌তিহ্‌সান ও ইস্‌তিস্‌লাহের ব্যাপক ব্যবহার

এ যুগে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াস, ইস্‌তিহ্‌সান ও ইস্‌তিস্‌লাহের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে। ফকীহগণের ওপর অনেক বেশী নতুন নতুন প্রশ্নের চাপ পড়ে। ফলে উল্লিখিত অবলম্বন ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। হাদীসপন্থী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এর কঠোর প্রতিবাদ করেন। এমন কি তাঁরা কিয়াসকে নাজায়েয গণ্য করেন। কিন্তু তারা যদি কিয়াসপন্থীদের মতো সমপর্যায়ে বাস্তব জীবনের সমস্যাদির মুখোমুখি হতেন তাহলে মতবিরোধের প্রকৃতির মধ্যে অনেকটা পার্থক্য দেখা দিতো। একারণে মতবিরোধের কঠোরতা বেশী দিন অব্যাহত থাকতে পারেনি। বরং কিছুদিন পরে তাদের শাগরিদদের মধ্যে পারস্পরিক 'ইলম চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে লাভবান হবার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এই যুগের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণের নাম নিচে দেয়া হলো :

মদীনার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণ

১. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা.
২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.
৩. আবু হুরায়রা রা.
৪. সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব মাখযুমী রা.
৫. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম রা.
৬. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান রা.

www.pathagar.com

৭. আলী ইবনে হুসাইন রা.
৮. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ রা.
৯. সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.
১০. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রা.
১১. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর রা.
১২. নাফে' রা.
১৩. ইবনে শিহাব যুহরী রা.
১৪. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন রা.
১৫. আবুয যিনাদ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান রা.
১৬. ইয়াহয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী রা. এবং
১৭. রাবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমান রা.।

মক্কা ও কূফার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণ

মক্কার ফকীহগণ :

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.
২. মুজাহিদ ইবনে জুবাইর রা.
৩. ইকরামা রা.
৪. আতা ইবনে রিবাহ রা.
৫. আবু যুবাইর মুহাম্মদ মুসলিম রা.।

কূফার ফকীহ ও মুফতীগণ :

১. আলকামা ইবনে কায়স আন-নাখই রা.
২. মাসরূক ইবনে আজদা রা.
৩. উবাইদা ইবনে উমর সালমানী রা.
৪. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ রা.
৫. শুরাইহ ইবনে হাবেস কিনদী রহ.
৬. ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ রা.
৭. সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. এবং
৮. আমের ইবনে শারাহবীল রা.।

বসরা ও সিরিয়ার প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুফতীগণ

বসরার ফকীহ ও মুফতীগণ :

www.pathagar.com

১. আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী রা., রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম।
২. আবুল আলীয়া রা.
৩. আবুশ শাশা জাবের ইবনে যায়েদ রা.
৪. মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রা.
৫. হাসান ইবনে আবিল হাসান ইয়াসার রা. এবং
৬. কাতাদাহ ইবনে দা'আমাহ্ রা.।

সিরিয়ার ফকীহ ও মুফতীগণ :

১. আবদুর রহমান ইবনে গানাম আল-আশআরী রা.
২. আবু ইদরীস খাওলানী রা.
৩. কাবীসাহ্ ইবনে যুওয়াইব রা.
৪. মাকহূল ইবনে আবী মুসলিম রা.
৫. রিজা ইবনে হায়াতিল কিনদী রা. এবং
৬. উমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান রা.।

মিসর ও ইয়ামেনের বিখ্যাত ফকীহ ও মুফতীগণ

মিসরের ফকীহ ও মুফতীগণ :

১. আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনিল আস রা.
২. আবুল খায়র মুরশিদ ইবনে আবদুল্লাহ রা. এবং
৩. ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব রা.।

ইয়ামেনের ফকীহ ও মুফতীগণ :

১. তাউস ইবনে কায়সান জুনদী রা.
২. ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ রা. এবং
৩. ইয়াহয়া ইবনে আবী কাসীর রা.।

তখনও ফিক্‌হের বিভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি

উল্লিখিত মনীষীগণ সবাই হাদীস ও ফিক্‌হের জ্ঞানে বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা সমকালীন জনগণের আকর্ষণে পরিণত হয়েছিলেন। এ যুগে ফিক্‌হের বিভিন্ন মতবাদ (Schools of thought) বা মাযহাব (مذهب) কায়েম হয়নি বরং যে যার এবং মুফতীগণ নিজের জ্ঞান অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। যদি এই ফতোয়া সন্তোষজনক নয় বলে মনে হতো অথবা কোন ব্যাপারে আরো অনুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ হতো তাহলে অন্য কোন মুফতী ও ফকীহের কাছে একই ব্যাপারে ফতোয়া নেয়া হতো। এ ধরনের বিষয়কে দোষণীয় মনে করা হতো না।

www.pathagar.com

মুফতী ও ফকীহ ছাড়া বিভিন্ন শহরে সরকারের পক্ষ থেকে কাযী (বিচারপতি)ও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিচার করতেন। যদি কুরআন ও হাদীসে তাঁরা কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশ না পেতেন তাহলে তাঁরা বিখ্যাত ফকীহদের কাছ থেকে ফতোয়া জেনে নিতেন অথবা নিজেদের ইজতিহাদপ্রসূত মতের ভিত্তিতে ফায়সালা দিতেন। আবার কখনো তাঁরা পত্রের মাধ্যমে খলীফার কাছ থেকেও ফায়সালা জেনে নিতেন।

খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের উন্নতি

এ যুগে খারেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। খারেজীরা বিভিন্ন দীনি ব্যাপারে নিজেদের মতের ওপর অটল থাকে। এ কারণে হাদীস গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা এমন সব লোককে অগ্রাধিকার দিয়েছিল যারা ছিল তাদের বন্ধু ও সমমনা।

শিয়াদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকার জন্ম হয়। তাঁরা শিয়া নন এমন লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ বা হাদীস গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়নি। ফলকথা এভাবে প্রত্যেক ফেরকা, দল ও সম্প্রদায় নিজেদের ইমামের কাছ থেকে হাদীস ও ফিক্‌হ সংক্রান্ত ফায়সালা গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দেয়।

হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস

একদিকে যথাযথ পদ্ধতিতে হাদীস লিপিবদ্ধ করার জন্য খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীয রা. প্রচেষ্টা শুরু করেন। ইসলামী দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের শাসক এবং আলিমদের কাছে তিনি লিখে পাঠান, "রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস সন্ধান করে তা সংগ্রহ করতে থাকো। আমি 'ইলম ও উলামার নিঃশেষ হয়ে যাবার ভয়ে ভীত।" অন্যদিকে তখন জাল হাদীস রচনা চলছিলো।

জাল হাদীস রচনার কারণ

অন্যদিকে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করার প্রচলন হয় এবং এর কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. ইসলাম বিরোধী লোকদের ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার বাসনা;

২. মূর্খ সুফী ও আবিদগণের (ইবাদতে মশগুল) বাসনা, তাঁরা অনুপ্রেরণামূলক ও ফাযায়েল (فضائل) সংক্রান্ত হাদীস তৈরী করে জনগণকে ধর্মকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন;

৩. সংকীর্ণ এবং স্বল্প শিক্ষিত মুহাদ্দিসগণের খ্যাতি অর্জনের বাসনা;

৪. বিদ'আত প্রচারে উৎসাহী ও বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের নিজেদের মতবাদের স্বপক্ষে দলীল পেশ করার গরজ;

৫. বৈষয়িক স্বার্থান্বেষীদেরকে তাদের কর্মের স্বপক্ষে শরঈ দলীল পেশ করে খুশী করার ইচ্ছা;

www.pathagar.com

৬. দুর্বল মতন[১]-এর দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রখ্যাত সনদ জুড়ে দেওয়া, কোন প্রখ্যাত সনদকে ওলট-পালট করে বা কাটছাঁট করে দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ 'মতন' এর সাথে যুক্ত করা যাতে তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রবল অভিযোগ না আসে এবং তাদের বর্ণনার অভিনবত্বে বিস্মিত জনগণ তাদের 'ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়।

৭. সাহাবীদের উক্তি, আরবী প্রবাদ ও জ্ঞানীদের জ্ঞানগর্ভ কাহিনীগুলোকে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পর্কিত করে হাদীস বলে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা। এই সব উদ্দেশ্যে কোনো কোনো লোক মিথ্যাকে চালিয়ে দিতে বলতো : "আমি নিজের কানে এই হাদীস শুনেছি, আমি বর্ণনাকারীর সাথে সাক্ষাত করেছি" ইত্যাদি।

সত্যানুসারীদের বিপুল সংখ্যা

একথা সত্য, কোনো যুগের সব মানুষ এক ধরনের হয় না এবং সে যুগেও সবার প্রবৃত্তি একই রকম ছিল না। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের কাছাকাছি হবার কারণে সত্যানুসারী এবং দীন ও ঈমানের জন্য জীবন উৎসর্গকারী লোকের সংখ্যা এ যুগে ছিল প্রচুর। জাল হাদীসের প্রাদুর্ভাবে মুহাদ্দিসগণের জন্য হাদীস সংকলনের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ হয়ে পড়ে। তাঁরা কীভাবে জাল হাদীসের মিশ্রণ থেকে প্রকৃত হাদীসগুলোকে আলাদা করেন এবং কীভাবে তাঁরা এ কর্মে সাফল্য লাভ করেন তা ইসলামের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

চতুর্থ যুগ

চতুর্থ যুগের বুনিয়াদ রচিত হয় তৃতীয় যুগেই। ঐ যুগে ফিক্‌হের সংকলন ও গ্রন্থনার সূচনা হয় এবং চতুর্থ যুগেই যথাযথভাবে ফিক্‌হ লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়। ইসলামী বিশ্বের চতুর্দিকে যেসব মহান মর্যাদা সম্পন্ন ইমামগণ যাদের মুকাল্লিদ (مقلد) তথা অনুসারীবর্গ চারদিকে ছড়িয়ে পরেছিলেন এবং নিজ নিজ ইমামের ফিক্‌হী ফায়সালাকে নিজেদের বাস্তব জীবনে কার্যকর করেছিলেন, সে ইমামগণ ছিলেন এই চতুর্থ যুগের সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

এ যুগের বৈশিষ্ট্য : এ যুগের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ফিক্‌হের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে :

১. সভ্যতার ব্যাপকতা : এর ফলে নতুন নতুন প্রয়োজনের জন্ম হয় এবং চিন্তা-গবেষণার নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

---

১. যে শব্দগুলোতে হাদীসের বক্তব্য প্রকাশিত হয় তার সমষ্টিকে হাদীসের মতন (متن) বলা হয়। -অনুবাদক।

www.pathagar.com

২. জ্ঞানচর্চার প্রসার : গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলন ও প্রসার ঘটে যাতে পারস্পরিক আদান প্রদানের সুযোগ এবং দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।

৩. হাদীস গ্রন্থ সংকলন : এ যুগেই হাদীস গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন হয়। মুসলিম অধ্যুষিত প্রধান শহরগুলোতে এ কর্মে মনোযোগ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ অবদান রাখেন:

   ১. মদীনায় ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ.
   ২. মক্কায় আবদুল মালিক ইবনে আবদুল আযীয রহ.
   ৩. কূফায় সুফ্‌য়ান ছাওরী রহ.
   ৪. বসরায় হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহ. এবং সাইদ ইবনে আবী আরুবা রহ.
   ৫. ওয়াসিতে হাইশাম ইবনে শাব্বীর রহ.
   ৬. সিরিয়ায় আবদুর রহমান আওযাঈ রহ.
   ৭. ইয়ামেনে ইয়াসার ইবনে আরশাদ রহ.
   ৮. খোরাসানে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.
   ৯. রায়-এ জারীর ইবনে আবদুল হামীদ রহ.

হাদীস সংকলন ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার প্রথম পর্যায়ে সাধারণত একই বিষয়ের যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি বিষয়ের হাদীসসমূহকে বিষয়ভিত্তিক সন্নিবেশিত করা হতো। তাছাড়া হাদীসের সাথে সাহাবা ও তাবেঈগণের উক্তিও মিশ্রিত পদ্ধতিতে একত্র করার প্রচলন ছিল। হাদীস সম্পর্কিত হতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের বাণী সম্পর্কিত হতো তাদের নিজেদের সাথে।

হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণ রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস এবং অন্যদের উক্তিগুলো ভিন্নভিন্ন সংকলন করেন। এ পর্যায়ে মুসনাদ (مسند) নামে অভিহিত সঙ্কলনের সৃষ্টি হয়; যাতে প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীসগুলো তার নামে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা কূফী রহ., মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ., মুসনাদে উসমান ইবনে আবী শাইবাহ রহ., মুসনাদে আসাদ ইবনে মূসা বসরী রহ., মুসনাদে নাঈম ইবনে হাম্মাদ রহ.। এরা সবাই একজন রাবীর বর্ণিত সমস্ত রেওয়ায়াত একই জায়গায় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। হাদীসের বিষয় বস্তু যাই হোক না কেন, এই বিন্যাস ছিল রাবী (বর্ণনাকারী) ভিত্তিক।

তৃতীয় পর্যায়ে হাদীসের এই বিশাল সঞ্চয় থেকে সঠিক হাদীস নির্বাচন করার জন্য বিস্তর যাচাই বাছাই করা হয়। এই যাচাই বাছাই, বিশ্লেষণ ও

www.pathagar.com

পর্যালোচনাকারীদের শীর্ষে অবস্থান করেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ. ও ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী রহ.। তাঁরা দু'জন ব্যাপক ও চূড়ান্ত পর্যায়ের যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনার পর যথাক্রমে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম নামক হাদীসের দু'টি সংকলন তৈরী করেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে মাজাহ আরো চারটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। এই ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সিহাহ-সিত্তা (صحاح ستة) নামে পরিচিত। আরো বহু মুহাদ্দিস হাদীসের সংকলন প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা ঐ ছয় জনের মতো খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। যদিও কোনো কোনো বিবেচনায় এদের সংকলন অধিকতর খ্যাতির দাবিদার কিন্তু সামগ্রিকভাবে এগুলো উপরোক্ত ছয়টি সংকলন অপেক্ষা নিম্নমানের।

জারূহ[২] ও তা'দীল[৩]

এই যুগে মুহাদ্দিসগণের একটি শ্রেণী হাদীস বর্ণনাকারীদের (রাবীদের) অবস্থা অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষে পরিণত করেন। এই দল রাবীদের ব্যক্তিগত গুণাবলী যথা নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা, স্মরণশক্তি, ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। এ দলের সদস্যরা রিজালে[৪] জারাহ ও তা'দীল নামে খ্যাত হন।

জারূহ ও তা'দীল এর মাধ্যমে প্রমাণিত হল, এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়াত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আর এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়াত নানা দোষে দুষ্ট এবং প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে বর্জনযোগ্য, তৃতীয় এক শ্রেণীর রাবীদের রেওয়ায়াত গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। হাদীসের ভাষা (متن) এই বিচার-বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল অর্থাৎ ভাষাগত বিচারে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য কিনা তাও যাচাই করা হতো। ফলকথা এ যুগে হাদীসের জারূহ ও তা'দীল জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয় এবং বিস্তর লোক এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

৪. উসূলে ফিক্‌হ প্রণয়ন ও ফিক্‌হের মূল বিষয়ে মতবিরোধ : এ যুগে উসূলে ফিক্‌হ তথা ফিক্‌হের মূলনীতিগুলো রচিত হয়। কিন্তু ফিকহী বিধান সমূহে মতবিরোধ দেখা দেয়। এর নিম্নোক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে :

---

২. جرح = জারূহ বা criticism.

৩. تعديل = ভারসাম্য স্থির করা, বিচার করা, عدل / ইনসাফ।

৪. رجال = ব্যক্তিবর্গ।

www.pathagar.com

(ক) হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা এবং তা থেকে ফিকহের মাসায়েল উদ্ভাবনের যৌক্তিকতার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। তবে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতির ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে এবং প্রত্যেক ফকীহ্ নিজের মানদণ্ড অনুযায়ী বাছাইয়ের নিয়ম কানুন ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। কিছু সংখ্যক লোক দলীলরূপে হাদীস গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বসেছিলেন। কিন্তু উম্মতে মুসলিমার ফকীহ্ গোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং তাঁরা ওদের কঠোর সমালোচনা করেন। এমনকি ইমাম শাফেঈ রহ. ও অন্যেরা হাদীস অস্বীকারের এই মতবাদকে পথভ্রষ্টতা হিসেবে গণ্য করেছেন।

(খ) কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সানকে ইসলামী ফিক্‌হের উৎস হিসেবে গণ্য করার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। মুহাদ্দিসগণ কিয়াস ব্যবহার করার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করেন। ইমাম শাফেঈ রহ. ইস্‌তিহ্‌সানের বিরোধিতা করেন। যাহেরীয়া (ইমাম দাউদ যাহেরীর নামের সাথে সম্পর্কিত) যিনি দলীলের শাব্দিক অর্থের উপর নির্ভর করতেন, কিয়াস অস্বীকার করেন।
উল্লেখ্য, নিঃসন্দেহে এযুগে কিয়াস খুব বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। এতে হানাফীদের অংশ অনেক বেশী। হাম্বলী ও মালিকীদের অংশ সে তুলনায় অনেক কম। আর শাফেঈদের অংশ দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি।

(গ) ইজমা'র শর্তসমূহের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়। এ জন্য ফিক্‌হী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে।

(ঘ) ফিক্‌হী কোন হুকমের কী মর্যাদা এবং কী দলীলে তা নিরূপিত হলো এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। যেমন, কোন বিষয়টি ওয়াজিব এবং ওয়াজিব বলে গণ্য হতে হলে কীরূপ দলীলের প্রয়োজন হয়, ফকীহ্‌গণ এর নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন।

উল্লেখ্য, এই চতুর্থ যুগের ফকীহ্‌গণ উসূলে ফিক্‌হের বিষয়ে অসংখ্য কিতাব লেখেন। অসাধারণ সাফল্যের সাথে তাঁরা ইসলামী জ্ঞানের শাখাটির গ্রন্থণা করেন। পরবর্তী আলিমগণ এ ব্যাপারে পথ নির্দেশ লাভ করেন। এরি ভিত্তিতে তাঁরা ফিক্‌হী হুকুম উদ্ভাবন (استنباط) করতে থাকেন।

৫. এই যুগে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনাভঙ্গি এবং কতখানি জোরালো ভাষায় কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা কর্ম নিষেধ করা হয়েছে ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রেখে কর্মের শ্রেণীবিভাগ সূচক পরিভাষা যেমন ফরয (فرض), ওয়াজিব (واجب), সুন্নাত (سنة) , মুস্‌তাহাব (مستحب) , মানদূব (مندوب) , হারাম (حرام) , মাকরূহ (مكروه) ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়। এতেও কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

এ চতুর্থ যুগের বিখ্যাত ফকীহ্গণ

১. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর যুগে কূফায় আরো তিন জন বড় বড় ফকীহ ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন :

- সুফয়ান ইবনে সাঈদ ছাওরী রহ.
- শারীক ইবনে আব্দুল্লাহ নাখঈ রহ.
- মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা রহ.
- ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও এদের মধ্যে প্রায়ই 'ইলমী বিতর্ক ও আলোচনা চলতে থাকতো। ইমাম আবূ হানীফার শাগরিদদের মধ্যে যারা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা হচ্ছেন–
- আবু ইউসূফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আনসারী রহ.
- মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে ফরকদ শাইবানী রহ.
- যুফার ইবনে হুযাইল ইবনে কায়স কূফী রহ.
- হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুয়ী কূফী রহ.

২. ইমাম মালিক ইবনে আনাস ইবনে আবী আমের রহ., মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ উভয় দলে তাঁর বহু শাগরিদ রয়েছেন। কারণ ইমাম মালিকের মধ্যে ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস উভয়েরই গুণাবলী ছিল।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেঈ রহ.। তিনি শাফেঈ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইরাক ও মিসর উভয় এলাকায় তাঁর শাগরিদদের সংখ্যা ছিল প্রচুর।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইবনে হালাল রহ.। মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ উভয় দলে তাঁর শাগরিদদের সংখ্যাও যথেষ্ট।

খ্যাতির সাধারণ কারণসমূহ

এ চারজন ইমামের মাযহাব খ্যাতি অর্জন করে এবং জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। এদের ফিক্‌হ্ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং টিকে থাকে। এদের খ্যাতি লাভে সাধারণ কারণগুলো নিচে দেয়া হলো :

১. এদের সমস্ত 'রায়' অর্থাৎ প্রদত্ত বিধানগুলো সংগৃহীত হয়েছিল। পূর্ববর্তী ইমামদের বিধান বিক্ষিপ্ত থেকে যায় এবং সে জন্য তারা খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি।

২. এদের শাগরিদগণ সমাজে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তাঁরা নিজেদের উস্তাদগণের রায় জনগণের সামনে তুলে ধরলে তাকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়। শাগরিদগণ উস্তাদগণের রায় প্রচারে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন।

www.pathagar.com

৩. কোনো কোনো মাযহাবের উদারতার কারণে এবং জনগণের প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা বেশী থাকায় তা সরকারী আইনে পরিণত হয়।

যায়দিয়া ও ইমামিয়া সম্প্রদায়ের খ্যাতি

এযুগে শিয়াদের দুই সম্প্রদায় যায়দিয়া ও ইমামিয়া এবং তাদের মাযহাব দু'টো খ্যাতি লাভ করে। যায়দিয়া সম্প্রদায়টি যায়দ ইবনে আলী ইবনে হুসাইনের নামের সাথে সম্পর্কিত। এই সম্প্রদায়ের ইমামদের জন্য ইজতিহাদ ছিল অপরিহার্য। একারণে তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক স্বাধীন রায়ের যোগ্যতা সম্পন্ন ইমামের জন্ম হয়েছে। তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ইমামগণ বেশী প্রসিদ্ধি অর্জন করেন :

১. আল হাসান ইবনে আলী ইবনে হাসান যায়েদ রহ.
২. আল হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ রহ.
৩. কাসিম ইবনে ইবরাহীম রহ.
৪. হাদী ইয়াহয়া ইবনুল হাসান ইবনুল কাসিম রহ.

ইমামিয়া সম্প্রদায়ের বুনিয়াদ ছিল প্রধান দুইটি আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত;

এক : ইমাম অবশ্যই মা'সুম (معصوم) তথা নিষ্পাপ হবেন, সুতরাং রসূলুল্লাহ স.-এর বংশধর হবেন।

দুই : আলী রা. রসূলুল্লাহ স.-এর وصى অর্থাৎ অসিয়্যতের মাধ্যমে মনোনীত ইমাম বা খলীফা। তার অধিকার হরণ করে আবু বকর রা. প্রমূখেরা অবৈধ ভাবে খিলাফত পরিচালনা করেছেন।

ইমামিয়াদের যে শাখা বারজন ইমামের প্রবক্তা (ইছনা আশারিয়া اثنا عشرية) তাদের সবচেয়ে বড় ইমাম ছিলেন আবদুল্লাহ জাফর সাদেক এবং তার পিতা আবু জাফর মুহাম্মদ বাকির (প্রসঙ্গত : ইমামিয়াদের অন্য শাখাটির নাম সাবইয়া (سبعية) অর্থাৎ সাত ইমামের প্রবক্তা; ইমামিয়াদের বিশ্বাস, দ্বাদশ অথবা সপ্তম ইমাম গায়েব হয়ে গেছেন। শিয়াদের আরো অনেক ফেরকা রয়েছে।

কোনো কোনো মাযহাব নিশ্চিহ্ন

কয়েকটি মাযহাব কিছুকাল যাবৎ অনুসৃত হয়েছিলো কিন্তু পরবর্তীকালে চারটি মাযহাবের প্রভাব বেড়ে গেলে অন্য মাযহাবগুলো বিলুপ্ত হয়। বিশুদ্ধ মাযহাবগুলোর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকীহের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. আবূ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল-আওযাঈ (اوزاعى) রহ.
২. আবূ সুলাইমান দাউদ যাহেরী (ظاهرى) রহ.
৩. আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (طبرى) রহ.

www.pathagar.com

কাল্পনিক অবস্থাভিত্তিক ফিক্‌হ

এ যুগের ফিক্‌হের গ্রন্থাদিতে অনেক কল্যাণ ভিত্তিক বিধান স্থান পেয়েছে অর্থাৎ প্রশ্ন জাগবার পূর্বে কল্পনা করে তার বিধান নির্দেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইরাকের ফকীহদের স্থান সর্বাগ্রে। তাদের প্রদত্ত এমন কিছু বিধান আছে যা বহু যুগ অতীত হবার পরও হয়ত প্রয়োগের অবকাশ বা ক্ষেত্র তৈরী হবে না। এতে ফিক্‌হের ব্যাপকতা বেড়েছে। অন্যদিকে পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যে পরনির্ভরতা এবং সহজে কর্মসাধন প্রবণতা অর্থাৎ ইজতিহাদ বিমুখিতা সৃষ্টি হয়েছে।

এই চতুর্থ যুগের ইসলামী ফিক্‌হের এই সমুদয় রচনাবলী সংরক্ষিত রয়েছে যা অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনায় সমৃদ্ধ। নিচে আমরা ইসলামী ফিক্‌হের উৎস বর্ণনা করছি। এরি মাধ্যমে ফিক্‌হের এই সমগ্র জ্ঞান ভাণ্ডার অস্তিত্বলাভ করেছিল।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ফিক্হের উৎস

ইসলামী ফিক্হের উৎস (مأخذ)

'উৎস' বলতে এমন উপায়-উপকরণ বুঝানো হয়, যা থেকে আইন সংগ্রহ অথবা এমনসব স্থানকে বুঝানো হয়, যেখান থেকে দলীল সহকারে আইনলাভ করা হয়। যে শাস্ত্রে এই উপায়-উপকরণ ও স্থানসমূহের আলোচনা হয়, তাকে বলা হয় 'উসূল আল-ফিক্হ' (اصول الفقه)। ফকীহদের ভাষায় এর সংজ্ঞা হচ্ছে :

هو علم بقواعد يتوصل بها الى استنباط الاحكام الفقهية عن دلائلها

> "উসূলে ফিক্হ হচ্ছে এমন কতিপয় মূলনীতির জ্ঞান যার মাধ্যমে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বিধি-বিধান উদ্ভাবন পদ্ধতির জ্ঞানলাভ করা যায়।"[১]

এ শাস্ত্রটি বিধি-বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নিয়মাবলীর কাজ করে। এটিকে জ্ঞানের একটি শাখারূপে গ্রন্থায়ন একমাত্র ইসলামেরই কৃতিত্ব। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ অনুশীলনের অভাবে এর পুনর্গঠন এবং পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যাতে এটি প্রগতিশীল মন এবং সমাজ ব্যবস্থাকে আত্মস্থ করতে পারে।

আইনের কিতাবগুলোয় দুই ধরনের উৎসের বর্ণনা পাওয়া যায় :

১. বিমূর্ত উৎস;

২. মূর্ত উৎস।

১. বিমূর্ত উৎস হচ্ছে, আইনের এমন একটি উৎস যার মাধ্যমে সে তার বৈধতা ও প্রভাব অর্জন করে।

২. মূর্ত উৎস আইনের সেই সব উৎসকে বলা হয় যেগুলো থেকে আইন তার উপাদান লাভ করে।[২]

এভাবে একটির মাধ্যমে উপাদান ও উপকরণ সংগৃহিত হয় এবং অন্যটির মাধ্যমে আইনের ভূমিকা, স্থান ও মর্যাদা নির্মিত হয়। মুসলিমের জন্য ইসলামী ফিকহের বিমূর্ত উৎসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা। আর অমুসলিমের জন্য এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাষ্ট্রের সন্তুষ্টি ও ইখতিয়ার লাভ করা।

---

১. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ৬ এবং শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ

২. উসূলে কানূন, পৃ. ১৮৯

www.pathagar.com

যেমন : প্রত্যেক ধর্ম ও মিল্লাতের জন্য পার্থিব ও দেশজ আইনের বিমূর্ত উৎসের উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রের সন্তুষ্টি ও ইখতিয়ার লাভ করা।

ইসলামী ফিক্‌হের উৎস সংখ্যা

ইসলামী ফিক্‌হের উৎস (مأخذ) মোট বারটি :

১. আল-কুরআন
২. আস-সুন্নাহ বা হাদীস
৩. ইজমা' (اجماع / ঐকমত্য)
৪. কিয়াস (قياس / সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রয়োগের বিধান)
৫. ইস্‌তিহ্‌সান (استحسان / জনকল্যাণের বিবেচনায় বিধান উদ্ভাবন)
৬. ইস্‌তিদ্‌লাল (استدلال / দলীলের আশ্রয় গ্রহণ)
৭. ইস্‌তিস্‌লাহ (استصلاح / জনকল্যাণের বিবেচনা)
৮. সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের মত (رأى)
৯. তা'আমুল (تعامل / ব্যবহারিক প্রচলন)
১০. 'উরফ (عرف) ও রসম (رسم) রেওয়াজ (رواج)
১১. পূর্ববর্তী শরীয়ত
১২. দেশজ আইন

উসূলে ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে কেবল প্রথম চারটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে, কোনো কোনো উৎস অন্য কোনোটির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। যেমন : কিয়াসের আওতায় পড়ে ইস্‌তিহ্‌সান, ইস্‌তিদ্‌লাল ইত্যাদি। তেমনি ইজমা'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা'আমুল ও রসম-রেওয়াজ। পূর্ববর্তী শরীয়তগুলো তাদের উৎস কুরআন এবং সুন্নাতের পরিসরে দাখিল হয়ে যায়। দেশজ আইনও তা'আমুলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিদের রায় যদি কিয়াসভিত্তিক হয়ে থাকে তাহলে তা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যথায় তা শ্রুতিনির্ভর হাদীসের আওতাধীনে এসে যাবে। ইস্‌তিদ্‌লালও কিয়াসের নিকটবর্তী, যদিও তার অর্থ কিয়াসের চাইতে বেশি ব্যাপক। প্রথম চারটি উৎসের মধ্যে স্তর ও মর্যাদার দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে, বরং আসল উৎস হচ্ছে শুধু কুরআন-সুন্নাহ। তার ব্যাখ্যা এবং কর্মজীবনে বাস্তব রূপদানের দৃষ্টিতে তার বিশ্লেষণেরই নাম। এজন্যই সুন্নাতের কোনো কোনো ব্যাখ্যা সাময়িক ও স্থানীয়, আবার কোনো কোনোটি নীতিগত ও চিরন্তন। বিধানদানের ক্ষেত্রে উভয় বৈশিষ্ট্যের বিবেচনা করা হয়।

www.pathagar.com

রোমান আইনের উৎসের বিবরণ

এ প্রসঙ্গে রোমান আইনের উৎসগুলোর আলোচনা আকর্ষণীয় হবে এবং আলোচ্য বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে পারে। উৎসগুলো হচ্ছে :

১. Jus Givile Papirianus নামক গ্রন্থ যার মধ্যে অধিকাংশ ধর্মীয় বিষয়সংক্রান্ত আইন লেখা ছিল। এই ধর্মীয় বিধানগুলোকেই ফাস (Fas) বলা হয়।

২. ফকীহ্ ও মুজতাহিদগণের ফাতওয়া। এই ফকীহ্গণকে আবার তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে :

(ক) প্রথম যুগের জ্ঞানী আলেম ও ফকীহ্বৃন্দ। তাঁরা বারোটি ফলক (Twelve Tafles)-এ বিধৃত আইনের ব্যাখ্যা করতেন। তাঁদের এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে নতুন বিধি-বিধান সংবলিত একটি বিরাট সংকলন তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

(খ) পূর্ববর্তী ফকীহ্গণ। এদের নিম্নলিখিত কাজের ধরন দেখে এদেরকে প্রায় উকীলদের সমগোত্রীয় বলে মনে হয়। যেমন :

এক : আইনসংক্রান্ত বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া;

দুই : মামলার প্রাথমিক পর্যায়গুলোয় মক্কেলের স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করা;

তিন : আদালতে মামলার তদারক করা;

চার : কখনো কখনো এরা আইন সংক্রান্ত পুস্তিকা সংকলন করতেন এবং কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় লিখিত ফাতওয়াও দিতেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ববর্ণিত দায়িত্বই এরা পালন করতেন।

৩. নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদগণ। এরা আইনের মূলনীতি রচনাকালের লোক ছিলেন। কাজটি শুরু হয় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভে। এদের ওপর ছিল নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ :

(ক) রোমীয় আইনের উন্নতিবিধান;

(খ) সংকলিত আইন সমষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান;

(গ) আইনের আধুনিক ব্যাখ্যা দেয়া এবং অবস্থা অনুযায়ী তাকে নতুন আঙ্গিকে সাজানো;

(ঘ) আইন প্রণয়ন ছিল সর্বোচ্চ পরিষদের কাজ। সম্রাট ও তাঁর বিশেষ পারিষদবর্গ এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল;

www.pathagar.com

(ঙ) গণপরিষদের কাজ : অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিবাসীদের জেলাওয়ারী বিভক্তির ভিত্তিতে এ পরিষদটি প্রতিষ্ঠিত ছিল;

(চ) নেতৃ-পরিষদ (Senate)-এর কাজ : আইনসংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ আলোচনার উদ্দেশ্যে এই পরিষদে পেশ করা হতো এবং তাদের সম্মতিক্রমে সেগুলো জারি করা হতো। রোমের বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠিত হতো। রাজা নির্বাচন ও তাঁকে পরামর্শ দেয়া ছিল এর কাজ। পরে এই পরিষদ রাজার কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে;

(ছ) রাজকীয় ফরমানগুলোর রক্ষণ;

(জ) ম্যাজিস্ট্রেটগণের নির্দেশাবলির সংকলন;

(ঝ) রসম ও রেওয়াজ সংগ্রহ। এটি হচ্ছে আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস। প্রত্যেক যুগে এর অস্তিত্ব ছিল।[৩]

রোমান আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর একটি অংশ ধর্মভিত্তিক যা অনিবার্যভাবে সামগ্রিক আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এবার আমরা ইসলামী ফিক্‌হের প্রত্যেকটি উৎসের বিশদ আলোচনা করবো। এর পরর্বতী অধ্যায়ে আসবে ফিক্‌হের প্রত্যেকটি উৎসের আলোচনা।

---

৩. খুসূসি কানূনে রূমা, পৃ. ২৪

www.pathagar.com

আল-কুরআন : ফিক্‌হের প্রথম উৎস

ইসলামী ফিক্‌হের মূল উৎস (مأخذ)

কুরআন হচ্ছে ইসলামী ফিক্‌হের মূল উৎস। মূলনীতি (اصول) ও ব্যাপক নীতিসমূহ (كليات)[১] এই কিতাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র কর্মকৌশল ও বিধান (Constitiution) এই কিতাবের আলোচ্য বিষয়। বিধানগুলোর শাখাপ্রশাখা (جزئيات)-এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে খুব কমই করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা শাতিবী রহ. বলেন :

> فالقرآن على اختصاره جامع ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات
>
> "কুরআন মাজীদ সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক (جامع) কিতাব। আর এ ব্যাপকতা বা পূর্ণতা তখনই সম্ভব যখন তার মধ্যে থাকে কেবল মৌলিক বিষয়ের সমাহার"।[২]

আর এক জায়গায় তিনি বলছেন :

> تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية
>
> "কুরআন হাকীমে শরীয়তের বিধানসমূহ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৌলিক পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। যেখানে কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেখানে তা কোনো মৌলিক বিষয়ের অধীনেই করা হয়েছে"।[৩]

কুরআন মাজীদ যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের সর্বশেষ সংস্করণ এবং এর পর আর কোনো নবী আসবেন না, কোনো কিতাবও অবতীর্ণ হবে না, তাই প্রতি যুগে এর শিক্ষা ও নীতিমালার প্রয়োগের উপযোগিতা অপরিহার্য। এটা সম্ভবপর যদি মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগের ব্যাপ্তি নির্ধারণের পর তার সীমারেখা চিহ্নিত করা হয় এবং মানবজীবনের এই মানচিত্রে রং চড়ানোর দায়িত্ব সোপর্দ করা হয় বিভিন্ন কালের আলিমগণের ওপর, যাঁরা তা করবেন অবস্থা ও কালের চাহিদার প্রেক্ষিতে। বাস্তবে তাই হয়েছে।

কুরআনী মূলনীতি ও মৌলিক বিধানাবলী সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কিন্তু তাদের ইজতিহাদ প্রসূত শাখা-প্রশাখায় পরিবর্তনশীল সমাজের সমস্যাদি

---

১. كل = সমগ্র, كلى = সামগ্রিক, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বহুবচনে كليات; جزء = অংশ, جزئى = আংশিক, বহুবচনে جزئيات

২. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

www.pathagar.com

সমাধানের তাগিদে পরিবর্তন আসতে পারে। এর বিপরীতে যদি শুরুতেই খুঁটিনাটি বিষয়াদির অবতারণা করা হতো তাহলে প্রথমত কুরআনের গঠনতান্ত্রিক (Constitutonal) রূপটি বিনষ্ট হতো এবং দ্বিতীয়ত যদি ধরা যায় যে, আল্লাহ তাঁর প্রবর্তিত কুরআনের মৌলনীতি ও বিধানগুলোকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করে দিলেন যাতে সর্বকালের সব সমস্যার সমাধান মিলে, আল্লাহ্‌র পক্ষে তা অসাধ্য কিছু নয়, কিন্তু বান্দার পক্ষে যে অতিবিশালকায় কুরআন শেখা এবং ইঙ্গিত বিধান খুঁজে বের করা সম্ভব হতো কি? অন্যপক্ষে যদি কয়েকটি যুগের প্রয়োজন মতো সম্প্রসারণ করে দিতেন তা হলে কুরআন অপূর্ণ থেকে যেত। আল্লাহ তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষকে বিচারবুদ্ধি এবং বিবেক সম্পন্ন করে তৈরি করেছেন। যদি মানুষ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত মৌলনীতি ও সামগ্রিক (كلى) বিধানগুলোর প্রয়োগ সংক্রান্ত ধারা-উপধারা প্রণয়ন করতে না পারে, তাহলে তাঁর এই সেরা সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়?

কুরআনের এ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ যথা: কুরআন সরকারের প্রকৃতি ও ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে, এর রূপ হবে খিলাফতের অর্থাৎ জমিনে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব এবং আমানতদারীর রূপ, মানুষের ঐক্য এবং সাম্যই হবে এর ভিত্তি, ইনসাফের মাধ্যমে সরকার মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করবে। এ কথাও বলে দিয়েছে যে, সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের মধ্যমণি হবে 'শুরা' (شورى), যাকে পার্লামেন্ট বলা যেতে পারে। কিন্তু শুরার প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে তা বলে দেয়া হয়নি। সরকার প্রচলিত অর্থে গণতান্ত্রিক হবে, না একনায়কত্বমূলক রাজতান্ত্রিক, না সামরিক কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক? এসব কথার ফায়সালাও দেয়া হয়নি। জনগণের মতামত জানার জন্য কোন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে; তা-ও মানুষের সংবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কুরআন বলে দিয়েছে, সব সম্পদের মালিক আল্লাহ, ধনীর ধনে বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। কিন্তু ধনের বণ্টনের এবং বঞ্চিতের অধিকার আদায়ের, অধিকন্তু জনগণের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সাংগঠনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন তার রূপরেখা কুরআন নির্ধারণ করে দেয়নি, মানুষ তার উদ্ভাবনী শক্তি তথা ইজতিহাদের মাধ্যমে বায়তুল মাল, আদালত ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে-অবশ্য ইজতিহাদের শামিল ছিল পরিস্থিতি ও সময়ের বিবেচনা।

কুরআন প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে যে ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে এবং যে ধরনের সরকার ব্যবস্থা পরিচালনা করে কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জন করা যায় তাকে কুরআনী হুকুমাত বা কুরআনী সরকার বলা হবে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ফকীহগণ জুযইয়াত (جزئيات)-এর গবেষণা বা ইজতিহাদের মাধ্যমে যে বিরাট কার্য সম্পাদন করেছেন, তা সবই ছিল তাঁদের যুগ ও অবস্থার সাথে

www.pathagar.com

সামঞ্জস্যশীল। আজো আমরা মূলনীতি ও মূল লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী ফকীহদের রচিত বিধি-বিধানের আলোকে নিজেদের যুগের অবস্থা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রচনা করতে পারি কিংবা পূর্ববর্তীদের বিধি-বিধানের অনুসরণ করতে পারি। আমাদের রচিত বিধি-বিধান কিংবা আমাদের প্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক কাঠামো তাও চূড়ান্ত ও চিরন্তন হবে না, বরং নির্ভরশীল হবে সময় ও সমাজের অবস্থার ওপর এবং টিকে থাকবে সময় ও সমাজ যতদিন অনুমতি দেবে ততদিন, কিন্তু মৌলনীতি ও বিধানগুলো চিরন্তন।

আসলে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ নির্ভর করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গণ-চেতনার ওপর, কোনো দেশের অনুকরণের ওপর নয়। তাই যখন গণ-চেতনায় পরিবর্তন আসবে তখন অনিবার্যভাবে পুরাতন কর্মপদ্ধতির পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন দেখা দেবে।

ফকীহের জন্য কুরআনের সাথে সম্পর্কিত উসূলে ফিক্‌হের ব্যাখ্যা জানা অপরিহার্য

কুরআনের যেসব অংশের সাথে ফিক্‌হী বিধানের সম্পর্ক রয়েছে, ফকীহগণ সেইসব অংশের আলোচনা করেছেন। এসব অংশে প্রায় পাঁচশতের মতো আয়াত রয়েছে। এ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত কথাগুলো জানা জরুরী :

১. নাসিখ (ناسخ) অর্থাৎ যে আয়াত অপর কোনো আয়াতের বিধানকে মওকুফ (স্থগিত) করে দেয় ও মানসুখ (منسوخ) অর্থাৎ যে আয়াতের বিধান মওকুফ (স্থগিত) হয়ে গেছে।

২. মুজমাল (مجمل) অর্থাৎ যে আয়াতের বিধান সংক্ষিপ্ত এবং মুফাস্‌সার (مفسر) অর্থাৎ যে আয়াত সংক্ষিপ্ত নয়, বরং ব্যাখ্যা সংবলিত।

৩. আম (عام) ব্যাপক অর্থবোধক এবং খাস (خاص) বিশেষ অর্থবোধক।

৪. মুহ্‌কাম (محكم) অর্থাৎ যেসব আয়াত কর্মজীবনের বুনিয়াদ স্বরূপ এবং বোধগম্য; মুতাশাবিহ (متشابه) অর্থাৎ ঈমানী বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যমূলক বিধানের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং সহজবোধ্য নয়।

৫. যেসব আয়াতে মানুষের কর্মের কথা রয়েছে, ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক-সেসব কর্মের আদেশগুলো কোন পর্যায়ের ফরজ? ওয়াজিব? সুন্নাত? মুস্তাহাব? এবং নিষেধগুলো কোন পর্যায়ের? হারাম? মাকরূহ ? ইত্যাদি।

ফকীহগণ এগুলো ছাড়া আরো বহু বিষয় বিশ্লেষণ করেছেন, প্রমাণ, প্রয়োগ এবং বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ফকীহ ও মুজতাহিদের জন্য সেগুলোর জ্ঞান অর্জন জরুরী।

www.pathagar.com

কুরআনী আহকামের সামগ্রিক রূপ

উসূলে ফিক্‌হের কিতাবগুলোয় ফকীহগণের বর্ণনার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। এখানে আমি কেবল কতিপয় বুনিয়াদী বিষয়ের আলোচনা করেই ক্ষান্ত হবো। এ বিষয়গুলো ফকীহ্‌দের দৃষ্টিতে ছিল কয়েকটি মৌলিক কথা। ফিক্‌হের বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করার সময় তারা এগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য গণ্য করেছিলেন।

কুরআনের আয়াতের আকারে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ ও পরিচ্ছন্ন বিষয় অবতীর্ণ হয়েছিল দীনের পরিপূর্ণতার পর্যায়ে তা যতই বিধানরূপে প্রতিভাত হোক না কেন, মৌলিক শিক্ষার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, তার মধ্যে এমন একটিও ছিল না যা বিশ্ববাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ প্রেক্ষিতে কুরআন অবতীর্ণের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যগুলো প্রতিভাত হয় :

১. পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারের পর আল্লাহ্‌র হেদায়াতের যে অংশ বাকি ছিল তা পূর্ণ করা;
২. যে অংশ বাড়ানো বা কমানো হয়েছিল তাকে সুস্পষ্ট করা;
৩. যে অংশ বিস্মৃত করা হয়েছিল তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া;
৪. ভুলক্রমে মানব যেসব বাঁধনে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়েছিল সেগুলো থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়া।

উপরোল্লিখিত বর্ণনার সমর্থনে কুরআন মাজিদের সূরা আল-আরাফ-এর ১৫৭ নং আয়াতের কথা অনুধাবন করা যেতে পারে :

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ

তিনি রসূলুল্লাহ স. লোকদের মারূফ তথা সৎকাজের হুকুম দেন,

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ

তিনি তাদেরকে মুনকার তথা অপকর্ম থেকে বিরত রাখেন,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

তিনি পাক-পবিত্র বস্তুগুলো তাদের জন্য হালাল করে দেন,

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

অপবিত্র বস্তুগুলো তিনি তাদের জন্য হারাম করে দেন,

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

তিনি তাদের বোঝা অপসারণ বা লাঘব করে দেন,

وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

যে-সব শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল তিনি সেগুলো সরিয়ে দেন।

www.pathagar.com

মারূফ ও মুনকারের ব্যাখ্যা

'মারূফ' বলতে বুঝায় জানা ও পরিচিত বস্তু বা বিষয়, আর 'মুনকার' হচ্ছে অপরিচিত এবং দোষাবহ বলে যাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্র হেদায়েতের প্রদীপ অনবরত প্রদীপ্ত থাকার কারণে ইতিহাসের প্রতি যুগে নৈতিক মূল্যবোধের ধারা অনেকাংশে সজীব থেকেছে এবং নৈতিক চরিত্র বিনাশী বস্তু-বিষয়ের সাথেও অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা পরিচিত থেকেছে। এ কথা স্বতন্ত্র যে, মানুষ স্বার্থ ও লালসার প্রাধান্যের কারণে মারূফ ছেড়ে মুনকার কর্মে লিপ্ত হয়েছে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে আসলের গায়ে নকলের আবরণ লেপ্টে গেছে। তাই বলে ন্যায়সম্মত বিষয়ের পরিচয় কখনও সাকুল্যে ঘুচে যায়নি।

এ প্রসঙ্গে 'আরবের অবস্থা বেশি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও মূসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ব্যাপারে এটা কেমন করে ধারণা করা যেতে পারে যে তারা নৈতিকতার গুরুত্ব ও উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে পুরোপুরি অনবহিত থেকেছেন? ঐ দুই নবীর নির্দেশিত কতগুলো কর্ম এবং কতক নৈতিক ধ্যানধারণা আরবদের সমাজে প্রচলিত ছিল যদিও তার ওপর শিরক এবং কুসংস্কারের প্রলেপ পড়েছিল।

উল্লিখিত মা'রূফ বলতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বুঝা যাবে :

১. সেই সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী যেগুলো আরবের অথবা দুনিয়ার যে-কোনো অংশে বিরাজিত ছিল;
২. আসমানি শরীয়তের এমন অনেক বিষয় যেগুলো লুপ্ত হয়নি এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানের হিকমতের সাথে সামঞ্জস্যশীল;
৩. রসম-রেওয়াজ ও এমন সব দেশজ আইন যেগুলো ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতি ও সুস্থবুদ্ধির (عقل سليم) সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল।

অনুরূপভাবে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর বিপরীতধর্মী অথবা তার বিরোধী যাবতীয় ব্যাপার মুনকার-এর অন্তর্ভুক্ত। মুফাসসির আবু বকর আল-জাস্সাস রহ. মারূফ শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন :

والمعروف هو ما حسن في العقل فعله و لم يكن منكرا عند ذوي العقول الصحيحة

"সুবুদ্ধি যেটা করা পছন্দ করে এবং ভারসাম্যপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারীদের দৃষ্টিতে যেটা মুনকারের অন্তর্ভুক্ত নয় সেটিই হচ্ছে মা'রূফ"।[৪]

উক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যেক যুগের রসম-রেওয়াজ, দেশীয় আইন ইত্যাদি সুবুদ্ধি ও শরীয়তের বিরোধী নয়, সেগুলোকে মারূফের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে।

---

৪. আহকামুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৩৮

www.pathagar.com

কুরআনের এই পরিভাষাগত শব্দ মারূফ (معروف) অত্যন্ত ব্যাপক এবং এতে দেশজ আইন ও উত্তম রেওয়াজাদির স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ.-এর কথা :

كلمة جامعة لجميع جهات الأمر بالمعروف

"এ শব্দটি আমর বিল মারূফের সকল বিভাগের জন্য ব্যাপক"।[৫]

রসূলুল্লাহ্ স. এর ব্যাপকতাকে সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

التعظيم لأمر الله تعالى ، والشفقة على خلق الله

"আমর বিল মারূফের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ।"[৬]

এই সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থ সরকারি ও আইনগত পর্যায়ে একটি ব্যাপক অধ্যায় সৃষ্টি করে।

তায়্যিবাত ও খাবায়িস

'তায়্যিবাত'[৭] বস্তু বা বিষয়সমূহ ও 'খাবায়িছ'[৮] বস্তু বা বিষয়সমূহ শব্দ দু'টোও মুফাস্‌সিরগণের মতে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

المراد من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع

"সুস্থ প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষ যে সমস্ত জিনিসকে পাক-পরিচ্ছন্ন মনে করে সেগুলোই হচ্ছে তায়্যিব।"[৯]

তদ্রুপ খাবায়িছ সম্পর্কেও বলা হয়েছে :

كل ما يستخبثه الطبع وتستقذره النفس كان تناوله سبباً للألم

"সুস্থ প্রকৃতির মানব যেসব জিনিসকে অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন মনে করে এবং প্রকৃতিস্থ হৃদয়ও যাকে নাপাক মনে করে এবং যা গ্রহণ করা কষ্টের কারণ হয়, সেগুলো হচ্ছে খাবায়িছ-এর অন্তর্ভুক্ত।"[১০]

---

৫. তাফসীরে কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২-৩

৬. প্রাগুক্ত; আমরা এই শব্দে হাদীসটি কোন হাদীসের গ্রন্থে খুঁজে পাইনি। তবে বেশ কিছু তাফসীরের কিতাবে যেমন তাফসীরে কাবীর-এ সনদ বিহীন ভাবে রাসূল স.-এর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭. طيبات = পাক-পরিচ্ছন।

৮. خبائث = অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন।

৯. তাফসীরে কাবীর, খ. ৪, এবং শায়খ জাদা আলী কৃত তাফসীর বায়যাবীর ফুটনোট, পৃ. ২৫৭

১০. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত বক্তব্যের ইঙ্গিত

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বিকৃতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এমন এক সমাজকে সম্বোধন করে معروف - منكر - طيبات এবং خبائث ইত্যাদি শব্দ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়েছিল। জীবন তাদের পাপে পরিপূর্ণ হলেও সে সমাজে যদি মৌলিক মূল্যবোধের ধারণা আদৌ না থাকতো তাহলে এ ধরনের বক্তব্যে সেখানে আরো বেশী গোমরাহী ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা ছিল। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য রসূলুল্লাহ স. সেখানে স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন ঠিকই। তবুও একেবারে অজ্ঞ, ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য ইত্যাদির ধারণা বিবর্জিত একটি মানব সমাজকে সম্বোধন করার জন্য উল্লিখিত পরিভাষাগত শব্দগুলোর ব্যবহারের কোনো সার্থকতা থাকতো না। তাদের মধ্যেও সুস্থ-প্রকৃতি এবং عقل سليم-এর অধিকারী কিছু সংখ্যক লোক বিদ্যমান ছিল এবং সেই সমাজে সাধারণভাবে معروف ও منكر, طيبات ও خبائث-এর মানদণ্ড একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই সে সমাজের কতিপয় বিধি-বিধান, রসম ও রেওয়াজ কল্যাণকর এবং ফিক্‌হে ইসলামীতে স্থান লাভ করেছিল।

বোঝা (اصر) ও শিকলের (اغلال) ব্যাখ্যা

اصر এবং اغلال শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে এমনসব বিধান ও কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঠিন্য এবং যেগুলো অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য।[১১] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ যে আলোচনা করেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ :

ধর্মীয় বিধানের অযথা কড়াকড়ি, এমনসব বিধিনিষেধ যেগুলোর পালন সম্ভব নয়, দুর্বোধ্য 'আকিদা-বিশ্বাসের বোঝা, কুসংস্কারের স্তূপ, 'আলেম ও ফকীহদের অন্ধ অনুকরণের বেড়ী, নেতাদের দাসত্বের শিকল- এগুলোই হচ্ছে সেই اصر এবং اغلال যা ইহুদী ও 'ঈসায়ীদের মন-মস্তিষ্ককে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। ইসলামের নবীর স. দাওয়াত তাদেরকে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি তাদের এমন সহজ সত্য পথ দেখিয়েছেন, যে পথে বুদ্ধির ওপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় না, আমল বা কাজের ক্ষেত্রেও কোনো অযথা কড়াকড়ি করা হয় না। এই বোঝা কী ছিল? এই ফাঁদ (শিকল) কী ছিল? কুরআন এ থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে? কুরআন অন্যত্র এ বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে সহজ সরল ভারসাম্যপূর্ণ পথ বলে আখ্যায়িত করে, তার রাস্তাগুলোও ছিল দিনের মতে উজ্জ্বল।[১২]

শাহ্‌ ওলীউল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ.-এর বক্তব্য

উপরে কুরআন অবতীর্ণের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে শাহ্‌ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য তাঁর সমর্থনে পেশ করা যেতে পারে :

---

১১. নূরুল আনওয়ার, পৃ. ১৭১

১২. তরজুমানুল কুরআন, খ. ২

www.pathagar.com

أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالملة الحنيفية الإسماعيلية لإقامة عوجها وإزالة تحريفها وإشاعة نورها ، وذلك قوله تعالى : { ملة أبيكم إبراهيم } ولا كان الأمر على ذلك وجب أن تكون أصول تلك الملة مسلمة ، وسنتها مقررة إذ النبي إذا بعث إلى قوم فيهم بقية سنة راشدة ، فلا معنى لتغييرها وتبديلها ، بل الواجب تقريرها ، لأنه أطوع لنفوسهم وأثبت عند الاحتجاج عليهم

"রসূলুল্লাহ স.-কে পাঠানো হয়েছিল সরল সোজা ইবরাহীমী মিল্লাত দিয়ে (যা আরবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল), মিল্লাতের বক্রতাকে সোজা করার জন্য, তার বিকৃতি দূর করার জন্য, তার আলো বিকিরণের জন্য। এটিই আল্লাহ্‌র বাণীতে 'মিল্লাতা আবীকুম ইবরাহীম' (ملة ابيكم ابراهيم)-বাক্যটির অর্থ। এই যখন অবস্থা ছিল তখন নিশ্চয়ই মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলনীতিগুলো স্বীকৃত ছিল এবং তার সুন্নতগুলো প্রতিষ্ঠিত ছিল। কারণ নবী যখন এমন কোনো জাতির মধ্যে আগমন করেন, যাদের মধ্যে আগের শরীয়তের কিছু সুন্নত অবশিষ্ট থাকে, যেগুলোর মধ্যে পরিবর্তনের কোনো অর্থ হয় না, বরং কর্তব্য হলো সে সুন্নতগুলোকে কায়েম রাখা; কারণ ঐগুলো সে সমাজের জন্য অধিকতর সুখকর এবং প্রমাণ প্রয়োগের পক্ষে অধিকতর মজবুত হয়।"[১৩]

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন,

"জাহেলি যুগে এমন লোক একেবারে বিরল ছিল না যারা নবীদের আগমনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করত, পুরস্কার ও শাস্তির সম্ভাব্যতা মানত, নেকী ও কল্যাণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে লোকদের সাথে লেনদেন করত। তবে তাদের মধ্যে দু'টি দলের উদ্ভব হয়েছিল। একদল ছিল ফাসিক (فاسق) এবং অন্য দলটি ছিল যিন্দিক (زنديق), যারা ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলিমদের ক্ষতি এবং তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতো। ফাসিকদের ওপর পাশব প্রবৃত্তি ও বর্বরতার প্রাধান্য ছিল। অন্যদিকে যিন্দিকদের চিন্তা ও মনন বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।"[১৪]

শাহ সাহেব অন্যত্র বলেছেন :

وكثيراً ما يستدل هذا النبي في مطالبه بما بقي عندهم من الشريعة الأولى

"অনেক সময় এই নবী তাঁর দাবীগুলোর সমর্থনে দলীল পেশ করতেন পূর্ববর্তী শরীয়তের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তার মাধ্যমে।"[১৫]

---

১৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, পৃ. ১২৪

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

এ কারণেই কুরআন মাজীদে বিভিন্ন নবীর সম্বন্ধে আলোচনার পর রসূলুল্লাহ স.-কে তাঁদের অনুসৃতির হুকুম দেয়া হয়েছে। যথাঃ

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"তুমি তাদের হেদায়েতের অনুসরণ করো।"[১৬]

মোটকথা এভাবে নবী স. আল্লাহ্ প্রদত্ত হিকমত ও মূলনীতির ভিত্তিতে পূর্ববর্তী শরীয়তের নীতিমালা এবং নতুন বিধি-বিধানের সমন্বয়ে অবস্থা ও যুগের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের প্রকাশ করেন।

কুরআন মাজীদ নাযিলের সামাজিক পঠভূমি

সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিলকৃত কুরআনের বিধানসমূহকে দু'টো বড় বিভাগে বিভক্ত করা যায় :

(এক) রসূলুল্লাহ স.-এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ আয়াত এবং আহকাম প্রথম বিভাগে পড়ে। মুষ্টিমেয় মুসলিম ও তাদের জামা'আতটি সবেমাত্র প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল। তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনা তখনো সম্যক জাগ্রত হয়নি। অন্যপক্ষে ইসলামের প্রচারে পর্বতপ্রমাণ বাধা। এ অবস্থায় প্রয়োজন ছিল এমন কতিপয় মৌলিক 'আকিদা ও আমলের প্রচার যা চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ঐক্য ও এককেন্দ্রিকতা সৃষ্টি করতে পারে। নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সমাজের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উন্মেষ ঘটাতে পারে। তাছাড়া জরুরী ছিল কিছু সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা যা থেকে লোকেরা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত হয় এবং কুসংস্কারের জাল থেকে বেরিয়ে যথার্থ সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

সুতরাং এই প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মাজীদের যে সব সূরা নাযিল হয় তাতে ছিল তাওহীদ, রিসালাত, কর্মফল, নৈতিক গুণাবলী, অতীত জাতিসমূহের উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিকাহিনী, আল্লাহ্র সর্বময় ক্ষমতা ও সৃষ্টিকৌশলের সবিস্তার বর্ণনা এবং কিছু চারিত্রিক নির্দেশাবলী। মোটকথা এ পর্যায়ে অবতীর্ণ কুরআনের সূরাগুলোতে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তা অনেকাংশে জাতির কাছে স্বীকৃত ছিল এবং তার গুরুত্ব, ফায়দা ও প্রকৃত তাৎপর্য অস্বীকার করা তাদের জন্য ছিল বড়ই কঠিন।

জাতীয় ও সামাজিক জীবনে এই প্রাথমিক পর্যায়টি সবচেয়ে বেশী নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এ পর্যায়ের যথাযথ সংগঠনের ওপরই জাতির সাফল্য ও উন্নতি নির্ভর করে। আর এর মধ্যে সামান্যতম ভুল-ভ্রান্তির

১৬. সূরা আল-আন'আম : ০৯

www.pathagar.com

পরিণাম ভোগ করতে হয় চিরকাল। কুরআন মাজীদের ৩০ ভাগের প্রায় ১৯ ভাগই এই মক্কা যুগে নাযিল হয় এবং পূর্বোক্ত কয়েকটি বিষয়ে ছিল সীমাবদ্ধ। এই অংশ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট ছন্দময় আয়াত সমৃদ্ধ, সূরাগুলো সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণভাবে এখানে يايها الناس (হে মানবজাতি!) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

(দুই) দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে রসূলুল্লাহ স.-এর মাদানী জীবনে অবতীর্ণ সূরাগুলো। হিজরতের সময় পর্যন্ত সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে পরিবেশ পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন ও সুগঠিত হয়ে ওঠেছিল, তাদের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। হক (حق) ও বাতিলের (باطل) মধ্যে পার্থক্য করার প্রবণতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন প্রয়োজন দেখা দেয় সত্যানুসারীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন কায়েম করার। এর জন্য জীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত মৌলিক হেদায়াতের প্রয়োজন ছিলো। তাই কুরআনের এই অংশে সাধারণত এই বিষয়গুলোই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিবৃত হয়েছে এবং সেখানে সম্বোধনও করা হয়েছে يايها الذين امنوا বলে। এটিকে রসূলুল্লাহ স.-এর জীবনের মাদানী যুগ বলা হয়। এই যুগের সূরাগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ ও বিস্তারিত হেদায়াত সম্বলিত। এভাবে কুরআন মাজীদ ২৩ বছরে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। ১৩ বছর মক্কী যুগ এবং ১০ বছর মাদানী যুগ।

উভয় যুগের বিধান ও নির্দেশনামায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

উভয় যুগের বিধান ও মূল নির্দেশনামা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুধাবন করা জরুরী :

১. মৌলিক ও সাধারণ বিধানের ক্ষেত্রে মানব-প্রকৃতির কোন্ কোন্ দিকের বিবেচনা করা হয়েছে?

২. আয়াত নাযিলের পটভূমি কী এবং কোন্ কারণ তার পেছনে কার্যকর ছিল?

৩. আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থার কতটা বিবেচনা করা হয়েছে এবং সামাজিক বিবর্তনের ধারায় কোন্ আইন কয়টি সোপান অতিক্রম করেছে?

৪. একটি নির্দেশের পরে সমপর্যায়ের আর একটি নির্দেশ কিসের ভিত্তিতে এসেছে?

৫. বিধানের মধ্যে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের মতো কোন্ কোন্ হিকমত ও কারণ নিহিত রয়েছে?

৬. মৌলিক (اصول) ও ব্যাপক নীতি (كليات) সমূহের মধ্যে কোন ধরনের প্রাণসত্তা (روح) সক্রিয় রয়েছে এবং তারা কোন্ প্রকৃতির সন্ধান দেয়?

৭. আইনের শাখা-প্রশাখা (جزئيات) কোন্ প্রাণসত্তার প্রকাশক এবং সেগুলোর ওপর সামাজিক রীতি-রেওয়াজের প্রভাব কতখানি?

www.pathagar.com

৮. কোন্ বিধানসমূহের কায়া ও প্রাণ উভয়ই উদ্দেশ্য এবং কোন্গুলোর শুধুমাত্র প্রাণই উদ্দেশ্য, কায়া উদ্দেশ্য নয়?

আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে কুরআনের মূলনীতি

কুরআন মাজীদের প্রাণসত্তা ও মূলনীতিগুলোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, আইনের এই উৎসটি আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মানবিক স্বভাব প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত নীতিগুলোর বিবেচনা অপরিহার্য গণ্য করেছে :

(১) সংকীর্ণতা বর্জন (عدم حرج)
(২) কষ্টের স্বল্পতা (قلة تكلف)
(৩) পর্যায়ক্রমিকতা (تدريج)
(৪) নাসখ (نسخ)
(৫) শানে নুযূল (شان نزول)
(৬) হিকমত ও 'ইল্লত (حكمة و علة)
(৭) আরবের সামাজিক অবস্থা (معاشرتی حالة)

প্রথম মূলনীতি : সংকীর্ণতা বর্জন

ইবনে আব্বাস রা. এবং আয়েশা রা. حرج এর অর্থ করেছেন ضيق তথা সংকীর্ণতা ও সংকুচিত অবস্থা।[১৭] অর্থাৎ আইন এমন হতে হবে যা সহজসাধ্য, তাতে এমন কাঠিন্য না থাকে যা মানুষের সহ্য সীমার বাইরে অথচ তার কোনো সঙ্গত সমাধান না থাকে। এই নীতির সমর্থন পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"তোমাদের জন্য আল্লাহ তার দীনকে সহজ করতে চান, কষ্ট সাধ্য করতে চান না।"[১৮]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহ দীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।"[১৯]

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

"আল্লাহ তোমাদের কোনো কঠিন অবস্থায় ফেলে দিতে চান না বরং তোমাদের পাক পবিত্র করাই তার উদ্দেশ্য।"[২০]

---

১৭. দেখুন, তাফসীরে কাশশাফ, পৃ. ২৯২, তাফসীরে কবীর, খ. ৬, পৃ. ১২৮ এবং তাফসীরে কবীরের পাদটীকা, পৃ. ৩৮০

১৮. সূরা আল-বাকারা : ১৮৫

১৯. সূরা হাজ্জ : ৭৮

২০. সূরা মায়েদাহ : ৬

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ স. আবু মূসা আশআরী রা. ও মু'আয ইবনে জাবাল রা.-কে শাসন দায়িত্ব অর্পণ করতে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন :

يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا

"তোমরা (মানুষের জন্য তাদের কর্মকে) সহজ করো, কঠিন করো না, উৎসাহ দান করো, ঘৃণার উদ্রেক করো না। মতৈক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করো, বিরোধ সৃষ্টি করো না।"[২১]

আর একবার তিনি বলেন :

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

"আমাকে সরল-সোজা সহনশীল শরীয়ত দিয়ে পাঠানো হয়েছে।"[২২]

এ সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে :

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

"আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় হচ্ছে সহজ সোজা সহনশীল দীন"।[২৩]

আর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"ইসলামে (নিজে) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও (অন্যকে) ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো অবকাশ নেই।"[২৪]

মিসওয়াক সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. বলেন :

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَة

"যদি আমার উম্মতের কষ্ট হবে এ ভয় আমার না থাকতো তাহলে আমি প্রত্যেক নামাযের সময় তাদের মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম।"[২৫]

কা'বার একটি অংশকে (হাতীম) কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. আয়েশা রা. কে যা বলেন তাতে দেখা যায়, জনগণের মধ্যে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল :

لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ

"যদি তোমার কওমের সবেমাত্র কুফরী থেকে ইসলামে প্রবেশ করার ব্যাপারটি না হতো, তাহলে আমি কা'বাকে ভেঙে ইবরাহিমী ভিতের ওপর

---

২১. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার, বাব : মা ইউকরাহু মিনাত তানাযুঈ ওয়াল ইখতিলাফি ফির হারবি ওয়াল উকূবাতি মান আসা ইমামাহু, হাদীস নং-২৮৭৩

২২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২২২৯১

২৩. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আদ-দীনু ইউসরুন, সংক্ষিপ্ত সনদে বাব নং-২৮

২৪. সুনানুদ দারাকুতনী, কিতাব : আল-বুয়ূ', হাদীস নং-২৮৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৮৬৫

২৫. সুনানু আবি দাউদ, কিতাব : আত-তাহারাহ, বাব : আস-সিওয়াক, হাদীস নং-৪৭

www.pathagar.com

তাকে পুনর্নির্মাণ করতাম (এবং হাতীমকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করতাম যদি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকতো।)[২৬]

রসূলুল্লাহ স.-এর একটি সাধারণ রীতি ছিল,

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

যখন তাকে দু'টি জিনিসের মধ্যে তাকে একটি নির্বাচন করার এখতিয়ার দেয়া হতো, তিনি অধিকতর সহজটি গ্রহণ করতেন। যদি তার সাথে গোনাহ বিজড়িত না হতো।[২৭]

এই বিস্তারিত আলোচনার অর্থ এ নয় যে, শরীয়তের বিধি-নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে মামুলি ধরনের কষ্টও বরদাশত করার অবকাশ নেই। অথবা কোনো কঠিন সঙ্কট ও সঙ্কীর্ণ অবস্থার মুখোমুখি হলে তা উত্তরণের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তার যুগোপযোগী সমাধানের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার নির্দেশ থাকেনা। তাই যদি হয়-مكلف بالشرع অর্থাৎ শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো অর্থই থাকে না।

দ্বিতীয় মূলনীতি : কষ্টের স্বল্পতা

এটা সঙ্কীর্ণতা বর্জনের নীতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ আইনে যে পরিমাণ সঙ্কীর্ণতা থাকবে ঠিক সেই পরিমাণ কষ্টও বেড়ে যাবে।

নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এই নীতিটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে :

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সামর্থের বেশী দায়িত্ব চাপান না।"[২৮]

মুফাসসিরগণ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ মানুষকে তার শক্তি অনুযায়ী অর্থাৎ যতটুকু সে সহজে বরদাশ্‌ত করতে পারে সে পরিমাণ দায়িত্ব চাপান, এমন নয় যাতে নিঃশেষে সর্বশক্তি ব্যয় করতে হয়।[২৯]

আর একটি আয়াত হচ্ছে :

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا

---

২৬. সহীহ মুসলিম, কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : নাকযুল কা'বাতি ওয়া বিনাইহা, হাদীস নং-৩৩০৪; কা'বার পুন:নির্মাণের সময় কুরায়শগণ নির্মাণ সামগ্রীর অভাবে মূল ভিত্তের খানিকটা অংশ বাইরে রেখে ছিল। চিহ্নিত সে অংশটিকে বলা হয় حطيم

২৭. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-মানাকিব, বাব : সিফাতির নাবিয়্যি স., হাদীস নং-৩৩৬৭

২৮. সূরা বাকারা : ২৮৬

২৯. তাফসীরে কাশশাফ, পৃ. ২৯২; তাফসীরে কাবীর; খ. ৬, পৃ. ১২৮; তাফসীরে কাবীর, ফুটনোট, পৃ. ৩০০

www.pathagar.com

"আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান, মানুষকে (প্রকৃতিগতভাবে) দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৩০]

রসূলুল্লাহ স.-কে নবুওয়ত দানের অন্যতম উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন :

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"রসূলুল্লাহ স. তাদের বোঝা নামিয়ে দেন এবং শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন (তাদেরকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ তাদের ওপর যে সব কঠিন ব্যবস্থা চাপান হয়েছিল এবং যাজকশ্রেণী তাদেরকে যে সব শিকলে আবদ্ধ করেছিল, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. তা থেকে তাদের রেহাই দেন।"[৩১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নানা ব্যাপারে (রাসূলকে) প্রশ্ন করো না, (তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে) যদি তোমাদের কাছে সব কিছু প্রকাশ করে দেয়া হয় তাহলে তোমরা মুশকিলে পড়বে (দীন তোমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হবে), যদি কুরআন নাযিলের সময় তোমরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করো তাহলে তোমাদের কাছে (সে সব প্রশ্নের উত্তরও) প্রকাশ করে দেয়া হবে (তাতে দীনে জটিলতা সৃষ্টি হবে)।"[৩২]

রসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নলিখিত উক্তি থেকে উল্লিখিত মূলনীতির প্রতি তার শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার তিনি বলেন :

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رُخْصَةً لَكُمْ لَيْسَ بِنِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا

"আল্লাহ কতগুলো ফরয নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাকে নষ্ট (অমান্য) করো না. কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেগুলো অতিক্রম করো না, কতগুলো জিনিস হারাম করে দিয়েছেন সেগুলোর ব্যতিক্রম করো না। আর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্মৃতি ছাড়াই নিরবতা অবলম্বন করেছেন, তোমাদের প্রতি মেহেরবানি করার জন্য সেগুলো সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ো না (তাতে দীনের মধ্যে অনাহুত জটিলতা সৃষ্টি হবে)।"[৩৩]

---

৩০. সূরা নিসা : ২৮

৩১. সূরা আ'রাফ : ১৫৭

৩২. সূরা মায়েদাহ : ১০১

৩৩. আস-সুনানুল কুবরা, কিতাব : আয যাহায়া, বাব : মা লাম ইউযকারু তাহরীমুহু ...., হাদীস নং-২০২১৭

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ স. এই ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করতে গিয়ে বলেন :

فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

"তোমাদের আগে যারা ছিল তারা অতিরিক্ত প্রশ্ন করে এবং নবীদের সাথে মতবিরোধ সৃষ্টি করে ধ্বংস হয়ে গেছে।"[৩৪]

তিনি আরো বলেন :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ

"দীন হচ্ছে সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি দীনে জটিলতা সৃষ্টি করে, দীন তাকে পরাভূত করে।"[৩৫]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা জানা যায় যে, শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সহজ সাধ্যতার নীতি অবলম্বন করেছেন।

তৃতীয় মূলনীতি : পর্যায়ক্রম

কুরআনী বিধানসমূহ ২৩ বছর সময়কালে অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়। প্রথম দিকের বিধানসমূহ 'আকীদা-বিশ্বাস ও 'ইবাদত-বন্দেগীর সাথে সম্পর্কিত ছিল। পরে অবতীর্ণ বিধানগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পারিবারিক, সামাজিক, তামাদ্দুনিক এবং রাষ্ট্রিয় বিষয়াদি। 'আকাইদ শিক্ষা ও 'ইবাদাত অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন যতই সুগঠিত হতে থেকেছে এবং মানুষের গ্রহণ ক্ষমতা ও সহনশীলতা যতই বেড়েছে সেই অনুপাতে তার জন্য তেমন খাদ্যের ব্যবস্থাও হয়েছে।

যেমন প্রথম দিকে শিশুর জন্য শুধু তরল দুধের ব্যবস্থা করা হয় এবং পরে ক্রমে ক্রমে অধিকতর পুষ্টিকর অপেক্ষাকৃত অথচ গুরুপাক খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয় শিশুর শারীরিক চাহিদা ও হজম শক্তির বিবেচনায়, তেমনি শরীয়তের আদেশ-নিষেধও পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। শিশুকে ক্ষতিকর খাদ্য ও অভ্যাস থেকেও বিরত রাখা হয়। এভাবে একসময় শিশুটি খাদ্য হজম করার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। এরপরও খাদ্য দেবার ব্যাপারে তার স্বভাব ও প্রকৃতির প্রতি পুরোপুরি নজর রাখা হয়। অর্থাৎ একই সঙ্গে কোনো কঠিন খাদ্য দেওয়া হয়নি এবং বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যও কখনো একই সাথে পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়নি। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আদেশ ও নিষেধের পর্যায়ক্রমিক উন্নতির স্তর অতিক্রম করানো হয়েছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের আহকাম, এমনকি নামায-রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদির আদেশসমূহ এবং মদ, ব্যভিচার, জুয়া ইত্যাদির নিষেধমূলক বিধানসমূহের ক্ষেত্রেও এই পর্যায়ক্রমিকতা নীতি অবলম্বিত হয়েছে।

---

৩৪. সহীহ্ মুসলিম, কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : ফারযুল হাজ্জি মাররাতান ফিল উমরি, হাদীস নং-৩৩২১

৩৫. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আদ-দীনু ইউসরুন, হাদীস নং-৩৯

www.pathagar.com

উপরোল্লিখিত নীতি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিধানদাতাদের মধ্যে একটি মানসিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে, আর তা হচ্ছে এই যে, সমাজবদ্ধ জীবনে শৃঙ্খলা, কল্যাণ আর শান্তির গরজে আইনের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং মানুষের সহজাত ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত শান্তি প্রবণতা এবং কল্যাণকামিতা থেকেই আইনের উদ্ভব হয়। আর সেই আইনই সফল হয় যা মানুষের প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতাজাত প্রবণতাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রাখে। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনবিধান ইসলামের আহকাম প্রবর্তনের মূলে এই যে পর্যায়ক্রমিকতা নীতি তাও পরিপূর্ণতার দাবীদার এবং সহায়ক। কোন কোন মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন :

إن الله تعالى لم يدع شيئا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة ، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة ، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة

"মর্যাদা ও কল্যাণের হেন বস্তু নেই যা আল্লাহ এই উম্মতকে দান করেননি। শরীয়ত ব্যবস্থা (বিধি-বিধান) তিনি একই সংগে নাযিল করেননি বরং পর্যায়ক্রমে একের পর এক ওয়াজিব করেছেন, এটিও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী।"[৩৬]

এই প্রসঙ্গে হযরত আয়েশার রা.-এর নিম্নখিলিত বাক্যগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট :

إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لا تَزْنُوا لَقَالُوا لا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا

"প্রথমে মুফাস্‌সাল (مفصل) সূরাগুলো (সূরা হুজুরাত থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত) নাযিল হয়। সেগুলোতে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা রয়েছে। তারপর লোকেরা যখন ইসলামের দিকে এগিয়ে এলো তখন হালাল ও হারামের বিধানগুলো নাযিল হয়। যদি মদ্যপান নিষেধের বিধানটি প্রথম দিন নাযিল হতো তাহলে লোকেরা বলতো, আমরা কখনো মদ ছাড়বো না। অনুরূপভাবে প্রথম দিনই যিনা ব্যভিচার হারাম হবার বিধান নাযিল হলে লোকেরা বলে উঠতো, আমরা কখনো যিনা থেকে বিরত হবো না।"[৩৭]

আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পর্যায়ক্রমিক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাছাড়া শুরুতে আইনের সংখ্যা কম হওয়া উচিত যাতে সহজে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে এবং তা বাস্তবে মেনে চলার ক্ষেত্রে বেশী সমস্যা ও সঙ্কটের সৃষ্টি না হয়। বাস্তব জীবনে আইনের রূপায়ণের দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মানুষকে আইনানুগ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রসূলুল্লাহ স. এবং সাহাবা রা. তাই তো করেছিলেন সবিশেষ নিষ্ঠার সাথে।

---

৩৬. তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৫২

৩৭. সহীহুল বুখারী, কিতাব : ফাযাইলুল কুরআন, বাব : তালীফুল কুরআন, হাদীস নং-৪৭০৭

www.pathagar.com

চতুর্থ মূলনীতি : নাসখ (রহিতকরণ)

نسخ-এর আভিধানিক অর্থ মুছে ফেলা, রহিত করা, কপি করা। ফিক্‌হের পরিভাষায় নাসখের দু'টি অর্থ :

(এক) প্রথম হুকুমটি পরবর্তী হুকুমটির দ্বারা পুরোপুরি রহিত হয়ে যাবে;

(দুই) অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম হুকুমটিতে কোনো প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হবে। অর্থাৎ প্রথম হুকুমটি যদি 'আম তথা ব্যাপক হয় তাহলে খাস তথা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করতে হবে, মুতলাক[৩৮] হলে তা মুকায়্যিদ[৩৯] হয়ে যাবে। মোটকথা, পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম হুকুমটিকে সীমিত অর্থে গ্রহণ এবং প্রয়োগ করাই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার নাসখ। প্রথম প্রকারের নাসখ-এর সম্পর্ক পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের সাথে, যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

"আমরা (আল্লাহ) যে আয়াত নাকচ করি অথবা ভুলিয়ে দিই, তার চাইতে উত্তম বা সমতুল্য আয়াত তদস্থলে নাযিল করি"।[৪০]

উল্লেখ্য পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তে মানসূখ[৪১] হয়েছে বললে বুঝতে হবে, মৌলিক 'আকাইদ যথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি এবং মুখ্য আহকাম যথা সালাত, সাওম, যাকাত ইত্যাদি বাদে অন্যান্য আহকাম রহিত হয়েছে। উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে গবেষক মুফাসসিরগণের মত প্রতিফলিত হয়েছে আবূ বকর জাস্‌সাস রহ.-এর নিম্নোক্ত কথায় :

وأن جميع ما ذكر فيها من النسخ فإنما المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدمين

"আয়াতে যে নস্‌খের কথা বলা হয়েছে তাতে পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়ত মানসূখ হবার কথা বুঝানো হয়েছে।"[৪২]

আবু মুসলিম ইসপাহানী রহ. (মৃত্যু ৩২২ হি.) এই মতটিই পোষণ করেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে কুরআন হাকীমের যে আয়াতগুলোকে অনেকে মানসূখ গণ্য করেছেন সেগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে আবু মুসলিমের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি তাঁর উক্তিতে কুরআনের আয়াত মানসূখ না হবার মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম রাযী এ প্রসঙ্গে আবু মুসলিম বর্ণিত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে ইমাম সাহেবের মতও যে মানসূখ না হবার দিকে তা বুঝা যায়।

---

৩৮. مطلق = নিঃশর্ত, Absolute
৩৯. مقيد = শর্ত সাপেক্ষ।
৪০. সূরা বাকারা : ১০৬
৪১. منسوخ = রহিত।
৪২. আহকামুল কুরআন

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকারের নাসখের সম্পর্ক শরীয়তে মুহাম্মাদীয়ার সাথে। কিন্তু এই নসখের অর্থ আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ নির্ধারণ। ফকীহগণের মতে এই নাসখের অর্থ 'বায়ান' (বর্ণনা বা ব্যাখ্যা)। এতে কোন আয়াতের হুকুম একেবারে নাকচ বা রহিত হওয়া বোঝায় না, 'উলামা-এ সালাফ'[৪৩]-এর মত হচ্ছে :

> وهو رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع فهذا كثير من السلف يسميه نسخ
>
> "(নাস্‌খের অর্থ হচ্ছে) দৃশ্যমান (শাব্দিক) অর্থের বর্জন- تخصيص বা সীমিত করণের দরুণ কিংবা تقييد বা শর্তারোপের মাধ্যমে অথবা مانع বা প্রতিবন্ধকতার কারণে-এটিই 'উলামা-ই-সালাফের অধিক সংখ্যকের মতে নাস্‌খ নামে অভিহিত।"[৪৪]

আল্লামা ইবনে কায়্যিম রহ.ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন :

> ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه
>
> "প্রথম যুগের 'আলেমগণের (سلف) অধিকাংশই 'নাসেখ ও মানসূখ' বলতে কখনো পুরোপুরি নস্‌খ তথা বাতিল হওয়া বুঝাতেন, (মুতাআখ্‌খিরীন / متأخرين সাহাবা ও তাবে'ঈদের পরবর্তী যুগের 'আলিমগণ)-এর মতে এটিই ছিল নাস্‌খের পরিভাষাগত অর্থ; আবার কখনো তাঁরা 'আম' (সর্বজনীন অর্থে), 'মুতলাক' (সাধারণভাবে যে কোনোটি অর্থে) ও প্রকাশ্য ইত্যাদি অর্থের বিযুক্তিকরণ বুঝাতেন। এর কয়েকটি আকার আছে। যেমন 'আম'কে 'খাস' (বিশেষিত) করা, 'মুতলাক'কে মুকাইয়্যিদ (একটির মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেবার অর্থে) করা অথবা 'মুতলাক' থেকে 'মুকাইয়্যিদের' অর্থই গ্রহণ করা, তাফসীর করা, সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করা, এমনকি পৃথকীকরণ, শর্ত ও গুণবাচক অর্থ বর্ণনা করাকেও তারা 'নস্‌খ' বলতেন। কারণ সবগুলোই বাহ্যিক অর্থের বিযুক্তিকরণ এবং প্রকাশ্য ছাড়া বরং তা থেকে আলাদা হয়ে মূল উদ্দেশ্য বর্ণনার সাথে সংযুক্ত।"[৪৫]

যেহেতু কুরআনী বিধানসমূহ সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে ২৩ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে। সুতরাং পরিবেশ ও পরিস্থিতির অজুহাতে কোনো

---

৪৩. علماء سلف = পূর্ববর্তী যুগের আলিমগণ।

৪৪. ই'লামুল মুওয়াককি'ঈন

৪৫. ই'লামুল মুওয়াককি'ঈন, খ. ১, পৃ. ৩৯

www.pathagar.com

বিধানকে পুরোপুরি বাতিল করে দেবার প্রশ্নই ওঠতে পারে না। এক্ষেত্রে অবস্থা ও চাহিদার বিবেচনায় অথচ শরীয়তের রূহ (প্রাণসত্তা) ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে কোন বিধানকে সম্প্রসারিত করা বা তার ব্যাপকতা খর্ব করা অথবা অনুরূপ প্রায়োগিক ব্যবস্থা করাই হবে নাস্খের উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থাতে রয়েছে ইসলামী ফিক্হের বিবর্তন এবং যুগোপযোগিতা যা তাকে প্রতি যুগে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করার ক্ষমতা সমুন্নত করেছে। এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লবী রহ.-এর একটি ব্যাখ্যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

والثاني : أن يكون شيء مظنة مصلحة أو مفسدة ، فيحكم عليه حسب ذلك ، ثم يأتي زمان لا يكون فيه مظنة لها ، فيتغير الحكم

"দ্বিতীয় (প্রকার নাস্খটি) হচ্ছে সম্ভাব্য কল্যাণের আশা বা ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলে তদনুযায়ী বিধান দান করা, পরবর্তীকালে যখন সে সম্ভাবনা না থাকে তখন বিধান পাল্টে দেওয়া।"[৪৬]

একে প্রকৃত নাস্খ বলা যায় না, কারণ যে সামাজিক অবস্থার কারণে কোনো বিধানের ব্যাপকতা সীমিত করা হলো বা অন্য কোন পদ্ধতিতে নাস্খ করা হলো, সে অবস্থার অবসান হয়ে যদি পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে তখন বিধানের ব্যাপকতা বা পূর্বাবস্থাও ফিরে আসবে, কিন্তু প্রকৃত নাস্খ হলে বিধানের পুনরাবর্তন সম্ভব হতো না। পূর্ববর্তী নবীগণের শরীয়তের নাস্খ প্রকৃত নস্খ। সুতরাং সে সব শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না।

অভিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসক যেমন রোগের সাময়িক নতুন উপসর্গ ঠেকাবার জন্য ঔষধ বদলে দেন, আবার যখন রোগের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরে আসে তখন পূর্বের ব্যবস্থা বহাল করেন, শরীয়তে-মুহাম্মাদীয়ার নাস্খও তদ্রূপ।

নাস্খের উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একটি নীতির সন্ধান মেলে। সেটি হচ্ছে, মুহাক্কিক অর্থাৎ গবেষক 'আলিমগণের সাথে পরামর্শক্রমে, সাময়িক সামাজিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আইন-প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শরীয়তের কোন কোন আহ্কামের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারে, যেমন 'উলামায়ে সালাফ -এর যুগে এই নীতির ভিত্তিতে কাজ হয়েছিল। কাযী বাইযাবীর নিম্নলিখিত উক্তি একথারই ইঙ্গিত বহন করছে :

وذلك لأن الأحكام شرعت ، والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً من الله ورحمة ، وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص ، كأسباب المعاش فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره

৪৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, পৃ. ১২২

www.pathagar.com

"(নাস্‌খ বৈধ এ জন্য যে) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে, বান্দাদের কল্যাণ ও প্রয়োজনে এবং তাদের নফ্‌সের পরিপূর্ণতার জন্য আহ্‌কাম বিধিবদ্ধ হয়েছে, আয়াত নাযিল হয়েছে; আর এই কল্যাণ ও প্রয়োজন ব্যক্তি ও যুগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ বিভিন্ন হয়, এক যুগে যে উপায়-উপকরণ উপকারী হয় তা অন্য যুগে হতে পারে ক্ষতিকর।"[৪৭]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর একক সিদ্ধান্তাবলী এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আসলে এমন ধরনের একক সিদ্ধান্ত নয়, যা কারো ব্যক্তিগত কিয়াস ও রায়ের ভিত্তিতে স্থাপিত হবার কারণে তার গুরুত্ব কম হয়ে যায়। বরং এই নাস্‌খ নীতির আওতায়, শরীয়তের রূহ বা প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ন রেখে, কুরআনী বিধানসমূহকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়াবার প্রয়াসের সর্বোত্তম উদাহরণ ছিল। পরবর্তীদের জন্য 'উমর রা.-এর একক সিদ্ধান্তগুলো পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছে।

এই নাস্‌খ নীতি থেকেই ফকীহগণ ইস্‌তিহ্‌সান, ইস্‌তিস্‌লাহ, তা'দীল[৪৮] রক্ষা ইত্যাদি মূলনীতিসমূহের উদ্ভাবন করেছেন এবং সেগুলোকে 'আইনের উৎস' সমূহের অন্তর্ভুক্তরূপে স্থির করেছেন।

'রদ্দুল মুহতার' প্রমুখ ফিক্‌হ গ্রন্থগুলোতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাতে জনকল্যাণের ভিত্তিতে আইন-প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও এখতিয়ার খুবই ব্যাপক বলে মেনে নেয়া হয়েছে। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-প্রয়োগ কর্তৃপক্ষ কোন কোন জায়েয ব্যাপারকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করতে পারে কিংবা মুলতবী ঘোষণা করতে পারে এই নস্‌খ নীতির প্রেক্ষিতে। ফকীহগণ আইনের ব্যাপকতা সীমিতকরণ (تعميم و تخصيص) ইত্যাদি নাস্‌খনীতি প্রয়োগের যে সব পদ্ধতি স্থির করেছেন সেগুলোকে সাকুল্যে বর্জন করলে লাগামহীন বুদ্ধিবৃত্তি ও ইচ্ছা-প্রবণতার বিধ্বংসী পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

পঞ্চম মূলনীতি : শানে নুযূল (আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট)

শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা নয় বরং অবস্থা ও পরিস্থিতি। কুরআনের সূরাগুলোকে মাক্কী ও মাদানী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা থেকে সাধারণভাবে এবং শানে নুযূল থেকে বিশেষভাবে অবতীর্ণ আয়াত এবং সূরার বক্তব্যের বিষয়সমূহের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ নির্ধারণ করা যায়। তবে শানে নুযূলের আওতায় যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয় আয়াতের লক্ষ্যবস্তু সেসব ঘটনা নয়, বরং লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে জনগণের

৪৭. তাফসীরে বাইযাবী, পৃ. ১৮

৪৮. تعديل = ভারসাম্য।

www.pathagar.com

অবস্থা ও পরিস্থিতি যা বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে পরিস্ফুট হয় এবং যে পরিস্থিতির মুকাবিলায় সংশ্লিষ্ট আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ সমাজ যেসব অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হয় এই ঘটনাবলী সেগুলোরই প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেগুলোকে চিহ্নিত ও উপলব্ধি করার ব্যাপারে ঘটনাগুলো তথ্য সরবরাহ করে।

বর্ণিত এই ঘটনাবলী নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে ঠিক ততখানি যতখানি কুরআন মাজীদের স্পষ্ট বাক্যগুলোর সমর্থন থাকবে তাদের পেছনে। যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শব্দ ও অর্থ থেকে যা প্রকাশিত হয় এই ঘটনাবলী তার বিরুদ্ধতা করছে অথবা কোনো মূলনীতির ওপর আঘাত হানছে তাহলে বর্ণিত ঘটনাবলী কোনো গুরুত্ব লাভ করবে না। বরং সে ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতই হবে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। এ কারণে বিজ্ঞ মুফাস্‌সিরগণের মতে প্রকৃত শানে নুযূল হচ্ছে যা আয়াতের পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং শব্দ ও অর্থের মধ্য থেকে ভেসে ওঠে। আল্লামা সুয়ূতির নিম্নোক্ত বক্তব্য একথা সমর্থন করে :

"যারকাশী রহ. বুরহান-এ লিখেছেন, সাহাবা রা. ও তাবেঈগণ রহ. সাধারণত বলতে অভ্যস্ত ছিলেন, অমুক আয়াত অমুক বিষয়ে নাযিল হয়েছে। এর অর্থ হয়, উক্ত আয়াতটি ঐ বিধান সম্বলিত অর্থাৎ আয়াতটি বিধানের প্রমাণ। আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার বর্ণনা উদ্দেশ্য হয় না এবং ঘটনাটি আয়াতটি নাযিলের কারণও হয় না। আমি বলি, ঘটনা যে সময় সংঘটিত হয়েছে আয়াতটিও ঠিক সেই সময় নাযিল হওয়া অপরিহার্য নয়।"

কুরআনের আয়াত থেকে শানে নুযূল বের করার একটি দৃষ্টান্ত

কুরআনের আয়াত থেকে আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বের করার বিষয়টি একজন অভিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসকের সাথে তুলনীয়। তিনি ব্যবস্থাপত্র দেখেই রোগের সন্ধান পেয়ে যান, যে রোগের জন্য এ ব্যবস্থাপত্রটি লেখা হয়েছে। ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ঔষধগুলোর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তিনি রোগীর মেজাজ ও অবস্থা অধ্যয়ন করে নেন। এই সঙ্গে রোগীর মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে নিজের মতামতের পক্ষে তিনি অতিরিক্ত সমর্থন লাভ করেন এবং এভাবে তার মত সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এভাবে কুরআন হাকীম অধ্যয়ন করার ফলে সবচেয়ে বড় যে লাভটি হবে সেটি হচ্ছে, মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ নীতিগুলো সুস্পষ্টভাবে সামনে ভেসে ওঠবে, এটিই এখানে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ ও সমস্যার সমাধান নির্ণয় সহজ হবে। তাছাড়া পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে ঘটনাবলীকে সংযোজিত করার পথও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর শানে নুযূলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা ও সমর্থনমূলক সুবিধা লাভের সাথে সাথে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাও লাভ করা যাবে। সেটি হচ্ছে, এর মাধ্যমে

www.pathagar.com

কুরআনী বিধানের হিকমত (বিজ্ঞানময়তা) ও ইল্লাত (কার্যকারণ) জানার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপকতা এবং বিধানকে অবস্থা ও চাহিদা অনুযায়ী বাস্তব রূপদানের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ মূলনীতি : হিকমত (حكمة) ও ইল্লাত (علة)- এর বিবেচনা

কুরআনের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে হিকমত ও ইল্লাতের আলোচনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও গভীর। এ দু'য়ের কারণে অতীতের সাথে বর্তমানের সম্পর্কচ্ছেদ হয় না। উম্মতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাবিদগণ এ প্রসঙ্গে বিরাট অবদান রেখেছেন। তাঁরা কুরআনী শিক্ষাকে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রমাণ করে এই জীবন বিধানের চিরন্তনতা ও সর্বজনীনতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।[৪৯] এ প্রসঙ্গে মৌলিক কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন হাকীমের ভাবধারাগত ও বাস্তব ব্যবস্থার ওপর গভীর দৃষ্টির অধিকারী হওয়া যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত হিকমত ও ইল্লাত সন্ধানের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি হতে পারে না। সঠিক দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির জন্য গবেষককে অন্য সব বিষয়ের মধ্যে কুরআন মাজীদে বর্ণিত নিম্নোক্ত ব্যাপারেগুলোর উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে :

১. দীন ও দুনিয়ার সম্পর্ক
২. জীবন ও মৃত্যুর আত্মিক যোগাযোগ
৩. দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তির বিধান
৪. মানসিক পরিচ্ছন্নতা অর্জনের নীতি
৫. প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণের পথ
৬. মানব প্রকৃতি
৭. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের চৌহদ্দি
৮. জীবনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কিত বিধান
৯. পথ প্রদর্শনের পর্যায়ক্রম এবং তার ক্রমবিবর্তন
১০. জাতীয় স্বার্থ ও রাজনীতি এবং
১১. বিধান উদ্ভাবনের পদ্ধতি ইত্যাদি (এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা কিয়াস অধ্যায়ে করা হবে)।

কুরআন হাকীমে এমন বহু বিধান রয়েছে যার মধ্যে ইল্লাত বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ফকীহগণ সেগুলো থেকে দলীল প্রমাণ গ্রহণ ও বিধান উদ্ভাবনের যেসব পদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। অন্যথায় নির্দিষ্ট সীমা ও শর্তের প্রতি দৃষ্টি না থাকার দরুণ ভুল দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের পরিণাম

৪৯. এ ব্যাপারে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী রহ.-এর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থটি অত্যধিক গুরুত্বের অধিকারী।

www.pathagar.com

বিভ্রান্তিকর হয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে কুরআন হাকীম যে বর্ণনাশৈলী অবলম্বন করেছে তাও যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী, গন্তব্যে উপনীত হবার ব্যাপারে তা যথেষ্ট সাহায্য করে।

সপ্তম মূলনীতি : আরবের সামাজিক অবস্থার জ্ঞান

কুরআন হাকীমের খুঁটিনাটি (جزئيات) বিধানের প্রেক্ষিতে আরবের সামাজিক অবস্থার খতিয়ান নিলে দেখা যাবে বিধানগুলোতে আরবের তদানিন্তন সামাজিক অবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আসলে এই আলোচনা আল্লাহ্‌র হেদায়াতের ধরন ও গুণগত অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তাই নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

আল্লাহ্‌র হেদায়াতের সামনে সব সময় দু'টি উদ্দেশ্য দেখা গেছে :

১. মানসিক ও আত্মিক সংস্কার এবং
২. সামাজিক-সাংস্কৃতিক কল্যাণ ও সাফল্য।

এই দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র হেদায়াতে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা সম্পন্ন দুই ধরনের আইন পাওয়া যায় :

১. যার প্রাণশক্তি ও কায়া অর্থাৎ অর্থ ও বাহ্যিক আকৃতি উভয়টিই শরীয়ত নির্ধারণ করেছে এবং উভয়কে উদ্দেশ্যেরূপে গণ্য করেছে।

২. যার কেবলমাত্র প্রাণশক্তিই উদ্দেশ্য, বাহ্যিক আকৃতি উদ্দেশ্য নয়।

প্রথম ধরনের আইন অপরিবর্তনীয় এবং একই অবস্থায় বিরাজিত থাকবে, কোনো প্রকার পরিবর্তন হতে পারে না। আর দ্বিতীয় ধরনের আইনগুলো যেহেতু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও সময়ের সাথে সম্পর্কিত তাই অবস্থার পরিবর্তন ও তামাদ্দুনিক উন্নতির সাথে সাথে তাদের আকার আকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে। আইন প্রবর্তকের পক্ষ থেকে বেকলমাত্র তাদের প্রাণশক্তির স্থায়িত্বের দাবী করা হয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী রহ.-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য এদিকে ইঙ্গিত করে :

أن الشرائع لها معدات وأسباب تشخصها ، وترجح بعض محتملاتها على بعض

"সব শরীয়তেরই কতগুলো কার্যকারণ থাকে। সেগুলো বিধানের আকৃতি নির্ধারণ করে এবং এক সম্ভাবনাকে অন্য সম্ভাবনার ওপর অগ্রাধিকার দেয়।"[৫০]

অন্যত্র তিনি বলেছেন :

يعتبر في الشرائع علوم مخزونة في القوم واعتقادات كامنة فيهم وعادات تتجارى فيهم

---

৫০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ২৭-৯২

www.pathagar.com

"শরীয়ত প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় জাতির সঞ্চিত জ্ঞান, তাদের অন্ত র্নিহিত আকীদা সমূহ এবং তাদের আচার ও আচরণ যার শিকড় তাদের গভীরে প্রোথিত থাকে।"[৫১]

উপরোক্ত প্রথম প্রকারের আইনগুলোর মর্যাদা রূহ ও ভিত্তির পর্যায়ভুক্ত। তার-ই মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রকারের আইনের পলিসি এবং সাংস্কৃতিক কল্যাণের সঠিক দৃষ্টিকোণ নির্ধারিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার আইনে আরবের সামাজিক অবস্থার প্রভাব

একটি সর্বসম্মত বিষয় এই যে, দুনিয়ার কোনো আইনই সমকালীন সমাজের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনা। এজন্য অনিবার্যভাবে আরবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রভাব হিদায়েতে ইলাহীর ওপর পড়েছে।

কোনো আইন প্রণেতা বা আইন প্রণয়ন পরিষদ যখন কোনো দেশের জন্য আইন রচনায় মনোনিবেশ করেন, তখন স্বাভাবিকভাবে সর্বপ্রথম তিনি বা তাঁরা সংশ্লিষ্ট দেশের পূর্ব প্রচলিত বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির প্রতি নজর দেন, কিছু অংশকে হুবহু গ্রহণ করেন, কিছু অংশ সংস্কার করে গ্রহণ করেন এবং কিছু অংশ পুরোপুরি বর্জন করেন। আল্লাহ্‌র হেদায়াতের প্রচারের ক্ষেত্রেও একই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা অপরিহার্য।

আল্লাহ্‌র হেদায়াতে প্রচলিত বিধান ও রীতির বিবেচনা

কিন্তু প্রচলিত বিধান ও রীতি গ্রহণ ও পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সর্বদা দু'টি বিষয় দৃষ্টিপথে থাকে :

(এক) গ্রহণ ও বর্জনের প্রতিটি পর্যায়ে সামাজিক পরিস্থিতি ও গণ-চেতনার অবস্থা সঠিকভাবে নির্ণয় করা;

(দুই) যেসব আইন ও রীতি-নীতি গ্রহণ করে নেয়া হয় সেগুলোকে আল্লাহ্‌র হেদায়াতের প্রাণরসে সিক্ত করা, অর্থাৎ সেগুলোকে আল্লাহ্‌র হেদায়াতের ছাচে এমনভাবে ঢালা হয় যার ফলে সেগুলো আল্লাহ প্রদত্ত ব্যবস্থায় যথাযথ ভাবে খাপ খেয়ে যায়।

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় :

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ

---

৫১. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

"সমস্ত খাদ্যবস্তু বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল, তবে যে খাদ্যবস্তু ইসরাঈল (ইয়া'কুব আলাইহিস সালাম) নিজেই নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন তা ছাড়া।"[৫২]

বোঝা যায় ইয়া'কুব আ. বিশেষ বিশেষ অবস্থাদৃষ্টে কতিপয় খাদ্যবস্তু হারাম করে নিয়েছিলেন। নূহ আলাইহিস সালামের জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। তাদের যৌন শক্তি সংযত করা ও মেজাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে রোযা ইত্যাদির বিধান কঠিন করে দেয়া হয়েছিল। অনুরূপভাবে, মূসা আলাইহিস সালামের জাতি ছিল অত্যন্ত বিদ্রোহী স্বভাবের অধিকারী। তাদের মেজাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্য কঠোর অনুশাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

"ইহুদীদের জুলুমের কারণে আমি কয়েকটি পবিত্র জিনিস তাদের ওপর হারাম করে দিয়েছি, যা (ইতোপূর্বে) তাদের জন্য হালাল ছিল; এজন্যও যে, তারা লোকদেরকে আল্লাহ্র পথে চলতে অনেক বেশী বাধা দিতো।"[৫৩]

রসূলুল্লাহ স. ও বিভিন্ন ব্যক্তির মেজাজ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব চাইতে বড় নেকী কোন্‌টি এই প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। যেমন কোনো ব্যক্তিকে বলেছেন, পিতামাতার সেবাই সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ। কাউকে বলেছেন, জিহাদ, কাউকে ইহ্সান তথা আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গভীরতর করাকে বৃহত্তম নেকী বলেছেন। এভাবে তিনি যে ব্যক্তির জন্য যে জিনিসটির প্রয়োজন বোধ করেছেন, সেই জিনিসটির ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। অবস্থার পরিবর্তনে আইন ও বিধানের মধ্যে পরিবর্তনের দৃষ্টান্তও বহু হাদীসে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

নবীগণ জাতির চিকিৎসক

আসলে নবীগণ হচ্ছেন জাতির চিকিৎসক। তারা জাতির রোগ ও মেজাজ অনুযায়ী খাদ্য ও ওষুধ গ্রহণের পরামর্শ দেন। একজন অভিজ্ঞ ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী চিকিৎসক যেমন রোগীকে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দেবার সময় তার শরীরের উত্তাপ, শীতলতা, শক্তি এবং তার স্বভাব-প্রকৃতি, বয়স ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য মনে করেন ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক চিকিৎসক স্বভাব ও মেজাজকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখার জন্য উপরে উল্লিখিত সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরী মনে করেন এবং ঐগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওষুধ, খাদ্য এবং নিষিদ্ধ খাদ্য ও বিষয়াদি সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন।

---

৫২. সূরা আল-ইমরান : ৯৩

৫৩. সূরা আন-নিসা : ১৬০

www.pathagar.com

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেন :

وإنما مثله كمثل الطبيب يعمد إلى حفظ المزاج المعتدل في جميع الأحوال ، فتختلف أحكامه باختلاف الأشخاص والزمان ، فيأمر الشاب بما لا يأمر به الشائب ، ويأمر في الصيف بالنوم في الجو لما يرى أن الجو مظنة الاعتدال حينئذ ، ويأمر في الشتاء بالنوم داخل البيت لما يرى أنه مظنة البرد حينئذ

"রসূলুল্লাহ স.-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন একজন চিকিৎসক। যিনি সর্ব অবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজ সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তার ব্যবস্থাপত্র ব্যক্তি ও সময়ের ভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যুবকের জন্য তিনি যে ব্যবস্থাপত্র দেন বৃদ্ধের জন্য হুবহু একই ব্যবস্থাপত্র দেন না। গরমকালে উন্মুক্ত স্থানে ঘুমাবার পরামর্শ দেন, কেননা গরমকালে উন্মুক্ত স্থানই ভারসাম্যপূর্ণ শীতকালে ঘরের মধ্যে শয়ন করার নির্দেশ দেন, অবস্থা ভেদে যা ভারসাম্য বজায় রাখার অনুকূল।"[৫৪]

রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র প্রদানের সীমারেখা

কিন্তু রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র প্রদানের ব্যাপারে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ভূমিকা না এমন পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয় যাতে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোনো নীতি নিয়ম নির্ধারণ করার অধিকারী হন, আবার তারা একেবারে এমনঅধীনও নন যাতে প্রত্যেকটি ছোট বড় ফায়সালার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়, বরং ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ্‌র হেদায়াতের মূলনীতি জানিয়ে দেয়া হয়। কোন ব্যাপারে সুস্পষ্ট হেদায়াত এসে গেলে ভালো, অন্যথায় তারা উপরোল্লিখিত মূলনীতির আলোকে নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে ফায়সালা প্রদান করেন। তাদের ফায়সালা হেদায়াতে ইলাহীর মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। যদি কোনো বিশেষ কল্যাণ বা কারণে এই ফায়সালা সাময়িক পর্যায়ের হয় তাহলে যখন এই কল্যাণকারিতা খতম হয়ে যায়, ফায়সালাও খতম হয়ে যায় অথবা এটিকে মুলতবী করে দেয়া হয়। অন্যথায় অন্যান্য ইলাহী আইনের ন্যায় এই ফায়সালার কার্যকারিতাও বর্তমান থেকে যায়।

ইজতিহাদী ভুল সম্পর্কে অবগতি

যদি কোনো সময় অবস্থা পর্যালোচনার ব্যাপারে নবীগণের পদস্খলন হয়ে যায়, যার ফলে কোনো অ-উত্তম ফায়সালা গৃহীত হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। কুরআনের বেশ কয়েকটি উদাহরণে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ স. সমষ্টিগত ব্যাপারে 'রহমত'-এর প্রেরণায় কোনো নিদের্শ দেন, অথচ 'আদল অর্থাৎ

---

৫৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা

ইনসাফের বিবেচনায় নির্দেশটি যথাযথ ছিল না, এমতাবস্থায় ওহীর মারফতই তাঁকে আল্লাহ সে ব্যাপারে অবহিত করেন। অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি এমন কোনো কাজ করলেন যা তাঁর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়। অতএব নিঃসন্দেহে আমরা একথা বলতে পারি যে, নবীগণ ভুল ও স্খলন থেকে সংরক্ষিত থাকেন এবং দীনের ব্যাপারে যেসব কথা তাঁরা বলেন, সেগুলোর মর্যাদা হয় ঠিক নিম্নোক্ত পর্যায়ের-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى

"তিনি নিজের মনগড়া কোনো কথা বলেন না, যা কিছু তিনি বলেন তা সবই তাঁর কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত ওহী।"[৫৫]

উমার ইবনু খাত্তাব রা. বলেন :

إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا إن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف

"দীনের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর রায় সঠিক হবার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাকে পথ দেখিয়ে থাকেন। অন্যদিকে আমাদের রায় আমাদের ধ্যান ধারণার ফসল এবং হুকুম পালনের ব্যাপার।"[৫৬]

প্রচলিত বিধান, রীতিনীতি ও পছন্দনীয় বিষয়ে গ্রহণ-বর্জনের নীতি

নবীগণ প্রচলিত বিধান, রীতিনীতি, প্রিয় ও পছন্দনীয় বিভিন্ন বিষয়কে সমূলে বিনাশ করার জন্য তরবারি উন্মুক্ত করে থাকেন না। কোথাও কোনো কিছু প্রচলিত দেখলেই তাঁরা তখনি তাকে খতম করে দেননি। কোনো জিনিস মানুষের অত্যন্ত প্রিয় দেখলেই সঙ্গে সঙ্গেই তা থেকে তারা মানুষকে বিরত রাখেননি। বরং خذ ما صفا ودع ما كدر (যা কিছু লোকদের মানসিকতার প্রেক্ষিতে পরিচ্ছন্ন তা গ্রহণ করো এবং যা কিছু অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলাটে তা বর্জন করো) নীতি অবলম্বন করেন। যেমন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ রহ. বলেন,

فما كان صحيحا موافقا لقواعد السياسة الملية لا تغيره ، بل تدعوا إليه ، وتحث عليه ، وما كان سقيما قد دخله التحريف ، فإنها تغيره بقدر الحاجة ، وما كان حريا أن يزداد ، فإنها تزيده على ما كان عندهم

"এই সব বিধান ও রীতিনীতির মধ্যে যে কথাগুলো নির্ভুল ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তাঁরা সেগুলোতে কোনো পরিবর্তন সাধন করেন না। বরং তারা সেগুলোর দিকে আহবান জানাতে

---

৫৫. সূরা নাজ্ম : ৫৩
৫৬. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, খ. ১, পৃ. ৩২

www.pathagar.com

থাকেন এবং জাতিকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করতে থাকেন। আর খারাপ বিষয়গুলো অথবা যেসব বিধানকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করা হয়ে থাকে সেগুলোকে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার এবং কাটছাঁট করেন, আবার যেগুলো বাড়াবার প্রয়োজন বোধ করেন সেগুলো বাড়িয়েও দেন।"[৫৭]

মোটকথা, পূর্বের বহু বিধান, রসম-রেওয়াজ এবং জনগণের পছন্দনীয় ও প্রিয় বিষয় আইনের মর্যাদা লাভ করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অংশে পরিণত হয়। আগেই লোকেরা সেগুলো অনুযায়ী কাজ করতে ও জীবন যাপন করতে থাকে। তাই আল্লাহ্‌র হেদায়াত ও নবীগণের শিক্ষা অনুধাবন করার জন্য স্থানীয় অবস্থা, সাময়িক ও যুগপ্রবণতা এবং সামাজিক ও জাতীয় প্রকৃতি, রুচি ও মেজাজ উপলব্ধি করাও অপরিহার্য গণ্য করা হয়।
এখন আমরা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের শেষ ও পূর্ণাঙ্গ আকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

শেষ হেদায়াতের সময় আরবে প্রচলিত আইনের স্বরূপ

রসূলুল্লাহ স.-এর আবির্ভাবকালে আরবে নিম্নোক্ত ধরনের আইন ও বিধান জারী ছিল :

১. বাদীর কাছ থেকে তার দাবী প্রমাণের জন্য সাক্ষী চাওয়া হতো। সাক্ষী না থাকলে এবং বিবাদী বাদীর দাবী অস্বীকার করলে বিবাদীকে কসম করতে হতো।

২. অপরাধের দণ্ড বিধানের নীতি ছিল প্রতিশোধমূলক। আর এটা দিয়াত[৫৮] বা معاوضة (মু'আওয়াযা) বা ক্ষতিপূরণের আকারেও হতে পারতো। চোরের ডান হাত কাটার রেওয়াজ ছিল। যিনাকারীর শাস্তি নির্ধারিত ছিল পাথরের আঘাতে হত্যা। কিন্তু পরবর্তীকালে ত্রিশ ঘা চাবুক মারা হতো ও মুখে চুন-কালি মাখিয়ে ফেরানো হতো।

৩. বিবাহে ইজাব বা কবুলের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং অন্যান্য পদ্ধতিরও প্রচলন ছিল। যথা সাময়িক বিবাহ বা متعة (মুত'আহ)। যে কারণে ব্যভিচারের প্রসার ঘটতো এবং পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতো। অনুরূপভাবে স্ত্রীদের কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না, নিজেদের ইচ্ছায় বিবাহ করার অধিকার মেয়েদের ছিল না। কোনো কোনো মাহ্‌রাম[৫৯]-এর সঙ্গে বিবাহের রীতি ছিল। মোহর (مهر)-এর

---

৫৭. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ৯

৫৮. دية = রক্তপণ।

৫৯. محرم = যার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

ব্যাপারে নারীর অধিকার অত্যন্ত সীমিত ছিল। তালাকের ব্যাপারে পুরুষের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ঈলা,[৬০] যিহার[৬১] ইত্যাদির প্রচলন ছিল।

৪. বায়'[৬২], হিবা[৬৩], রিহান[৬৪], ইজারা[৬৫] ইত্যাদির মাধ্যমে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করার নীতি ছিল। এমনসব শর্তে বেচাকেনা হতো যাতে বিবাদ সৃষ্টি হতো, জুয়া খেলার ব্যাপক প্রচলন ছিল। দ্রব্য বিনিময়ের বহু রীতির মধ্যে কয়েকটির উদাহরণ নিম্নে দেয়া গেল : বায়' সালাম,[৬৬] বায়' সারাফ,[৬৭] পণ্যদ্রব্যের উপর পাথর নিক্ষেপে ক্রয়, পণ্য স্পর্শে বিক্রি (মুলামাসা/ملامسة), বিক্রেতা পণ্যদ্রব্য নিক্ষেপ করলে বিক্রি (منابذة), ক্ষেতের অপক্ব শস্য বা গাছে ঝুলন্ত ফলের শস্য বা ফলের বিনিময় (مزابنة) ইত্যাদি। পূর্বেই বলা হয়েছে কোনো কোনো ধরনের লেনদেন প্রায়শই দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ ও ঝগড়ার সৃষ্টি করতো।

৫. নগদ ভাড়ায় জমি ইজারা (اجارة) বা শস্য ভাগের শর্তে বর্গা দেবার রেওয়াজ ছিল।

৬. ঋণ (قرض) ও সুদের (ربوا) প্রচলন ছিল।

৭. অসিয়্যাত (وصية)-এর মাধ্যমেও সম্পত্তি হস্তান্তর করা হতো।

৮. মামলার বিচার বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গোত্রের সরদার জনমতের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশ দিতো ও তা কার্যকর করার ব্যবস্থা করতো। বহির্ব্যাপারে সরদার গোত্রের প্রতিনিধিত্ব করতো। প্রয়োজনে সরদারের সাহায্যের জন্য বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোকদের একটি মজলিস-ই-শূরা (উপদেষ্টা পরিষদ) গঠন করা হতো। মোটকথা অভ্যন্তরীণ ও বাইরের যাবতীয় বিষয় সরদারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকতো।

স্থানীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রসূলদের কর্মপন্থা কী ছিল তা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যায় :

---

৬০. ঈলা অর্থাৎ কসম করে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্কচ্ছেদ করা।

৬১. যিহার অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের পিঠের (কোন প্রত্যঙ্গের) তুল্য বলে তার সংস্রব ত্যাগ করা।

৬২. بيع = বেচাকেনা।

৬৩. هبة = দান।

৬৪. رهن = বন্ধক।

৬৫. اجارة = ভাড়া।

৬৬. بيع سلم = অগ্রিম মূল্য প্রদান-নির্ধারিত ভবিষ্যতে সামগ্রী হস্তান্তরের অঙ্গিকারমূলক ক্রয়বিক্রয়।

৬৭. بيع صرف = মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি।

www.pathagar.com

والذي أتى به الأنبياء قاطبة من عند الله تعالى في هذا الباب هو أن ينظر إلى ما عند القوم من آداب الأكل والشرب واللباس والبناء ووجوه الزينة ، ومن سنة النكاح وسيرة المتناكحين ، ومن طرق البيع والشراء ، ومن وجوه المزاجر عن المعاصي وفصل القضايا ونحو ذلك . فإن كان الواجب بحسب الرأي الكلي منطبقا عليه ، فلا معنى لتحويل شيء منه من موضعه ولا العدول عنه إلى غيره ، بل يجب أن يحث القوم على الأخذ بما عندهم ، وأن يصوب رأيهم في ذلك ، ويرشدوا إلى ما فيه من المصالح ، وإن لم ينطق عليه ، ومست الحاجة إلى تحويل شيء أو إهماله لكونه مفضيا إلى تأذي بعضهم من بعض أو تعمقا في لذات الحياة الدنيا وإعراضا عن الإحسان ، أو من المسليات التي تؤدي إلى إهمال مصالح الدنيا والآخرة ونحو ذلك - فلا ينبغي أن يخرج إلى ما يباين مألوفهم بالكلية ، بل يحول إلى نظير ما عندهم أو نظير ما اشتهر من الصالحين المشهود لهم بالخير عند القوم

"নবীগণ সবাই মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এ সম্পর্কে যা নিয়ে আসেন তা হচ্ছে: দেখতে হবে কওমের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধান কী রয়েছে পানাহার সম্পর্কে, পোষাক, বাসগৃহ, সাজ-সজ্জা, বিবাহের পদ্ধতি, বিবাহ প্রয়াসী পক্ষদ্বয়ের চরিত্র যাচাই, বেচাকেনার পদ্ধতি, পাপের শাস্তি বিধান, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে; সেগুলো যদি সামগ্রিকভাবে শরীয়তের পলিসির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে কোন পরিবর্তন বা অন্য কোন আইনের প্রবর্তন নিরর্থক হবে, বরং ওয়াজিব হবে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধানের ওপর স্থিত থাকতে তাদেরকে উৎসাহিত করা। তাদের রায়ের যথার্থতা ঘোষণা করা এবং যাতে কল্যাণ রয়েছে তার দিকে তাদেরকে হেদায়াত করা। কিন্তু যদি দেখা যায়, তাদের মধ্যে প্রচলিত বিধি-বিধান শরীয়তের নীতি-পদ্ধতির সাথে বনে না- কারণ সে বিধানগুলো তাদেরকে পারস্পরিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, অথবা তাদেরকে পার্থিব ভোগে নিমগ্ন করে, অথবা সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম (احسان) থেকে বিরত করে অথবা পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রচেষ্টাকে নস্যাত করে ইত্যাদি। যার ফলে এই বিধান ও রীতিগুলোতে পরিবর্তন করা অথবা এগুলোকে পুরোপুরি খতম করে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে নবীগণের পক্ষে সমীচীন হয় না তাদের বিধি-বিধান বহাল রাখা, বরং তারা মনোনিবেশ করবেন তাঁদের কাছে যেসব নযীর রয়েছে তার দিকে অথবা যারা সৎকর্মশীল বলে কওমের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত তাদের কর্মবিধানের নযীরের দিকে।"[৬৮]

অন্যত্র শাহ্ সাহেব রহ. শেষ হেদায়াত প্রসঙ্গে লিখেছেন :

إن كنت تريد النظر في معاني شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتحقق أولا : حال الأميين الذين بعث فيهم التي هي مادة تشريعه ، وثانيا : كيفية إصلاحه لها بالمقاصد المذكورة في باب التشريع والتيسير وأحكام الملة

---

৬৮. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ১০৩

www.pathagar.com

"যদি তুমি রসূলুল্লাহ স.-এর শরীয়তের গভীরতা উপলব্ধি করতে চাও তাহলে প্রথমত যে নিরক্ষর আরবদের কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের অবস্থার অনুসন্ধান চালাও; কারণ তাদের অবস্থাদি তাঁর শরীয়তের উপকরণ স্বরূপ; দ্বিতীয়ত তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারের প্রকৃতি অনুধাবন করো; তবে তুমি দেখবে, শরীয়ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে, বিধানকে সহজসাধ্য করতে গিয়ে এবং তাতে করে মিল্লাতকে মজবুত করার প্রয়াসে কী সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তিনি সামনে রেখেছিলেন।"[৬৯]

ইসলামী বিধানের সর্বকালীনতা ও সর্বজনীনতা

আল্লাহ্র শেষ হেদায়াত ইসলাম যেহেতু শুধু আরবদের জন্য ছিল না বরং দুনিয়ার সমস্ত জাতির জন্য ছিল, তাই এই শরীয়তের মূলনীতি নির্ধারণের বেলায় আরব দেশ ও আরব জাতিসহ পৃথিবীর সব জাতের মানুষের মনন ও স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতি নজর রাখাও ছিল অপরিহার্য, কারণ মানবগোষ্ঠিকে আল্লাহ অভিন্ন মৌলিক উপাদানে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ তাদেরকে এক উম্মত (امة واحدة) বলে ঘোষণা করেছেন। এজন্য এ বিধানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখা হয়েছে :

এক. এমন কোনো নির্দেশ না দেয়া যাতে অসহনীয় কষ্ট ও পরিশ্রম থাকে।

দুই. মানুষের মৌলিক প্রয়োজন, প্রকৃতিগত বাসনা ও প্রবণতার প্রেক্ষিতে এমন কিছু কিছু উপলক্ষ রাখা যাকে জাতীয় ঈদ উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপন করা যেতে পারে এবং এর মধ্যে জায়েয ও মুবাহ্র সীমা অতিক্রম না করে আনন্দ ও সাজসজ্জার অনুমতি দেয়া।

তিন. আনুগত্যমূলক ক্রিয়াদি (طاعات) বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রবণতার প্রতি নজর রেখে কতিপয় সহায়ক এবং উদ্দীপকের অনুমতি দেয়া যাতে দোষাবহ কিছু না থাকে।

চার. স্বাভাবিকভাবে যেসব জিনিস মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও অপছন্দের ভাব সৃষ্টি করে অথবা মানবিক অবৈধ প্রকৃতি ও মেজাজ যেগুলোকে গুরুভার মনে করে সেগুলোকে অবৈধ করা।

পাঁচ. ইস্তিকামা (استقامة)-এর ব্যবস্থা অর্থাৎ মানুষকে হক (সত্য) এবং সত্যবিশ্বাস ও সৎকর্মে অটল রাখার জন্য এবং মনের প্রকৃতিকে ইসলামী ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজে সহায়তার জন্য শিক্ষা লাভ, শিক্ষা দান, সৎ

---

৬৯. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ নিষেধ করাকে সর্বকালীন এবং সর্বজনীন দায়িত্বরূপে স্থির করা।

ছয়. কোনো কোনো বিধান পালন করার মান নির্ধারণ করা : আযীমাত (عزيمة) অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মান এবং রুখ্সাত (رخصة) অর্থাৎ নিকৃষ্ট মান, যাতে করে কোন বিধান পালনের বেলায় মানুষ দু'টো মানের যে কোনোটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে।

সাত. কোনো কোনো ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ স.-এর দু'টি ভিন্ন ধরনের আমল বা কর্মের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোনোটির অনুসরণের অবকাশ রাখা।

আট. কোনো কোনো নিষিদ্ধ কর্মের ক্ষেত্রে বস্তুগত লাভের বিবেচনা পরিত্যাগ করার হুকুম দেয়া।

নয়. বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিকতা ও ক্রমোন্নতির নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখার নির্দেশ যাতে ইসলামী দাওয়াতের সূচনাতেই একই সঙ্গে সবগুলো বিধান প্রবর্তন এবং একই সঙ্গে সবগুলো নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধাজ্ঞা জারী করে মানুষের জন্যে অসহনীয় পরিস্থিতি না হয়।

দশ. গঠনমূলক সংশোধনের ক্ষেত্রে জাতীয় চরিত্রের সবল ও দুর্বল উভয় দিকের প্রতি নজর রাখা।

এগার. বহু সৎকাজের বিস্তারিত এবং পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাকে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর ন্যস্ত করা হয়নি; কারণ এভাবে ছেড়ে দিলে বহু কঠিন সমস্যা দেখা দিতো।

বার. কোনো কোনো বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অবস্থা ও মাস্লাহাত[৭০] -এর প্রতি নজর রাখা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও মেজাজের (temperament) প্রতি নজর রাখা হয়েছে। শরীয়তের বিধানগুলো গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে তাতে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যেগুলো সামগ্রিক বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার সাথে কোন বিশেষ স্থান বা জাতের প্রায়োগিক সম্পর্কের কোনো প্রশ্ন ছিল না।

মোটকথা, সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যালোচনা করার পর কুরআনী তত্ত্ব ও মৌলনীতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা যত গভীর ও সূক্ষ্ম হবে ততই সুস্পষ্ট হবে যে, ইসলামী বিধানগুলো সর্বকালীন এবং সর্বজনীন এবং এ কথাটি বোঝা যাবে যে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাইরের কোনো পথ নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিবে না।

---

৭০. مصلحة = কল্যাণবহতা।

www.pathagar.com

সুন্নাত : ফিক্‌হের দ্বিতীয় উৎস

সুন্নাতের সংজ্ঞা

সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি। ফকীহদের পরিভাষায় সুন্নাত বলতে বুঝায় রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিজের কথা (قول), কর্ম (فعل) এবং তাকরীর (تقرير) অর্থাৎ অন্যদের এমন কথা ও কর্ম যেগুলো সম্পর্কে জেনে শুনে রসূলুল্লাহ স. নিরবতা অবলম্বন অর্থাৎ মৌন সম্মতি প্রদান করেছেন। সাহাবীদের কথা ও কর্মের স্বপক্ষে তাদের কাছে রসূলুল্লাহ স.-এর কথা ও কর্মের কোন সনদ অবশ্যই রয়েছে এই ভিত্তিতে সাহাবীগণের কথা এবং কর্মও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, উসূল গ্রন্থ সমূহে উল্লিখিত হয়েছে :

السنة تطلق على قول الرسول وفعله وسكوته وعلى اقوال الصحابة وافعالهم

"সুন্নাত বলা হয় রসূলুল্লাহ স.-এর কথা, কর্ম এবং তাঁর নিরবতাকে, আর সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কর্মকে।"[১]

তবে হাদীস বলতে ফকীহগণের মতে শুধু রসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণীই বুঝায়। এই বিশেষ অর্থ ছাড়া তাদের দৃষ্টিতে অন্য কোন অর্থে হাদীস শব্দের ব্যবহার হয় না।[২] কিন্তু মুহাদ্দিসগণের মতে হাদীসের অর্থ রসূলুল্লাহ স.-এর কথা, কর্ম ও নিরবতা সবই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, তাকে সুন্নাত বা হাদীস যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন।

সুন্নাত : নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারত তুল্য

আসলে কুরআন হচ্ছে যেন এবং সুন্নাতে রসূল যেন সেই নকশা অনুযায়ী নির্মিত ইমারত। যখন থেকে আল্লাহ্‌র হেদায়াতের সিলসিলা (ধারা) শুরু হয়েছে, নকশা (কিতাব)-র সাথে প্রকৌশলী (রসূল) পাঠাবার নীতিও তখন থেকে বরাবর কার্যকর থেকেছে এবং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়তের মাধ্যমে সেই ধারার সমাপ্তি ঘটেছে।

প্রকৌশলীর প্রণীত নকশাকে একেবারে উপেক্ষা করে ইমারত নির্মাণ করলে তা কখনো টেকসই হয় না। প্রতি যুগে ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে অবস্থা ও চাহিদার প্রতি অবশ্যই নজর রাখা হয়। রসূলুল্লাহ স.-এর তৈরী ইমারতেও এদিকে নজর রাখা হয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে, ইমারতের মূল বুনিয়াদ ও খুঁটিগুলো অপরিবর্তিত রেখে ইমারত নির্মাণ। আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হয়ে মূল নকশার বিকৃত ব্যাখ্যা করে ইমারতের বুনিয়াদ ও খুঁটিগুলো বিধ্বস্ত করা যাবে না।

---

১. নূরুল আনওয়ার

২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

কুরআনে সুন্নাতের ভিত্তি

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে সুন্নাতের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তোমার প্রতি আমি যিক্‌র (কুরআন) নাযিল করেছি যাতে তুমি লোকদের জন্য যে শিক্ষা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট করে (بيان) দিতে পার এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।"[৩]

এই আয়াতে রসূলুল্লাহ স.-কে কুরআনের ব্যাখ্যাতা গণ্য করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

"হে নবী! আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সত্য সহকারে, যাতে আল্লাহ তোমাকে যা বাতলে দিয়েছেন সেই অনুযায়ী তুমি ফায়সালা করতে পারো।"[৪]

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ স.-কে তার প্রচারের বিষয়বস্তু বলে দিয়েছেন এবং তার উপর মুবাল্লিগ (প্রচারক)-এর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

"হে রসূল! তোমার রব (رب)-এর পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে তা প্রচার করো।"[৫]

রসূলুল্লাহ স. নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে অথবা উভয়ের মাধ্যমে কিংবা প্রচলিত রেওয়াজগুলোর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা পরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রাখার মাধ্যমে কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য তুলে ধরতেন। এটিই ছিল তাঁর ব্যাখ্যা (بيان), সিদ্ধান্ত দান (حكم) এবং প্রচার (تبليغ)-এর পদ্ধতি এবং সেই বয়ান, হুকুম এবং তাবলীগ-এর সমষ্টি হচ্ছে সুন্নাত, যার ভিত্তি কুরআন মাজীদ। এ কারণে সুন্নাতের নামে এমন কোনো জিনিস গ্রহণযোগ্য হবে না যা কুরআন মাজীদের বিপরীত।

যেমন কোন কোন ফকীহ বলেন :

ليس فى السنة الا واصله فى القران

"সুন্নাতে এমন কোনো বিষয় নেই যার মূল কুরআনে নেই।"

---

৩. সূরা আন-নাহল : ৪৪

৪. সূরা আন-নিসা : ১০৫

৫. সূরা আল-মায়েদা : ৬৭

www.pathagar.com

সুন্নাতের ব্যাপারে সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি

রসূলুল্লাহ স.-এর পর সাহাবীগণ সুন্নাতকে সক্রিয় ও কার্যকর রাখেন। আবূ বকর সিদ্দীক রা. (আল্লাহর হেদায়াতের প্রকৃতি উপলব্ধির ব্যাপারে যিনি ছিলেন সবচেয়ে অগ্রবর্তী)-এর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মায়মূন ইবনু মিহরান রহ. বলেন :

كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا

"আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর সামনে যখন কোনো আইনগত বিষয় আসতো তিনি প্রথমে কুরআন মাজীদে তার সমাধান খুঁজতেন এবং তাতে যে সমাধান পেতেন তাই দিতেন। না পেলে (তাঁর জানা) রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাতের দিকে মনোনিবেশ করতেন। সুন্নাতেও কোনো সমাধান না পেলে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন-এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর কোনো সিদ্ধান্ত কেউ জানে কি না? অনেক সময় সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু লোক বলে দিতেন-এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।"[৬]

আবূ বকর রা. সুন্নাতের সন্ধান লাভে আনন্দিত হয়ে বলতেন :

الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا

"আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের মধ্যে নবীর সুন্নাত সংরক্ষণকারী লোক বিদ্যমান রেখেছেন।"[৭]

উমর রা. একবার কুরআনের অর্থ অনুধাবন প্রসঙ্গে সুন্নাতকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে বলেন :

سَيَأْتِي قَوْمٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"আগামীতে এমন সব লোক জন্ম নেবে যারা কুরআনের ব্যাখ্যায় নানা সন্দেহের সৃষ্টি করে তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে। তাদের কাছে সুন্নাতের প্রমাণ উপস্থিত করবে, কারণ সুন্নাতের বাহকেরা কুরআন সম্পর্কে বেশী জানে।"[৮]

উমর রা. কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন :

---

৬. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, খ. ১, পৃ. ২২; হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ১৪৮

৭. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ১৪৭; তারীখুল খুলাফা, খ. ১

৮. মুকাদ্দামাতুল মীযান, ইসলামী কানুন নম্বর, খ. ১, পৃ. ৩৯৫; জামিউ' বায়ানিল 'ইলমি ওয়া ফাযলিহী, হাদীস নং-১১৪৫

www.pathagar.com

إنما بعثتهم ليبلغوكم دينكم وسنة نبيكم

"আমি শাসনকর্তা পাঠাই এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের দীন ও তোমাদের নবীর সুন্নাত পৌঁছাবেন অর্থাৎ সুন্নাত প্রচারও তাদের দায়িত্বভুক্ত।"[৯]

তিনি সুন্নাতকে আইনের মর্যাদা দিয়ে বলেন :

ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا

"হে লোকেরা! তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত নির্দিষ্ট হয়েছে। ফরযগুলো নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুস্পষ্ট চলার পথে তোমাদেরকে তুলে দেয়া দেওয়া হয়েছে। এখন যদি তোমরা লোকদের কথায় ডানে বামে চলে গোমরাহ হয়ে যাও (তা তোমাদের ব্যাপার)।"[১০]

অথচ উমর রা. এমন ব্যক্তিত্ব যিনি অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদের কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ের ভিত্তিতে আমল মুলতবী করে দিয়েছিলেন, যাতে ব্যাপক (عام) হুকুম খাস (خاص) হুকুমে পরিণত হয়ে যায়। যথা : দুর্ভিক্ষ চলাকালে চোরের হাত কাটা মওকুফ করেছিলেন এবং মুআল্লাফাতুল কলূব مؤلفة القلوب (ইসলামে স্থিত রাখবার জন্য যাদের মন জয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাকাত-সাদাকার মাল দিয়ে)-কে যাকাত-সাদাকা দেওয়া রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ের জন্য খাস বলে গণ্য করেছিলেন। তথাপি সামগ্রিকভাবে তিনি সুন্নাতকে শরীয়তের উৎস রূপে ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সাহাবী এবং তাবেঈগণও সুন্নাতের ব্যাপারে এই একই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সুন্নাতের ধরন, প্রকৃতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণের ব্যাপারে তারা আমাদের পথ নির্দেশক।

ইমামগণের দৃষ্টিভঙ্গি

ফিক্‌হের ইমামগণও সুন্নাতের প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, যেমন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন:

لولا السنة ما فهم احد منا القرآن

"সুন্নাত না হলে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতো না।"[১১]

তিনি আরো বেশী সুস্পষ্ট করে বলেন :

لم تزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا

৯. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, খ. ১

১০. আল-ই'তিসাম, খ. ১, মীযান, ইসলামী কানুন নম্বর, খ. ১, পৃ. ৩০৬

১১. মুকাদ্দমাতুল মীযান, ইসলামী কানুন নম্বর, পৃ. ৩০৮; আল-মুসতাখরাজ 'আলাল মুসতাদরাক, খ.১, পৃ. ১৫

www.pathagar.com

"যতদিন মানুষ হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণ করবে ততদিন তারা সুকৃতির মধ্যে অবস্থান করবে। আর যখন তারা হাদীস ছাড়া জ্ঞান অর্জন করবে তখন বিকৃতির শিকার হবে।"[১২]

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন :

أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس

"মুসলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে ঐকমত্য (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যখন কারোর কাছে রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে তখন তার জন্য অন্য কোন মানুষের কথার ভিত্তিতে সে সুন্নাত পরিহার করা জায়েয হবে না।"[১৩]

আল্লামা সুয়ূতী রহ. ইমাম শাফিঈ রহ.-এর নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

"রসূলুল্লাহ স. যা কিছু বলেছেন সবই কুরআন থেকে গৃহীত।"[১৪]

ইমাম মালিক রহ. বলেছেন :

كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

"যা কিছু কিতাব ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তা গ্রহণ করো। আর যা কিছু এ দু'য়ের বিরোধী হয় তা প্রত্যাখ্যান করো।"[১৫]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল র. বলেন :

من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة

"যে ব্যক্তি রসূলের স. হাদীস প্রত্যাখ্যান করে সে যেন ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়ায়।"[১৬]

উপরের আলোচনা থেকে দু'টি কথা জানা যায় :

১. কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সুন্নাত প্রাথমিক গুরুত্বের অধিকারী।
২. আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআনের পর সুন্নাত সর্বোচ্চ উৎসের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

সুন্নাতের ব্যাখ্যার কতিপয় ধরন

নিচে আমি রসূলুল্লাহ স. বর্ণিত ব্যাখ্যা সমূহের কতিপয় ধরন পেশ করছি :

(এক) কুরআন মাজীদের যে আয়াতগুলো 'মুজমাল' (সংক্ষিপ্ত) ছিল রসূলুল্লাহ স. সেগুলো ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

---

১২. মুকাদ্দমাতুল মীযান, ইসলামী কানুন নম্বর, পৃ. ৩০৮
১৩. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, খ. ২
১৪. আল-ইতকান
১৫. জামে আহলিল 'ইলম, ইসলামী কানুন
১৬. ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মানাকিব

www.pathagar.com

(দুই) যে আয়াতগুলো 'মুতলাক' (সর্বজনীন) ছিল, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলোকে 'মুকাইয়্যাদ' (বিশেষিত ও নির্দিষ্ট) করেছেন।

(তিন) যেগুলো কঠিন ছিল সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

(চার) কুরআনের যে বিধানগুলো 'মুজমাল' ছিল, অর্থাৎ যেগুলোর প্রায়োগিক অবস্থা, কারণসমূহ ও শর্তাবলী এবং অপরিহার্য বিষয়সমূহ ইত্যাদির বিস্ত ারিত বিবরণ ছিল না রসূলুল্লাহ স. সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। কাজেই নামায, যাকাত ইত্যাদি যেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সুন্নাতে রয়েছে সেগুলো আসলে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও তার বিশ্লেষণ।

(পাঁচ) কুরআনের ব্যাখ্যার আলোকে বহু উপস্থিত সমস্যাসংশ্লিষ্ট বিধান বর্ণনা করেছেন। যেমন হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব বিধান উল্লিখিত ছিল সেগুলোর উপর সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয়সমূহ কিয়াস করেছেন। এগুলোর বিস্তারিত বিধান কুরআন মাজীদে ছিল না।

(ছয়) কুরআনের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যাবলীর প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রেখে উপায় উপকরণের বিধান বর্ণনা করেছেন।

(সাত) কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে এমনসব মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন যেগুলোর উপর নতুন অবস্থা ও সমস্যাবলী কিয়াস করার পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

(আট) কুরআনের বিধানের কারণ, হিকমত (তত্ত্বধর্মী উদ্দেশ্য) ও মাস্‌লিহাত (কল্যাণধর্মী উদ্দেশ্য) বর্ণনা করেছেন। এগুলো থেকে বহুতর মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ নীতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

(নয়) কুরআনের হেদায়াত থেকে আল্লাহ্‌র হিকমত সংগ্রহ করেছেন এবং তা থেকে উদ্দেশ্যাবলী উদ্ভাবন করেছেন। আবার তারই আলোকে শরীয়তকে মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে একাত্ম করেছেন।

(দশ) সামগ্রিকভাবে এমন এক ধরনের জীবন যাপন করেছেন যা কুরআনী জীবন যাপনের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে। যেমন হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ স. সম্পর্কে বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ "কুরআনই তাঁর সমগ্র ব্যবহারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি।"[১৭]

আল্লামা ইবনে কায়্যিমের বর্ণনা

আল্লামা ইবনে কায়্যিম ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

---

১৭. মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং-২৪৬০১

www.pathagar.com

এক. খোদ ওহীর বর্ণনা। সাহাবীদের কাছে যা অস্পষ্ট এবং অজানা থাকতো রসূলুল্লাহ্ স. তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন।

দুই. তিনি ওহীর অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এর নযীর মেলে :

وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

"এবং যারা তাদের ঈমানের সাথে জুল্‌ম (ظلم)-এর সংমিশ্রণ ঘটায় না।"[১৮]

এই জুল্‌ম (ظلم)- এর ব্যাখ্যা তিনি করেছেন 'শিরক'।

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

(যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে) "তার হিসাব হবে খুবই সহজ।"[১৯]

তিনি এই সহজ (يسر) হিসাবের ব্যাখ্যা করেছেন "কেবল আল্লাহ্‌র আদালতে উপস্থাপনা"।

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ

(রমযানের মাসে রাতে তোমরা পানাহার করো) "যতক্ষণ না কালো সূতার মধ্য থেকে সাদা সূতা তোমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।"[২০]

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন : الْخَيْطُ الأَبْيَضُ মানে সুবহে সাদিক, الْخَيْطِ الأَسْوَدِ মানে সুবহে কাযিব।

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

"তিনি (রসূলুল্লাহ্) তাঁকে (জিবরীলকে) দেখেছেন আরো একবারের অবতরণে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।"[২১]

এখানে رَآهُ - তে যে সর্বনাম (ه)-তার মানে জিবরীল।

أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

"অথবা আসবে তোমার প্রতিপালকের (بعض ايات) অন্য কোন নিদর্শন।"[২২]

এই بَعْضُ آيَاتِ অর্থে (কিয়ামতের আলামত) পশ্চিম আকাশে সূর্যের উদয় বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

"পবিত্র অর্থাৎ পূণ্যময় কথার উপমা হচ্ছে যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ।"[২৩]

---

১৮. সূরা আল-ইনশিকাক : ০৮
১৯. সূরা আল-আন'আম : ৮২
২০. সূরা আল-বাকারা : ১৮৭
২১. সূরা আন-নাজ্‌ম : ১৩-১৪
২২. সূরা আল-আন'আম : ১৫৮
২৩. সূরা ইবরাহীম : ২৪

www.pathagar.com

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ অর্থ তিনি বলেছেন খেজুর গাছ।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"মু'মিনদেরকে আল্লাহ অবিচল (স্থির) রাখবেন প্রতিষ্ঠিত কথার ওপর (ওয়াহ্‌দা নিয়তের ওপর) দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে"।[২৪]

রসূলুল্লাহ স. আয়াতের ব্যাখ্যায় আখিরাতে الْقَوْلِ الثَّابِتِ-এর অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, কবরে মানকির নাকীরের প্রশ্নের জবাবে মু'মিনকে আল্লাহ্ স্থির অবিচল রাখবেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

"রাদ (رعد) (Thunder) আল্লাহ্‌র সপ্রশংস তাসবীহ্ পাঠ করে।"[২৫]

তিনি বলেছেন, রাদ (رعد) একজন ফেরেশতা যিনি বর্ষা-বাদলের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"তারা (ইহুদী আর খ্রিস্টান) গ্রহণ করেছে তাদের ধর্মগুরু আর সন্যাসীদেরকে আরবাব (ارباب) (رب - এর বহুবচন) রূপে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে।"[২৬]

ইহুদী এবং খ্রিস্টানরা তাদের হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করতো এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিত-এটাই হচ্ছে তাদেরকে রব (رب) রূপে গ্রহণ করার অর্থ।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

"তোমরা যত পার শক্তি (قوة) অর্জনের ব্যবস্থা করো তাদের (ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলার) জন্য।"[২৭]

রসূলুল্লাহ্ স. قوة-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'তীরন্দাজী' (তাঁর যুগে এটি ছিল শক্তি অর্জনের একটি মোক্ষম উপায়)।

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

"যে ব্যক্তি ঘৃণ্য গুনাহ্‌র কাজ করে তাকে তেমনি (ঘৃণ্য) প্রতিদান দেয়া হবে।"[২৮]

তিনি বলেছেন, এই جزاء বা প্রতিদানের অর্থ হচ্ছে কষ্ট, দুঃখ-শোক, ভীতি, রোগ ইত্যাদি যা দুনিয়ার জীবনে গুনাহ্‌গার ব্যক্তি ভোগ করবে।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

---

২৪. সূরা ইবরাহীম : ২৭
২৫. সূরা আর-রা'দ : ১৩
২৬. সূরা আত-তাওবা : ৩১
২৭. সূরা আল-আনফাল : ৬০
২৮. সূরা আন-নিসা : ১২৩

www.pathagar.com

"যারা উৎকৃষ্ট কর্ম করে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পুরস্কার রয়েছে এবং রয়েছে زيادة- অধিক কিছু।"[২৯]

আয়াতে زِيَادَةٌ শব্দের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন- "আল্লাহ্র দীদার বা সাক্ষাত"।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"[৩০]

আয়াতে দু'আ (دعاء) শব্দের অর্থ তিনি করেছেন 'ইবাদাত।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

"এবং রাতের একাংশে তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা تسبيح বর্ণনা করো এবং নক্ষত্ররাজির পশ্চাতে (অস্তের পর)।"[৩১]

আয়াতে إِدْبَارَ النُّجُومِ-এ তাসবীহের মানে তিনি বলেছেন-ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকা'আত নামায।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ

এই আয়াতে أَدْبَارَ السُّجُودِ মানে মাগরিবের পরের দুই রাকাআত নামায বলে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এগুলো ছাড়া রসূলুল্লাহ্ স.-এর ব্যাখ্যার আরো বহু নযীর পাওয়া যায়।

তিন. রসূলুল্লাহ্ স. নিজের কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, যেমন কোন ব্যক্তি বিভিন্ন নামাযের সময় জানতে চাইলে নিজে যথা সময়ে তাকে নিয়ে নামায পড়ে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

চার. কারো প্রশ্নের উত্তরে বিধান নাযিল হয়েছে, যেমন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করলো, অথচ প্রয়োজনীয় চার জন সাক্ষী অথবা আদৌ কোন সাক্ষী হাজির করতে পারলো না, জিজ্ঞেস করলো, এর কী বিধান? উত্তরে লি'আন (لعان) সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো (যাতে নির্দেশ রয়েছে, স্বামী চার বার হলফ করে বলবে-তার অভিযোগ সত্য, পঞ্চমবারে আল্লাহ্র লা'নত কামনা করবে যদি অসত্য হয়। তদ্রূপ স্ত্রীও চার বার হলফ করবে এবং বলবে-তার স্বামীর অভিযোগ অসত্য, পঞ্চম বারে লা'নত কামনা করবে যদি সত্য হয়-উভয়ে এরূপ লা'নত করার পরিণতিতে দুজনের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে)।

---

২৯. সূরা ইউনুস : ২৬

৩০. সূরা গাফির : ৬০

৩১. সূরা আত-তূর : ৪৯

www.pathagar.com

পাঁচ. ওহীর মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কিন্তু সেই ওহীর বাক্যগুলো কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন এক ব্যক্তি লম্বা জুব্বা পরে এবং বিস্তর খোশ্‌বু লাগিয়ে হজ্জের ইহ্‌রাম করল। জিজ্ঞাসিত হয়ে রসূলুল্লাহ স. ওহীপ্রাপ্ত হলেন এবং বললেন, সে যেন জুব্বা খুলে ফেলে এবং খোশ্‌বু ধুয়ে ফেলে।

ছয়. প্রশ্ন ছাড়াই তিনি বহু বিধান বর্ণনা করেন। যেমন গাধার গোশত এবং মুত'আ[৩২] বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন, শিকার হারাম ঘোষণা করেন। অনুরূপভাবে স্ত্রীরূপে ফুফীর বর্তমানে তার ভাইঝিকে তদ্রূপ খালার বর্তমানে তার ভাগ্নীকে বিবাহ করা হারাম করেন।

সাত. রসূলুল্লাহ স. নিজে কোনো কাজ করলেন এবং উম্মতকে তা করতে নিষেধ করলেন না; সুতরাং কাজটি বৈধ গণ্য হল।

আট. নিজে কোনো কাজ করলেন এবং উম্মতকে তা শেখালেন। এতে বৈধতার এক ধরনের প্রমাণ পাওয়া গেল।

নয়. কোনো জিনিসের হারাম হবার ব্যাপারে নীরব থেকে তার মুবাহ (مباح) হবার বিষয়টির প্রতি অব্যক্ত ইঙ্গিত দিলেন।

দশ. কুরআন মাজীদ কোনো নির্দেশ দিলো অথবা কোনো জিনিসকে হারাম বা মুবাহ ঘোষণা করলো, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কাল, পাত্র, শর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলো, এমনসব ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ স. সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত (مجمل) বিধান প্রদান করে বিস্তারিত (مفصل) বর্ণনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন রসূল-এর ওপর। যেমন : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ (তোমাদের জন্য হালাল করা হলো অন্যান্য মেয়েদের বিবাহ ওরা ব্যতীত অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত মেয়েরা ব্যতীত);[৩৩] কুরআনে এই مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ-এর সংশ্লিষ্ট বর্ণনা নেই। রসূলুল্লাহ স. তার বর্ণনা দিয়েছেন।[৩৪]

আল্লামা শাতিবীর বর্ণনা

এ সম্পর্কে নিম্নে আল্লামা শাতিবীর বর্ণনার সার-সংক্ষেপ দেয়া হলো : "অর্থ ও ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সুন্নাত কুরআন মাজীদের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। সুন্নাত কুরআন মাজীদের অস্পষ্ট বচনের ব্যাখ্যা করে জটিল আয়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয় অথবা সংক্ষিপ্ত নির্দেশের ভাষ্য প্রদান করে। নিম্নোক্ত যুক্তিগুলোতে এর প্রমাণ মিলে :

---

৩২. نكاح متعه = নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ।

৩৩. সূরা আন-নিসা : ২৪

৩৪. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, খ. ২

www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে সুন্নাত কুরআনের ব্যাখ্যা। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

(আমরা তোমার কাছে যিকর (কুরআন) নাযিল করেছি যাতে তুমি মানুষের জন্য অবতীর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিতে পারো)[৩৫] لِتُبَيِّنَ শব্দে রসূলকে বর্ণনার (بيان) দায়িত্ব অর্পণের কথা রয়েছে এবং রসূলের বর্ণনাই তো সুন্নাত।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"এবং তুমি (রসূল স.) সচ্চরিত্রের সুউচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত।"[৩৬]

আয়শা রা. বলেছেন, خلقه القران অর্থাৎ রসূলল্লাহর স. খুলুক (চরিত্র)-এর অবয়ব হচ্ছে কুরআন।[৩৭] মানবচরিত্রের উপাদান হচ্ছে তার কথা, কর্ম ও সমর্থন এবং সুন্নাত বলতেও এগুলোকেই বুঝায়। সুতরাং সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের 'বয়ান' এবং রসূলুল্লাহ স.-এর কথা, কর্ম এবং সমর্থন কুরআন থেকেই উদ্ভূত।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (সকল বস্তু বা বিষয়ের বর্ণনা)[৩৮] বলেছেন। এ কথার অনিবার্য পরিণতিতে সুন্নাত সামগ্রিকভাবে কুরআন মাজীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ আম্‌র (আদেশ) ও নাহী (নিষেধ) প্রাথমিক ও মূলগতভাবে কুরআন মাজীদ থেকে উদ্ভূত।

রসূলুল্লাহ স.-এর ব্যাখ্যার বহু ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। হাদীস সাহিত্যের বিশাল পরিসর থেকে তা বিস্তারিত জানা যেতে পারে।[৩৯] আপাতদৃষ্টিতে হয়তো রসূলুল্লাহ স.-এর কোনো কোনো ব্যাখ্যার সূত্র কুরআন মাজীদে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে বিশেষজ্ঞরা শরীয়তে ইসলামের সামগ্রিক জ্ঞান রাখেন ও তার সর্বজনীন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে পরিচিত, তাঁদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সূত্র সহজেই ধরা পড়ে। এ ব্যাখ্যাগুলো মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ নীতি হোক বা সাময়িক ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি হোক না কেন এদের কোনোটিরই ফায়দা অস্বীকার করা যেতে পারে না। মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ নীতির মাধ্যমে আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে সাময়িক ও খুঁটিনাটি বিষয়াদির সাহায্যে প্রমাণ উদ্ভাবন করার ধরন জানা যায়।

---

৩৫. সূরা আন-নাহ্‌ল : ৪৪

৩৬. সূরা আল-কলাম

৩৭. পূর্বে এর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে

৩৮. সূরা আন-নাহ্‌ল : ৮৯

৩৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীও সুন্নাতের (কুরবানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা হবার ব্যাপারে) অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের আলোচনা করেছেন। বহুতর উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। দেখুন, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, পৃ. ৪৫

www.pathagar.com

আইন প্রণয়নে সুন্নাতের স্থান অনুধাবনের উপায়

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের ভূমিকা জানার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। উক্ত অবস্থার আলোকেই উপলব্ধি করা যাবে, রসূলুল্লাহ স. তার সমসাময়িক সমাজে প্রচলিত রীতি-রেওয়াজের কোন্‌টিকে কিভাবে এবং কতটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সুন্নাতের মাধ্যমে আমরা অনেকাংশে তৎকালীন অবস্থাও অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন রীতি-রেওয়াজের বিস্তারিত অবয়ব জানা এবং সেই প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ স.-এর গ্রহণ, বর্জন, সংশোধন ইত্যাদির যথার্থ সীমানা চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। ফকীহ্‌দের লেখায় এ ধরনের আলোচনা পাওয়া যায় না। যা হোক রসূলুল্লাহ স.-এর প্রবর্তিত শরীয়তের গুঢ়তত্ত্ব ও প্রকৃতি জানতে হলে তাতে তাঁর সুন্নাতের ভূমিকা আর সে সুন্নাতের প্রেক্ষাপট আরব সমাজের অবস্থা জানা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.-এর কিতাব "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়" যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা থেকে আমরা এতটুকু পথের দিশা পেতে পারি যার সাহায্যে এই কঠিন সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে শাহ্ সাহেব নিম্নোক্ত মত পেশ করেছেন :

إن كنت تريد النظر في معاني شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتحقق أولا : حال الأميين الذين بعث فيهم التي هي مادة تشريعه ، وثانيا : كيفية إصلاحه لها بالمقاصد المذكورة في باب التشريع والتيسير وأحكام الملة

"যদি তুমি রসূলুল্লাহ স.-এর গভীরতা অনুধাবন করতে চাও তাহলে সর্বপ্রথম আরবের নিরক্ষরদের অবস্থা অনুসন্ধান করো, যাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ স. আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটিই তাঁর শরীয়তের মৌল উপকরণ। এরপর তাঁর সংস্কারের ধরন অনুধাবন করো। শরীয়ত গঠন, শরীয়তের বিধানকে সহজ করা ও সমাজ বিধান সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।"[৪০]

রসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল আরব জাতি। বিশ্বজনীন মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ নীতি প্রবর্তনে তাকেই ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ নীতিসমূহকে কার্যকর রূপদান করার সময় এই জাতির অভ্যাস, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও বিধান ইত্যাদির প্রতি নজর রাখা হয়েছে। বরং অনেকাংশে প্রচলিত রীতি-নীতি ও বিধানেরই আলোকে এই মূলনীতিসমূহের প্রবর্তন কার্যকর হয়েছে। এহেন অবস্থায় সমস্ত আকার-আকৃতিকে স্থায়ীভাবে আইনগত মর্যাদা দান করার প্রশ্নই দেখা দেয় না। তবে আইন প্রণয়নের সময়

---

৪০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, পৃ. ১২৩

www.pathagar.com

আরবের রীতি-রেওয়াজ ও বিধানের আসল আকৃতি কী ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ স. তাতে কী সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বর্জন করেছিলেন তার একটি খতিয়ান সামনে রাখা গেলে, কোনো পরিবর্তিত বা নতুন পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ স.-এর অবলম্বিত কর্মপদ্ধতি কার্যকর করা সম্ভব হবে।

রসূলুল্লাহ্ স.-এর উক্তিগুলোর প্রকারভেদ

রসূলুল্লাহ্ স.-এর উক্তিগুলোকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয় :

(এক) যেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে নবুওয়তের দায়িত্ব ও রিসালাতের সাথে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রসূল যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করো।"[৪১]

এই আয়াতের সম্পর্ক হচ্ছে উল্লিখিত প্রথম ভাগের অর্থাৎ আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, চরিত্রের নৈতিকতা, লেনদেন, পরকাল ইত্যাদির সাথে। সুতরাং এ সবের সাথে সম্পর্কিত উক্তি নবুওয়তের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত বলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(দুই) নবুওয়তের দায়িত্ব ও রিসালাতের সাথে যে সব উক্তির সম্পর্ক নেই বরং যে উক্তি কোন পরামর্শ বা মতামত ভিত্তিক, যেমন تابير النخل (খেজুরের পরাগায়ন) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর বিরূপ মন্তব্যের দরুন সাহাবা রা. ঐ প্রক্রিয়া বন্ধ করলেন, পরিণামে ফলন কম হলো, তখন রসূলুল্লাহ্ স. বলেন :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

"আমি একজন মানুষ মাত্র। তোমাদের দীনের ব্যাপারে যখন আমি কোনো হুকুম দেই তখন তা গ্রহণ করো এবং যখন নিজ মতের ভিত্তিতে কোনো হুকুম দেই (তা গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়, কারণ) আমি ও একজন মানুষ (ভুল ভ্রান্তি হতে পারে)।"[৪২]

এই শ্রেণীর উক্তির মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর উক্তির মতো হতে পারে না। পরামর্শ ও মতামত ভ্রমাত্মক হতে পারে। যেমন বদর-এর যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছিল পরামর্শক্রমে; কিন্তু আল্লাহ্ অসন্তোষ প্রকাশের সাথে

---

৪১. সূরা আল-হাশর : ০৭

৪২. সহীহ মুসলিম, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : উজূবু ইমতিছালি মা কালাহু শারআন দূনা মা যাকারাহু স. মিন মা'আয়িশিদ দুনয়া আলা সাবীলির রায়, হাদীস নং-২৩৬২

www.pathagar.com

অনুমোদন দান করলেন। অবস্থা ও প্রয়োজন বিশ্লেষণ বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে মানবিক দুর্বলতা প্রসূত হতে পারে। (অবশ্য নবী-রসূলের ভুল ভ্রান্তি নিবারণ বা সংশোধনের ব্যবস্থাও আল্লাহ রেখেছেন যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।)

দ্বিতীয় শ্রেণীর উক্তি বা বয়ান বা ফায়সালার সম্পর্ক থাকে সাধারণত নিম্নরূপ ব্যাপারগুলোর সাথে :

এক. সামরিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে যে ফায়সালা দেওয়া হয়;

দুই. যে সব ফায়সালা পদ্ধতিগত এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বদলে যেতে থাকে। যেমন : যুদ্ধকৌশল, রাষ্ট্রের কোন বিভাগের বিন্যাস ইত্যাদি;

তিন. ব্যক্তি, জাতি বা দেশ ভিত্তিক আচরণ বা রীতি সম্বন্ধে ফায়সালা;

চার. যেসব কথা আরবে কাহিনী আকারে প্রচলিত ছিল এবং রসূলুল্লাহ স. গল্প বলার স্বাভাবিক প্রবণতাবশত কিংবা কারো চারিত্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সেগুলো বর্ণনা করেছেন;

পাঁচ. আরবদের কোনো কোনো অভিজ্ঞতা যথা চিকিৎসা, কৃষি ও বাগান রচনা সম্পর্কে তিনি যা বর্ণনা করেছেন।

একজন আইন প্রণেতার জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর উভয় ধরনের উক্তি, ব্যাখ্যা বা ফায়সালার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অন্যথায় আইন তার বাস্তব কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে যে-সব ক্ষেত্রে অবস্থা ও যুগের তাগিদ অনুযায়ী আইনের বিন্যাস করতে হয়।

সুন্নাত সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ

ইমাম আবূ হানীফা রহ. (শ্রেষ্ঠতম আইন প্রণেতা) সম্পর্কে একথাটি প্রচলিত যে, তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের প্রতি তেমন দৃষ্টি রাখেননি। কথাটি সত্য নয়, এতে যদি কিছুমাত্র সত্যতা থাকে তবে তা রসূলুল্লাহ স.-এর উক্তি বা ফায়সালার প্রেক্ষিতে। ইমাম আবূ হানীফার ফিক্‌হ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে যত বেশী সামঞ্জস্যশীল হতে পেরেছে অন্য কোনো ইমামের ফিক্‌হের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। হানাফী ফিক্‌হের অধিকতর জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এই সামঞ্জস্যশীলতা। একদিকে ইসলামী আইনের সর্বব্যাপকতা এবং অন্যদিকে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণীসমূহের ধরন ও স্বরূপ অনুধাবন করলে অনিবার্যভাবে একথা মেনে নিতে হবে যে, আইনের জগতে কিয়াস ও রায়-এর গুরুত্ব কম নয়। অথচ এই কিয়াস ও রায় অধিকতর প্রয়োগের কারণে ইমাম আবূ হানীফা রহ. কে অভিযুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

আইন প্রণয়নে (ফিক্‌হ) সুন্নাত সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ফকীহগণ আইন প্রণয়নের জন্য সুন্নাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর জ্ঞান অপরিহার্য গণ্য করেছেন :

১. নাসেখ ও মানসূখ;
২. মুজমাল ও মুফাসসার;
৩. খাস ও আম;
৪. মুহ্‌কাম ও মুতাশাবিহ এবং
৫. বিধান সমূহের শ্রেণী ও মর্যাদা (যেমন ওয়াজিব, সুন্নাত, মুবাহ ইত্যাদি)।

কুরআন মাজীদ থেকে যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহের যে পদ্ধতি ও মূলনীতি ফকীহগণ নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যেও উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান অপরিহার্য। তদ্রূপ সুন্নাতের ক্ষেত্রেও সেসবের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অধিকন্তু রেওয়ায়াত[৪৩] ও দেরায়াতের[৪৪] বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক হাদীস সনাক্ত করার কাজ বিস্তর অনুসন্ধান সাপেক্ষ এবং বিপুল গুরুত্বের দাবীদার। অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদের সাথে সামঞ্জস্যের দৃষ্টিতে সুন্নাতের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণের কাজও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুরআন ও সুন্নাতের যে অংশ ঘটনাবলী ও নসিহতের সাথে সম্পর্কিত, কতিপয় ফকীহের মতে আইন প্রণয়নের জন্য সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, সমাজ জীবনকে উপলব্ধি করার এবং সেই দৃষ্টিতে আইনের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করার উপরন্তু আইনকে ফলপ্রসূ করার জন্য উক্ত প্রকার আয়াত ও হাদীসে অনেক পথনির্দেশনা পাওয়া যায়। যদি তাকে উপেক্ষা করে আইন প্রণয়নের কাজ চলতে থাকে, তাহলে তার মধ্যে রসহীনতা ও কর্কশ ভাব দেখা দেবে। ইসলামী আইনের প্রাণ যে অন্তরঙ্গতা, স্নেহ ও ভালোবাসা তা সেখানে কমে যাবে।

হাদীস সংকলনে সতর্কতা

রসূলুল্লাহ স.-এর ইন্তিকালের পর বহুকাল যাবৎ (প্রায় একশ বছর) হাদীস সংকলনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। যদিও হাদীসের চর্চা হতো যখনই কোন উদ্ভূত সমস্যা বা প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন পড়ত অথবা সাহাবা রা. কাউকে নেক কাজের উৎসাহ দান এবং কোন বদ কর্মের প্রতিরোধের জন্য হাদীসের ব্যবহার করতেন। চর্চা যথেষ্ট হলেও বহুদিন যাবৎ হাদীসের সংকলন এবং গ্রন্থায়ন হয়নি। অন্য দিকে, ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা ইসলামী সমাজে বিভ্রান্তি

---

৪৩. روایة = প্রক্রিয়া।
৪৪. درایة = যুক্তিপ্রয়োগে বিশ্লেষণ।

www.pathagar.com

সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে জাল হাদীস প্রচার শুরু হয়। কোন কোন বর্ণনাকারী সদুদ্দেশ্যে অর্থাৎ কোন সৎকাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য জাল হাদীস বর্ণনা করেন।

পরবর্তীকালে যখন হাদীসের সংগ্রহ শুরু হলো তখন আসল আর নকল হাদীসের যাচাইয়ের জন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ কতগুলো মানদণ্ড উদ্ভাবন করলেন যা 'উসূলে-হাদীস' নামে ইসলামী জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের জন্য রাবী[৪৫]দের বিশ্বস্ততা যাচাইয়ের গরজে তাদের জীবনী সংগ্রহ করা হলে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের বিচার করা হয়। তাতে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী জ্ঞানের আরো একটি শাখা যার নাম হচ্ছে "আসমাউ রিজালিল হাদীস" (اسماء رجال الحديث) অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম, সংক্ষেপে 'রিজাল (رجال)। এতে লক্ষ লক্ষ রাবীর জীবনী সংগৃহীত হলো। এভাবে হাদীসের বিচার করা হলো। যেমন ধরুন এক ব্যক্তি বলছেন, তিনি অমুকের কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন কিন্তু দেখা গেল এই ব্যক্তির জন্মের পূর্বে সেই অমুক মারা গেছেন বা প্রমাণিত হলো তাদের দু'জনের সাক্ষাতই হয় নাই। তাহলে হাদীসটি রেওয়ায়েতের দিক থেকে সত্য হতে পারে না। তারপর দিরায়াত-এর দিক থেকে বিচার হবে। দিরায়াতের মানদণ্ডগুলো নিম্নরূপ :

১. যদি হাদীসটি কুরআন মাজীদের কোন নীতি বা হুকুম-এর বিরোধী না হয়;
২. যদি বাস্তব ঘটনাবলী ও চাক্ষুস ভাবে দৃষ্ট অবস্থার বিপরীত না হয়;
৩. যদি সর্বসম্মত মূলনীতির বিরোধী না হয়;
৪. যদি কোন মুতাওয়াতির (متواتر)[৪৬] হাদীস ও সাহাবীগণের কার্যক্রমের বিরোধী না হয়;
৫. যদি قلب سليم অর্থাৎ সুস্থ সত্যাশ্রয়ী হৃদয়জাত বুদ্ধির বিপরীত না হয়;
৬. যদি তাতে কুসংস্কার প্রীতি ও অলীক কল্পনার প্রশ্রয়মূলক ভাবধারা না থাকে;
৭. যদি তাতে খুবই মামুলি তুচ্ছ ব্যাপারে সুকঠিন 'আযাবের কথা না থাকে, অথবা মামুলী ধরনের সৎকাজের জন্য বিস্তর পুরস্কারের কথা না থাকে;
৮. যদি হাদীসটির বর্ণনায় এমন গূঢ় কিছু না থাকে যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলে না;
৯. যদি তাতে কারোর মর্যাদা (مناقب) ও শ্রেষ্ঠত্ব (فضائل) বর্ণনায় বাড়াবাড়ি (غلو) না থাকে;

---

৪৫. راوى = বর্ণনাকারী।

৪৬. মুতাওয়াতির সেই সহীহ হাদীস যা প্রতি যুগে ও প্রতিটি স্তরে এত বেশী সংখ্যক লোক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীস তৈরী করার জন্য দলবদ্ধ হওয়া অকল্পনীয়-অনুবাদক।

www.pathagar.com

১০. যদি তাতে কারো এমন ধরনের দোষের বর্ণনা না থাকে যা কোন মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না;

১১. যদি তাতে এমন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী না থাকে যাতে নির্ধারিত বছর ও মাসের উল্লেখ রয়েছে;

১২. যদি হাদীসের বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগুলো আরবী বাকরীতি ও ব্যাকরণের সাথে অসামঞ্জস্য না হয়;

১৩. যদি হাদীসের অর্থ ও তাৎপর্য নবুওয়তের মর্যাদার বিরোধী না হয়।[৪৭]

মুহাদ্দিসগণ উক্ত মানদণ্ডগুলো সামনে রেখে হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করেছেন এবং তাদের গ্রন্থাদিতে হাদীসের "জারূহ্ ওয়া তা'দীল" (جرح وتعديل) (সমালোচনা ও সত্যতা নির্ধারণ)-এর বিস্তারিত বিবরণ দেখা যায়। কতিপয় মুহাদ্দিস বানোয়াট ও জাল হাদীসের সংকলন রচনা করেছেন। এ জাতের সংকলনসমূহে নিম্নোক্ত রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

وكل حديث رأيته يخالف العقول ، أو يناقض الأصول ،فاعلم أنه موضوع ، فلا تتكلف اعتباره ، أي : لا تعتبر رواته ، ولا تنظر في جرحهم . أو يكون مما يدفعه الحس والمشاهدة ، أو مباينا لنص الكتاب ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع القطعي ; حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل

"সুস্থ বুদ্ধির খেলাফ ও উসূল বিরোধী হাদীসকে বানোয়াট তথা জাল হাদীস মনে করতে হবে। তার বর্ণনাকারীদের ওপর-আস্থা স্থাপন করা যাবে না। এমন হাদীসের বিচার বিশ্লেষণেরও কোন দায়িত্ব নেই, নির্দ্বিধায় তাকে দোষে দুষ্ট বলে পরিত্যাগ করতে হবে। অথবা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ ব্যাপার ও অবস্থা বর্ণিত হাদীসকে রদ করে দেয়, কিংবা তা আল্লাহ্র কিতাব, রসূলের মুতাওয়াতির সুন্নাত ও চূড়ান্ত ইজমা'-এর বিরোধী প্রমাণিত হয়, এসব দোষে দুষ্ট হাদীস সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা গৃহীত হবে না।"[৪৮]

একথা সুস্পষ্ট যে, সুস্থ বুদ্ধি এবং দিরায়াতের মানদণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনসব হাদীস সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে যাতে সাধারণ ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু যেসব রেওয়ায়াত অদৃশ্য জগত এবং বুদ্ধির অগম্য কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত সেগুলোর ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে বেশী গুরুত্ব দিলে অন্যতর বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যাবে।

মোটকথা, হাদীস বিশ্লেষণ ও যাচাই বাছাই করার জন্য হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ যেসব মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন সেগুলো অধ্যয়ন করার পর একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে হাদীসকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ থাকে না।

---

৪৭. ইজালায়ে নাফি'আ এবং মুকাদ্দামা ফাতহুল মুলহিম, পৃ. ১৬

৪৮. মুকাদ্দামা ফাতহুল মুলহিম, পৃ. ১৬, তাযকিরাতুল মাওযূ লি ইবনিল জাওযী

www.pathagar.com

হাদীসের অবস্থান নির্ধারণের ব্যাপারে সাহাবীগণের রা. জীবনের গুরুত্ব

সাহাবা রা. এবং তাদের অনুসারীদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদের ইরশাদ:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী সর্ব প্রথম ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ তাদের জন্য চিরন্তন নিয়ামতের জান্নাতসমূহ তৈরী রেখেছেন, যাদের নিম্নদেশ থেকে নদী প্রবাহিত। তারা চিরকাল এই নিয়ামত ও আনন্দময় জীবনে অবস্থান করবে। এটি অনেক বড় সাফল্য।"[৪৯]

আয়াতে وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ (অগ্রগামী, সর্বপ্রথম ঈমান আনেন যারা) এবং وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم (যারা তাদের অনুসরণ করেন) বলে যে দু'টি দলের উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম দলটি কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে নববীর স্থান নির্ধারণ করেছেন এবং এ দু'টির আলোকে আইন রচনা করেছেন। মুহাজির ও আনসারদের প্রথম শ্রেণী ছিল এই দলের কেন্দ্রীয় শ্রেণী। এরপর দ্বিতীয় দলটির স্থান। তারা নিষ্ঠা ও সততার সাথে এমনভাবে প্রথম দলটির অনুসরণ করেন যে, যা কিছু তারা স্থির করে দিয়েছিলেন তাকে সনদ হিসেবে স্বীকার করে নেন এবং আইন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাকে দলীল হিসেবেও ব্যবহার করেন। এই উভয় দলের জন্য رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল এবং অনেক বড় গ্যারান্টি। বিশেষ করে وَرَضُواْ عَنْهُ তে তাদের প্রকৃতি ও আল্লাহ্‌র আইনের প্রকৃতির মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্যের দলীল রয়েছে। اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ (নিষ্ঠা সহকারে যারা অনুসরণ করেছে) এই শ্রেণীতে তারাই গণ্য হবেন যারা রসূলের সাহাবীগণের জীবনকে সনদ হিসেবে স্বীকার করে নেবেন এবং আইন প্রণয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাদের আলোকবর্তিকার সাহায্য নেবেন। এরি ভিত্তিতে ফকীহগণ সাহাবীগণের কথা ও কর্মকে 'সুন্নাত'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উসূলে ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে সাহাবীগণ সম্পর্কে ফকীহদের এই অভিমত উল্লিখিত হয়েছে :

يجب اجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب اجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم

"যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং সাহাবীগণ যে সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করেন এবং মেনে নেন, তাকে মেনে নেওয়া সর্বসম্মতভাবে (اجماعا) ওয়াজিব। আর যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ প্রমাণিত হয়েছে তাকে মেনে নেওয়া সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব নয়।"[৫০]

---

৪৯. সূরা আত-তাওবাহ : ১০০

৫০. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ, খ. ২, পৃ. ১৭

www.pathagar.com

কেন মেনে নিতে হবে তার কারণ নিম্নরূপ :

لان اكثر اقوالهم مسموع بحضرة الرسالة وان اجتهدوا فرأيهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم فى الدين وبركة صحبة النبى صلى الله عليه وسلم وكونهم فى خير القرون

"কারণ তাঁদের অধিকাংশ কথা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে শ্রুত। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ করেন তাহলে তাঁদের রায় সব চাইতে প্রকৃষ্ট, কারণ তাঁরা কুরআন মাজীদের বাক্যসমূহের (نص বহুবচন نصوص / স্পষ্ট ও অবিসংবাদিত বাক্য) অবতরণের স্থান-কাল সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। ঈমানে তারা অগ্রবর্তী। তারা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্য এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে তারা ধন্য। তাদের যুগ ছিল "খায়রুল কুরূন" তথা সর্বোত্তম যুগ।"[৫১]

আরো বলা হয়েছে :

لانهم شاهدوا احوال التنزيل واسرار الشريعة ومعرفة اسباب التنزيل

"কারণ তাঁরা (সাহাবা রা.) কুরআন অবতরণের অবস্থা ও দৃশ্যপট প্রত্যক্ষ করেছেন এবং শরীয়তের রহস্যসমূহ ও অবতরণের কারণ সমূহের জ্ঞান সরাসরি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে লাভ করেছেন।"[৫২]

এসব কারণে তাঁরা কোনো কথা নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে বললেও অন্যদের কথার তুলনায় তা অনেক বেশী গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবার পরও ফকীহগণ স্থান-কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের মত প্রকাশের অধিকার সংরক্ষিত রেখেছেন। তাদের মতে সাহাবীদের রায় যদি এমন পর্যায়ের হয় যেখানে কিয়াস করার কোনো অবকাশ থাকে না তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ ওয়াজিব। যদি কিয়াসের অবকাশ থাকে তাহলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিয়াস করা যেতে পারে।"[৫৩]

অবশ্য সব মানুষ যেমন সমান হয় না সব সাহাবীও সমান ছিলেন না। জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, আমানতদারী-বিশ্বস্ততা, তাকওয়া এবং রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্য ও নৈকট্যের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। কাজেই তাঁদের অনুসরণ এবং তাঁদের কথা ও কর্মের স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে।

---

৫১. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ, খ. ২, পৃ. ১৭
৫২. নূরুল আনওয়ার, পৃ. ২১৭
৫৩. হুসামী, পৃ. ৮৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইজমা' : ফিক্‌হের তৃতীয় উৎস

ইজমা'র অর্থ ও তাৎপর্য

ইজমা'র আভিধানিক অর্থ দৃঢ় সংকল্প ও ঐকমত্য। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে

فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ

"তোমরা (নূহ আ:-এর জাতি) নিজেদের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নাও এবং নিজেদের শরীকদেরকে জমায়েত করো।"[১]

ফকীহগণের পরিভাষায় কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্তদানের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ঐকমত্যকে ইজমা' বলে। উসূলে ফিক্‌হের কিতাবসমূহে এই সংজ্ঞা উল্লিখিত হয়েছে :

وهو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور

"রসূলুল্লাহ স.-এর উম্মতের মধ্যে যারা বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতা সম্পন্ন (اهل الحل والعقد)[২] তেমন ব্যক্তিবর্গের কোনো বিষয়ে ঐকমত্যের নাম ইজমা'।"[৩]

অবস্থা ও চাহিদা দৃষ্টে মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থ ও কল্যাণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে ইজমা' হতে পারে। আসলে, আইনকে অবস্থা ও সময়ের ছাঁচে ঢালাইয়ের জন্য ইজমা' এক ধরনের ইখতিয়ার যা মূল শরীয়ত প্রণেতা দান করেছেন এমনসব লোকদেরকে যাঁরা ফিক্‌রী (চিন্তাগত) ও 'ইলমী যোগ্যতার নিরিখে এই এখতিয়ার ব্যবহারের যোগ্যতা রাখেন।

ইজমা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজন

কুরআনী মূলনীতি এবং রসূলুল্লাহ্ স.-এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তাতে নিত্য নতুন অবস্থা ও সমস্যার বিবরণ নেই। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ব্যাপকতা কেবল তিনটি বিষয়ে যা নিম্নে উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট হচ্ছে:

هو التنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد لإدراج حكم كل حادثة في القرآن

---

১. সূরা ইউনুস : ৭১

২. حل অর্থ গ্রন্থি খোলা, عقد অর্থ গ্রন্থি লাগানো, সুতরাং যারা গিট বাঁধে এবং খুলতে পারে তারা আভিধানিক অর্থে اهل الحل والعقد শরীয়তের ভাষায় আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ বলতে বোঝায় জটিল সব ব্যাপারে সিদ্ধান্তদানের যোগ্য ব্যক্তিগণ।

৩. মিনহাজুল উসূল, দ্র. হাশিয়া আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১৪৭

www.pathagar.com

"তা (اكملت لكم دينكم -এর অর্থ) হচ্ছে ১. 'আকাইদ ও তৎসংক্রান্ত নীতির ব্যাখ্যা, ২. শরীয়তের মূলনীতির বর্ণনা এবং ৩. ইজতিহাদের নীতিমালার রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা; এমন নয় যে, ভবিষ্যতের সব সম্ভাব্য ব্যাপারের বিধান কুরআনে ভরে দেয়া হয়েছে।"[৪]

এ থেকে বোঝা গেল যুগে যুগে যেসব প্রশ্নের উদ্ভব হবে তার জবাব খুঁজতে হবে ইজতিহাদের মাধ্যমে। এই ইজতিহাদ এককভাবেও হতে পারে, সমষ্টিগতভাবেও হতে পারে বা একের ইজতিহাদমূলক 'রায়'-এ অন্যদের সম্মতিও পাওয়া যেতে পারে অর্থাৎ (اجماع) স্থাপিত হতে পারে।

ফকীহগণের নিম্নোক্ত কথায় এই প্রয়োজনটিই ব্যক্ত করা হয়েছে :

ولا شك أن الأحكام التي تثبت بصريح الوحي بالنسبة إلى الحوادث الواقعة قليلة غاية القلة فلو لم يعلم أحكام تلك الحوادث من الوحي الصريح وبقيت أحكامها مهملة لا يكون الدين كاملا فلا بد من أن يكون للمجتهدين ولاية استنباط أحكامها من الوح

"নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে বিধান প্রমাণিত। যেসব ঘটনা ও অভিনব সমস্যা সৃষ্টি হয় তার মোকাবিলায় সেগুলো অতি সামান্য। সুস্পষ্ট ওহী থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে যদি তাদের বিধান না জানা যায় তাহলে সেগুলো ফালতু পড়ে থাকবে। এর ফলে দীনের পূর্ণতার দাবী অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই মুজতাহিদগণকে নতুন নতুন বিধান উদ্ভাবন করার এখতিয়ার দেওয়া অপরিহার্য।"[৫]

উল্লিখিত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য নির্দিষ্ট নীতি-নিয়ম অনুযায়ী সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে যে আকৃতি নির্ধারিত হবে, তাই ইজমা'র মর্যাদা লাভ করবে। এই ইজমা'র ফায়সালাকে আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে কেন্দ্রীয় সম্মিলনের ফায়সালা গণ্য করবো।

কুরআনে ইজমা'র ভিত্তি

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে ইজমা'র ভিত্তি পাওয়া যায় :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয়দের আনুগত্য করো।"[৬]

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

৪. শারহুত তালভীহ্ আলাত-তাওযীহ্, পৃ. ৫০
৫. প্রাগুক্ত
৬. সূরা আন-নিসা : ৫৯

www.pathagar.com

"(হেদায়াত বা সত্যপথ সুস্পষ্ট হয়ে যাবার পর) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে থাকে, আমি তাকে সেদিকেই নিয়ে যাবো যেদিকে যাওয়া সে পছন্দ করে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিবো।"[৭]

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

"আর এভাবে আমি তোমাদের মধ্যবর্তী (অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ) উম্মত হিসেবে তৈরী করেছি যাতে তোমরা সকল মানুষের জন্য সত্যের সাক্ষ্যদানকারী হও।"[৮]

এই আয়াতগুলো এবং এই ধরনের আরো বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে ফকীহগণ ইজমা' ও তার গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। অধিকন্তু এর সপক্ষে তাঁরা এমনসব হাদীস পেশ করেছেন যেগুলো মূলতঃ ইজমা'র গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে।[৯]

ইসলামের শূরা (شورى) ব্যবস্থা

ইজমা'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সনদযুক্ত প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের শূরা ব্যবস্থা। ইসলামের সকল বিভাগেই এই ব্যবস্থাটি জারী আছে। ইজমা' হচ্ছে একটি বিভাগের শূরা ব্যবস্থা এবং এই বিভাগের ফায়সালার নামই ইজমা'। তাই কুরআন ও হাদীসের যেসব বক্তব্য এই সংগঠন ও ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেসবই এর প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত। রসূলুল্লাহ্ স.-কে হুকুম দেয়া হয়েছে :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

"কাজে-কর্মে তাদের (সাহাবাগণের) সাথে পরামর্শ করো। পরামর্শের পর কোনো বিষয়ে যখন তুমি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হও তখন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো"।[১০]

এই আয়াতটির পূর্বাপর বক্তব্য, বিষয়, স্থান-কাল, বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দাবলীর ব্যাপক অর্থ ইত্যাদি সব কিছু থেকে ইজমা'র মৌলিকত্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক সঙ্গে একথাও পরিষ্কার হয়ে সামনে এসে যায় যে, ইজমা' বিশেষ স্থানে নয় বরং ব্যাপক স্থানে ব্যবহৃত হয়। তাই রসূলুল্লাহ্ স. এই আয়াতটির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামের সাথে আইন সংক্রান্ত ও আইন বহির্ভূত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন।

---

৭. সূরা আন-নিসা : ১১৫
৮. সূরা আল-বাকারা : ১৪৩
৯. এজন্য উসূলে ফিক্‌হের কিতাবগুলো দেখুন।
১০. সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদে রসূলুল্লাহ স. এবং মুসলিমদের ব্যবহারিক জীবনের একটি রীতির প্রসংশাসূচক বর্ণনা রয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতাংশে :

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"এবং তাদের সব ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে (সম্পন্ন হয়)।"[১১]

এই শুরা (شورى) মু'মিনদের সমষ্টিগত-পারিবারিক হোক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়-জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি। রসূলুল্লাহ স. ওহীর সাহায্যে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাই হতো। কিন্তু আল্লাহ সব বিষয়ে ওহী নাযিল না করে বরং তার রসূলকে আদেশ দিচ্ছেন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য এবং এ আদেশ পালনের জন্য মু'মিনদের প্রসংশা করছেন। এই শুরা (شورى) হচ্ছে ইজমা' (اجماع)-এর ভিত্তি। এতে যে ঐকমত্য স্থাপিত হবে তা মেনে চলা মু'মিনদের জন্য ওয়াজিব। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণিত মাওকূফ[১২] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"মুসলিমগণ যা ভালো (কল্যাণকর) মনে করে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও তা ভালো।"[১৩]

এই হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উম্মতের প্রতি যে আস্থা প্রকাশ করেছেন তা অবিসংবাদিতভাবে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পর্কে হতে পারে না।

একথা সুস্পষ্ট যে, অবস্থা ও জামান স্থান-কাল হিসেবে বিশেষ পর্যায়েরই হয়ে থাকে এবং এজন্য কঠিন শর্তের প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ এই ধরনের হাদীসের স্থান-কাল বিশেষিত হবে না সে পর্যন্ত তাকে ইজমা'র প্রমাণ হিসেবে পেশ করা ইজমা' সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ পেশ করবে। কারণ ফকীহগণ স্পষ্ট বলেছেন :

لا اعتبار بقول العوام في الإجماع، ولا وفاقًا ولا خلافا، عند الجمهور لأنهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات، ولا يفهمون الحجة ولا يعقلون البرهان

"ইজমা'র ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সাধারণ মানুষের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সবাই শরীয়তের ব্যাপারে গভীর দৃষ্টির অধিকারী নয়, দলীল প্রমাণ অনুধাবনের ক্ষমতাও সবার থাকার কথা নয়।"[১৪]

সঙ্গত কারণেই ফকীহগণ কতগুলো শর্ত নির্ধারণ করেছেন।

---

১১. সূরা আশ-শূরা : ৩৮

১২. যে হাদীসের বর্ণনা সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে, রসূলের সাথে সংযুক্ত হয়নি এটিকে মাওকূফ হাদীস এবং এক অর্থে একে আসার (اثر)ও বলা হয়- অনুবাদক।

১৩. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩৬০০, বর্ণনটি রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস নামে প্রচলিত থাকলেও মূলত এটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. এর উক্তি হিসাবে প্রমাণিত। হাদীস হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই। (সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফা ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাহু ছায়্যি ফিল উম্মাহ, হাদীস নং-৫৩৩)।

১৪. হুসূলুল মামুল মিন 'ইলমিল উসূল, পৃ. ৩৯, খুলাসা ইরশাদুল ফুহুল লি তাহকীকিল হাক্কি মিন 'ইলমিল উসূল

www.pathagar.com

সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কর্মপদ্ধতি

রসূলুল্লাহ স.-এর পরে সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর ধারা থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইজমা' দলীল-এর মর্যাদা সম্পন্ন এবং ফকীহগণ বৈধ ইজমা'র জন্য যত সব কড়া শর্ত নির্ধারণ করেছেন তা সবই সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর যুগেই বাস্তবায়িত হয়েছে। হযরত আবূ বকর রা. ও উমর রা. তাদের খিলাফত আমলে স্থানীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণকে পারতপক্ষে মদীনার বাইরে যেতে দিতেন না যাতে নতুন কোন সমস্যা সামনে এলে তাদের সবাইকে নিয়ে পরামর্শ করা সম্ভব হতো এবং তাদের ঐকমত্যে (اجماع) যা স্থিরকৃত হতো সবাই তা মেনে নিতো এবং তাই বাস্তবায়িত হতো। হযরত উমর রা.-এর খেলাফত আমলে বিপুল পরিমাণ নতুন সমস্যা দেখা দেয়ায় ইজমা'-এর দৃষ্টান্ত অনেক বেশী পাওয়া যায়। এই আমলে হজ্জের জমায়েতকেও ইজমা'-এর কাজে লাগান হতো। মিল্লাতের শ্রেষ্ঠ মননশীল বহু ব্যক্তিত্বের সমাবেশ উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে ইজমা'য়ে উপনীত হওয়ার পক্ষে অতীব উপযোগী ছিল এবং বরাবরই থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী যুগে হজ্জের সম্মিলনকে ইজমা'-এর জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়নি।

সামগ্রিক পলিসি ও মূলনীতির ভিত্তিতে ইজমা' অনুষ্ঠিত হতে হবে

সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র হেদায়াতের পূর্ণাঙ্গ পলিসি ও মূলনীতির আওতাধীনে ইজমা' অনুষ্ঠিত হতে হবে। আলাদা আলাদাভাবে কুরআন ও সুন্নাতে এর সনদের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় ইজমা' থেকে বিশেষ কোনো ফায়দা হাসিল করা যাবে না। অর্থাৎ যে বিষয়ে ইজমা' অনুষ্ঠিত হয় কুরআন ও সুন্নাহ্তে তার জন্য স্বতন্ত্র সনদ থাকা জরুরী নয়। বরং ইসলামের মূলনীতি ও তার সামগ্রিক পলিসির আওতাধীনে তা অনুষ্ঠিত হওয়াই যথেষ্ট। কারণ সনদ যদি প্রামাণ্য ও নিয়মসিদ্ধ হয় তাহলে সে নিজেই স্বস্থানে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয় ও নিজেকে বাস্তবায়নের আহবান জানায়। ইজমা'র মাধ্যমে তাকে আরো বেশী স্বাতন্ত্র্য দান করার দাবী সনদ ও ইজমা' উভয়েরই গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। আর সনদ যদি অনিয়মসিদ্ধ হয় এবং তার ভিত্তিতে কাজ করার তাগিদ প্রমাণিত না হয়, তাহলে ইজমা'র মাধ্যমে নিঃসন্দেহে তা আরো বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর করার উপযোগী হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি শক্তিশালী ও দুর্বল কোনো প্রকার সনদ না থাকে কিন্তু কল্যাণকারিতার সাধারণ নীতির সাথে তার সম্পর্ক থাকে অথবা তা সাধারণ পলিসি ও বিবেকবুদ্ধি বিরোধী না হয়, তাহলে এতটুকু পরিমাণও ইজমা'র জন্য যথেষ্ট।

ইজমা'র যৌক্তিকতা

জনৈক ফকীহ্র নিম্নোল্লিখিত মন্তব্যে ইজমা'-এর যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট :

www.pathagar.com

لأنَّ الإجْمَاعَ إنَّمَا عُرِفَ حُجَّةً كَرَامَةً لِهَذه الأُمَّة لحَاجَتهم إلَى ذَلكَ ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاتَمُ الأَنْبِيَاء وَمَتَى وَقَعَتْ حَادثَةٌ لَيْسَ فيهَا نَصٌّ قَاطعٌ وَعَملُوا فيهَا بالاجْتهَاد وَهُوَ مُحْتَملٌ للْخَطَأ . وَجَازَ أَنْ يَكُونُوا عَلَى الْخَطَأ كَانَ قَوْلا بخُرُوجِ الْحَقِّ عَنْ جَميع الأُمَّة وَإنَّهُ لا يَجُوزُ وَمَسُّ الْحَاجَة إلَى تَجْديد الرِّسَالَة وَلا وَجْهَ إلَيْه لإخْبَار اللّٰه تَعَالَى بكَوْن رَسُولنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَاتَمَ الأَنْبيَاء فَصَارَ الإجْمَاعُ حُجَّةً لهَذه الْحَاجَة

"উম্মতে মুহাম্মাদীর মর্যাদা এবং তাদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইজমা'-কে 'হুজ্জাত' (حجة) অর্থাৎ দলীল রূপে নির্ধারিত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. ছিলেন শেষ নবী। (তাঁর ওফাতের পর) উম্মতের সামনে যদি এমন কোনো পরিস্থিতি দেখা দেয় যে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট বিধান (কিতাবে এবং সুন্নাতে) না থাকে, তখন উম্মত (ব্যক্তিগত ভাবে) চিন্তা-ভাবনা বা ইজতিহাদ করতে বাধ্য হবে। অথচ ইজতিহাদে ভুলের সম্ভাবনা যথেষ্ট। যদি তারা নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী কাজ করে তবে সমগ্র উম্মতের সত্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ ভুল সংশোধনের জন্য রিসালাতের নবায়নের অর্থাৎ পুনরায় রসূল প্রেরণের প্রয়োজন হবে, যা বর্তমানে অসম্ভব, কারণ আল্লাহ আমাদের রসূল স.-কে পাঠিয়ে রেসালাতের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। এই পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য আল্লাহ তা'আলা শরীয়ত-এর অন্যতম উৎস এবং দলীল (حجة) রূপে গণ্য করেছেন ইজমা'কে যা আসলে Consersus বা ইজতিহাদের সমষ্টিগত রূপ। এতে রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি বিশেষ রহমতের প্রকাশ।"[১৫]

ইজমা'কারীদের যোগ্যতা

ফিক্‌হের পরিভাষায় যাঁরা আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ (اهل الحل والعقد) অর্থাৎ যাঁরা তাদের যোগ্যতার দাবীতে ইজমা'-তে শরীক হতে পারেন এবং যাঁদের সিদ্ধান্ত ইজমা'রূপে মুসলিম জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এবং গ্রহণ আবশ্যিক হবে, তাঁদের যোগ্যতা হতে হবে অতি উন্নত মানের এবং সে যোগ্যতা দু' রকমের :

১. 'ইলমী (علمى) বা জ্ঞানগত যোগ্যতা যথা :

(এক) হিকমাত (حكمة)-এর পর্যায়ে কুরআন মাজীদের জ্ঞান; অন্ততপক্ষে গভীর জ্ঞান (এই উভয় পর্যায়ের আলোচনা ইতোপূর্বে হয়েছে)। কুরআনের শুধু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা যথেষ্ট নয়;

১৫. আত্-তাকরীর ওয়াত-তাহবীর, খ. ৩, পৃ. ১১২

www.pathagar.com

(দুই) সুন্নাতকে রেওয়ায়াত ও দেরায়াতের মানদণ্ডে যাচাই করার পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগতি এবং তা প্রয়োগের সঠিক স্থান-কাল নির্ণয়ের যোগ্যতা;

(তিন) রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর জীবনধারার সাথে পরিচিতি এবং তাঁদের ইজমা' ও ফায়সালা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি;

(চার) কিয়াসের মাধ্যমে বিধান উদ্ভাবনের নীতি পদ্ধতির জ্ঞান;

(পাঁচ) দেশ ও জাতির স্বভাব-প্রকৃতি, অবস্থা, চাহিদা, রীতি-রেওয়াজ, অভ্যাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কে অবহিত হওয়াও জরুরী।

এই 'ইলমী যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

الاجماع المعتبر في فنون العلم هو اجماع اهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم فالمعتبر في الاجماع في المسائل الفقهية قول جميع الفقهاء وفي المسائل الاصولية قول جميع الاصوليين وفي المسائل النحوية قول جميع النحويين ونحو ذلك ومن عدا اهل ذلك الفن هو في حكم العوام

"জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইজমা'র ক্ষেত্রে এমনসব লোকের ইজমা' নির্ভরযোগ্য হবে যারা সংশ্লিষ্ট জ্ঞানশাখায় গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হবেন। অন্যদের ইজমা' গৃহীত হবে না; যথা ফিক্‌হ সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমা' হবে ফকীহগণের মতের ঐক্যে, তদ্রূপ উসূল সংক্রান্ত মাসায়েলে উসূলবিদগণের এবং ব্যাকরণ সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাকরণবিদগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রে শাস্ত্রীয় জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা عوام বা সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হবে।"[১৬]

২. 'আমালী (عملى) যোগ্যতা অর্থাৎ শুরা-তে অংশ গ্রহণে যোগ্য বিবেচিত হবেন এমন ব্যক্তিত্ব যাঁর ক্রিয়াকলাপ উন্নত চরিত্রের পরিচয় বহন করে যিনি শরীয়তের সকল নির্দেশ পালনকারী ও সকল নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে দূরে অবস্থানকারী অর্থাৎ যথার্থ মুত্তাকী; তবে তাকওয়ার কোনো বিশেষ মানদণ্ড নির্ধারিত নেই। ফাসেকী অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী কর্ম, অশ্লীলতা, বিদআ'তসমূহ থেকে মুক্ত থাকা এবং অশালীনতা আর পাপের স্পর্শ থেকে সাবধানতা অবলম্বন যথেষ্ট। ফকীহগণের বক্তব্য নিম্নরূপ :

إِنْ كَانَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ فَلا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فِي الإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُظْهِرٍ لَهُ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ فِي الإِجْمَاعِ

"যদি প্রকাশ্যে ফাসেকীতে লিপ্ত থাকে তাহলে ইজমা'র ব্যাপারে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না, কিন্তু যদি তার ফাসেকী অপ্রকাশিত থাকে (এবং 'ইলমী

---

১৬. হুসূলুল মামূল মিন 'ইলমিল উসূল, পৃ. ৪০, মুলাখখাস ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন 'ইলমিল উসূল

www.pathagar.com

ও দৃশ্যত 'আমলী যোগ্যতা থাকে) তাহলে ইজমা'-তে তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।"[১৭]

তেমনি অশালীন, নির্লজ্জ, পাপ বর্জনে অসাবধান ব্যক্তির মত ইজমা'-এর ক্ষেত্রে অগ্রহণীয়।[১৮]

আসলে ফিস্‌ক ও বিদ'আত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তার ঈমানী সচেতনতা ও বুদ্ধি লোপ পায় এবং তার মধ্যে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা থাকে না যাকে কুরআন মাজীদে فرقان বলা হয়েছে :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাকো (এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো) তাহলে তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করবেন ফুরকান অর্থাৎ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য এবং ফায়সালা করবার ক্ষমতা।"[১৯]

কমপক্ষে তিন ব্যক্তির ঐকমত্য ইজমা' রূপে গণ্য

ইজমা'-এর জন্য বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির মতৈক্য জরুরী নয়। অধিক সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন না পাওয়া গেলে অন্ততপক্ষে তিনজনের মতৈক্যেও ইজমা' হতে পারে। তবে যতজনই উপস্থিত থাকেন তাদের সবার অবশ্য সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে অথবা মুসলিম উম্মাহ্‌র উলামার মধ্যে 'ইলম ও আমলের বিচারে বিশিষ্ট হতে হবে। সবাইকে অবশ্য একমত হতে হবে তাও জরুরী নয়। অধিকাংশের ঐকমত্যই যথেষ্ট। সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর কর্মধারা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম গাযালী রহ. বলেন :

انه ينتعقد مع مخالفة الاقل

"সংখ্যালঘুর ভিন্নমত সত্ত্বেও (সংখ্যাগুরুর মতৈক্যে) ইজমা' স্থাপিত হয়।"[২০]

অন্যপক্ষে একথা সত্য, ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠের ফায়সালা নির্ভরযোগ্য নয়। ইসলামে মাথাগুণতি অভিমত যাচাইয়ের বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, বরং অভিমত প্রদানকারীদের ধ্যান ধারণা, ইলম এবং আমলী যিন্দেগীর প্রকৃষ্টতা বিচার্য। সুতরাং ইজমা'র জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিগণ হবেন ইলম ও আমলের ভিত্তিতে বাছাই করা ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন এবং মুত্তাকী ব্যক্তির মতবিরোধেরও গুরুত্ব থাকে, কারণ তা হয় যুক্তি এবং দলীল ভিত্তিক, নেহায়েত

---

১৭. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, খ. ৩, পৃ. ৯৬
১৮. শারহুত তালভীহ্ আলাত-তাওযীহ, পৃ. ৪৬
১৯. সূরা আল-আনফাল : ২৯
২০. হুসূলুল মামূল মিন 'ইলমিল উসূল, পৃ. ৪০

www.pathagar.com

স্বার্থান্ধতা বা বিরোধ-প্রবণতা প্রসূত হয় না। এই কারণে এই মতবিরোধ মুসলিম জনগণের মধ্যে বিভেদ বা বিপর্যয় সৃষ্টি করে না, বরং এই মতবিরোধ চিন্তাশীল মুসলিমদের জন্য চিন্তা-চর্চার খোরাক জোগায়। উদাহরণ স্বরূপ ইসলামী ফিক্‌হের ইমামগণের মতানৈক্যের কথা বলা যেতে পারে। তাদের মতানৈক্য গবেষণার জোয়ার এনে দিয়েছে যাতে ফিক্‌হ্ সাহিত্য এক বিরাট সমুদ্রের আয়তন লাভ করেছে।

ইজমা'র বাস্তব রূপ যুগের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, ইজমা'তে শরীক হবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন হবে কিভাবে? ইসলামের ইতিহাসে কেবল একটি নির্বাচন পদ্ধতির নির্দেশ আমরা পাই। পূর্বে বলা হয়েছে, হযরত উমর রা.-এর আমল পর্যন্ত "আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ" বলে বিবেচিত ব্যক্তিগণকে পারত পক্ষে মদীনার বাইরে পাঠান হতো না। এদের সিলেকশন বা নির্বাচন কিভাবে হতো? ভোট বা ব্যালটের মাধ্যমে নয়, বরং খ্যাতি (Reputation)-এর ভিত্তিতে। কে কতটা কুরআন আয়ত্ত করেছে, রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্যে কে কতটা সার্থক শিক্ষা অর্জন করেছে, ইসলামের খেদমতে কে কতো অগ্রগামী ইত্যাদি বিবেচনায় তাঁদের নির্বাচন হয়েছিল এবং এই নিবার্চন ছিল আল্লাহভীরু মানুষের প্রকৃতিগত গুণগ্রাহীতার আদলে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তারপরও সাহাবারে কিরাম রা. নানা কারণে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন, রাষ্ট্রের কেন্দ্র মদীনা থেকে সরে গেল বিভিন্ন স্থানে। সুতরং ইজমা'-তে অংশগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কোনো এক কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে থাকলেন না। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'উলামাকে পরিকল্পিতভাবে কোনো স্থানে সমবেত করা অত্যন্ত সহজসাধ্য, আঞ্চলিক সমাবেশও হতে পারে। লিখিতভাবে মতবিনিময়ের মাধ্যমেও ইজমা' সম্ভব। যেমন করেই মুসলিম জগৎ কোনো বিতর্কিত বিষয়ে ইজমা' প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে, ইজমা'তে রায় প্রদানকারীদের নির্বাচন-নীতি হতে হবে মদীনার সেই নীতি- 'আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ, নির্বাচনের নীতি। মুসলিম বিশ্বের নেতৃবর্গ যোগ্য 'উলামার প্যানেল তৈরী করতে পারেন, ইজমা' সৃষ্টির জন্য মজলিসে শূরা স্থাপন করা যেতে পারে। যুগের অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এভাবে গ্রহণ করা যায়।

ইজমা'র পরিধি

"আহলুল হাল্লি ওয়াল 'আকদ"-এর ইজমা' মুসলিম উম্মাহ্‌র ব্যবহারিক জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। 'উলামায়ে-ইসলামের মতে নিম্নোল্লিখিত ব্যাপারগুলো ইজমা'-এর আওতাভুক্ত :

www.pathagar.com

(এক) অবস্থা ও চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন আইন রচনা;

(দুই) পূর্ববর্তী কোন ইজমা' ভিত্তিক ফায়সালাতে পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী যথোপযুক্ত সংশোধন;

(তিন) সাহাবীগণ রা. যেসব বিধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন দলীল ও যুক্তির ভিত্তিতে সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টি অবস্থাদৃষ্টে অগ্রাধিকার পেতে পারে তা স্থির করা;

(চার) ফকীহগণের বিভিন্ন রায়ের মধ্যে অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তন বা অগ্রাধিকার নির্ণয় করা।

উসূলের কিতাবগুলোতে নিম্নোক্ত বক্তব্য পাওয়া যায় :

وَالإِجْمَاعُ فِي كَوْنِه حُجَّةً أَقْوَى مِنَ الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ وَإِذَا كَانَ يَجُوزُ النَّسْخُ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ فَجَوَازُهُ بِالإِجْمَاعِ أَوْلَى

"মশহূর হাদীসের[২১] তুলনায় ইজমা' অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ। কাজেই মশহূর হাদীস যদি কোনো বিধানকে নাস্‌খ[২২] করতে পারে, তাহলে ইজমা' অধিকতর যৌক্তিকভাবে নাস্‌খ করতে পারে।"[২৩]

وَيَتَصَوَّرُ أَنْ يَنْعَقِدَ إِجْمَاعٌ بِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ تَتَبَدَّلَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فَيَنْعَقِدَ إِجْمَاعٌ آخَرُ عَلَى خِلَافِ الإِجْمَاعِ الأَوَّلِ

"এ কথাটি বোধগম্য, কোন কল্যাণকর ব্যাপারের প্রেক্ষিতে একটি ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হলো। তারপর সেই ব্যাপারটি পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম ইজমা'র বিপরীত আর একটি ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"[২৪]

এ উক্তির সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে ফকীহগণ সাহাবীগণের রা. কার্যক্রম থেকে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেছেন।

ইজমা' ভিত্তিক ফায়সালার মর্যাদা

ইসলামী আইন ব্যবস্থায় ইজমা' খুবই গুরুত্বের অধিকারী। উসূলের কিতাব সমূহে বলা হয়েছে :

---

২১. বর্ণনার প্রতিটি স্তরে যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অন্তত তিনজন তাকে মশহূর হাদীস বলে। একে এক অর্থে খবরে ওয়াহিদও বলা হয়। খবরে ওয়াহিদের সাহায্যে ইয়াকীন (পূর্ণ বিশ্বাস) অর্জিত হয় কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে -অনুবাদক।

২২. রহিত (نسخ = নাকচ)।

২৩. আত্‌ তাকরীর ওয়াত তাহবীর, খ. ৩, পৃ. ৬৯

২৪. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭০

www.pathagar.com

فَإِنْ اسْتَنْبَطَ الْمُجْتَهِدُونَ فِي عَصْرٍ حُكْمًا ، وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ قَبُولُهُ فَاتِّفَاقُهُمْ صَارَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ فَلا يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَالَفَتُهُمْ

"মুজতাহিদগণ যখন কোনো যুগে কোনো বিধান উদ্ভাবন করেন, তাঁরা তাতে একমত হন, তখন সমকালীন মুসলিমদের জন্য তা গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এর বিরোধিতা করা জায়েয নয়, কারণ এই মতৈক্য সংশ্লিষ্ট বিধানের দলীল স্বরূপ।"[২৫]

তবে ইজমা‘ ভিত্তিক ফায়সালা যেহেতু যুগের চাহিদা অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং সমকালীন ফকীহগণের চিন্তা-চেতনার প্রভাব থাকে তার ওপর, তাই বিশেষ করে সমকালীন লোকদের জন্য এই ইজমা‘র অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে। পরবর্তী যুগে কিংবা একই যুগে অবস্থার পরিবর্তনে ফায়সালা বদলে যেতে পারে।

মৌন (سكوتى) ইজমা‘

ইজমা‘র একটি ধরন হচ্ছে ইজমা‘ সুকূতী‘, অর্থাৎ নীরব বা মৌন সম্মতিমূলক। নিম্নোক্ত উক্তিতে এর সংজ্ঞা পাওয়া যায় :

هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول، وينتشر في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون، ولا يظهر منهم اعتراف، ولا إنكار

"ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তি কোনো রায় প্রকাশ করলেন এবং এ রায় অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে প্রচার লাভ করলো, অথচ তারা নীরবতা অবলম্বন করলেন, না স্বীকৃতি দিলেন আর না অস্বীকার করলেন, একে বলে ইজমা‘ সুকূতী। এইরূপ ইজমা‘ও حجة বা দলীলরূপে বিবেচিত হয়।"[২৬]

বলাবাহুল্য, এই নীরবতা স্বীকৃতির প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে যদি মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। মত প্রকাশ বিঘ্নিত বা শর্তসাপেক্ষ হলে নীরবতার অন্য কারণও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে নীরবতা সম্মতিসূচক বিবেচিত হবে না। নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় :

"ইজমা‘ দুই প্রকার : এক. হাকিকী। দুই. হুকমী। হাকিকী ইজমা‘ এমন এক ইজমা‘কে বলা হয় যেখানে সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে সমগ্র রায়দানকারী গোষ্ঠীর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর্যায়ভুক্ত বিষয়ের মাধ্যমে ঐকমত্য হয়। যেমন এমন ধরনের নীরবতা যা রায় মেনে নেবার কথা প্রকাশ করে। আর এর বিপরীত অবস্থাকে হুকমী বলা হয়।"

---

২৫. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ, পৃ. ৫০
২৬. হুসূলুল মামূল মিন ‘ইলমিল উসূল, পৃ. ৩৮, ইরশাদুল ফুহূল

www.pathagar.com

একটি বিভ্রান্তি

সাধারণ প্রচলিত একটি ভ্রমাত্মক মত এই যে, ইজমা'র জন্য যেহেতু সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য জরুরী অথচ বাস্তবে তা সম্ভব নয় তাই ইজমা'ও সম্ভব নয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. এই বিভ্রান্তির জবাব দিতে গিয়ে বলেন :

"লোকেরা যে ধরনের ইজমা'র কথা কল্পনা করে অর্থাৎ সমগ্র উম্মতে মুসলিম তাতে সুস্পষ্ট ঐকমত্যে পৌঁছবে এবং কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না, এ ধরনের চিন্তা উদ্ভট এবং এটা আদৌ বাস্তব ভিত্তিক নয়। তবে অধিকাংশ ইজমা'র ক্ষেত্রে দেখা গেছে শহরের মুফতীদের মধ্য থেকে সিদ্ধান্ত দান করার যোগ্যতা সম্পন্ন গোষ্ঠীর ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে। হযরত উমর ফারুক রা.-এর সময় যেসব মাসায়েল সম্পর্কে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, সিদ্ধান্ত দান করার যোগ্যতাসম্পন্ন গোষ্ঠী একমত হয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রেও এই ধরনের ইজমা'র সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এমন ধরনের ইজমা' যে ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক 'উলামার ফতোয়া এবং বাকি লোকদের নীরবতা রয়েছে। তারপরের পর্যায়ে হচ্ছে এমন ধরনের ইজমা' যে ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দু'টি বক্তব্য থাকে যা তৃতীয় বক্তব্যকে নাকচ করে দেবার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছায়। আর এরপর হচ্ছে হারামাইন শারীফাইনের (মক্কা ও মদীনা) অধিবাসীগণ ও খলীফাগণের মতৈক্য।"

মোটকথা, ইজমা'র ব্যাপারটি তেমন জটিল নয় যেমনটি মনে করা হয়ে থাকে। আবার ব্যাপারটি খুব সহজও নয়। অযোগ্য লোকদের একটা কমিটির কোনো ফায়সালাকে কখনো ইজমা'র মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না।

www.pathagar.com

কিয়াস : ফিক্‌হের চতুর্থ উৎস

কিয়াস-এর সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

কিয়াস-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরিমাপ, তুলনা, অনুমান, সাদৃশ্য ইত্যাদি। ফকীহগণের পরিভাষায় 'ইল্লাত বা কার্যকারণের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ফায়সালা ও নযীরের আলোকে নতুন সমস্যার সমাধানের সন্ধান করাকে কিয়াস বলা হয়। এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة

> "হুকুম ও 'ইল্লাত-এর বিবেচনায় মূল (اصل অর্থাৎ পূর্বতন হুকুম)-এর আদলে শাখা (فرع অর্থাৎ নতুন প্রশ্ন)-এর স্বরূপ নির্ণয় করা।"[১]

আরো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে :

إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة

> "শরীয়ত-এর বিধানের ক্ষেত্রে উভয়ের 'ইল্লাতের মধ্যে ঐক্যের কারণে একটি ব্যাপারকে অন্য একটি ব্যাপারের সাথে যুক্ত করে দেয়া।"

উদ্ভূত কোনো কোনো প্রশ্নের জবাব সহজে লাভ করা যায় কুরআন ও সুন্নাহ্ সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত বিধানের শব্দাবলী ও অর্থ থেকে। এর জন্যে ফকীহ খুব গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। অন্যপক্ষে এমন কতিপয় সমস্যা দেখা দিতে পারে যে ক্ষেত্রে সদৃশ বিধান সহজ নয় বরং (استنباط/ইস্তিম্বাত)-এর উদ্ভাবনের প্রয়োজন পড়ে এবং 'ইল্লাতের সন্ধান করতে হয়। আসলে এটি হচ্ছে কিয়াসের প্রকৃত ক্ষেত্র।

এ বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গেলে বলা যায়, নতুন যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় সেগুলো দু'ভাবে সমাধান করা যায় :

(এক) যে জিনিসগুলো কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র সুস্পষ্ট বিধানের মাধ্যমে প্রমাণিত সেগুলোর শব্দ ও অর্থ সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করতে হবে এবং ফকীহগণ বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ 'চাহিদা, ইশারা, ইঙ্গিত' ইত্যাদির আওতাধীনে নতুন সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করতে হবে।

এভাবে শব্দের বাহ্যিক কাঠামো ও অর্থের সাহায্যে বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বেশী গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে না।

---

১. নূরুল আন্‌ওয়ার, পৃ. ২২৪

www.pathagar.com

(দুই) কিন্তু নতুন অবস্থা ও সমস্যাবলীর বিস্তার এতো বেশী ব্যাপক ও বৈচিত্রময় যে, অনেক সময় নিছক তাতেই কাজ চলে না। এহেন অবস্থায় বাধ্য হয়ে সুস্পষ্ট হুকুমের অন্তরনিহিত অর্থ থেকে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা হবে। অর্থাৎ গভীরে প্রবেশ করে তার 'ইল্লাত বের করা হবে। সেই 'ইল্লাতের ধরন ও অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হবে। তারপর নতুন সমস্যাটির 'ইল্লাত দেখা হবে। তার অনুকূল ও প্রতিকূল দিকগুলো বিবেচনা করা হবে। যদি পুরাতন ও নতুন উভয় 'ইল্লাতের মধ্যে ঐক্য দেখা যায় তাহলে পূর্ববর্তী হুকুম এই নতুন সমস্যাটির ক্ষেত্রেও জারী করে দেয়া হবে। আসলে এই অনুসন্ধানমূলক উদ্ভাবন কর্মের নামই 'কিয়াস'। এই কর্মধারার মাধ্যমে এমনসব নতুন সমস্যার সমাধানও করা যায় সুস্পষ্ট হুকুমের শব্দাবলী ও অর্থ যেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হয় না বরং 'ইল্লাতের মাধ্যমে তার বুদ্ধিগত অর্থের মধ্যে সেগুলোর স্থান হয়। তাই বলা হয়েছে :

اذا أخذوا حكم الفرع من الاصل سموا ذلك قياسا لتقديرهم الفرع بالاصل فى الحكم والعلة

"ফকীহগণ যখন মূল (পূর্বতন ফয়সালা) থেকে অপ্রধান ও খুটিনাটি বিষয়ের (নতুন সমস্যা) বিধান বের করেন তখন তাকে কিয়াস বলা হয়। কারণ এ অবস্থায় তারা বিধান ও 'ইল্লাতের ব্যাপারে মূলের সাহায্যে অপ্রধান ও খুটিনাটি বিষয়ের অনুমান করে থাকেন।"[২]

কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজন

কিয়াসের প্রয়োজনের মৌলিক কারণ ইতোপূর্বে 'ইজমা'র অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, একদিকে আছে উসূল (মূলনীতি) ও কুল্লীয়াত (পূর্ণাঙ্গনীতি), এগুলো বাহ্যত সীমিত অর্থের অধিকারী। আর অন্যদিকে আছে অবস্থা ও চাহিদার নতুন নতুন পরিবর্তন এবং যামানার প্রয়োজনের নতুন নতুন মোড় পরিবর্তন। এগুলো নিত্য নতুন সমস্যার জন্ম দিয়ে চলে। এহেন অবস্থায় উসূল ও কুল্লিয়াত এবং সুস্পষ্ট বিধানের বুদ্ধিগত অর্থ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং তাদের প্রাণসত্তা ও প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদের অঙ্গন এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা প্রয়োজন হয় যার ফলে তা প্রত্যেক যুগের সমস্যাবলীকে তার নিজের মধ্যে স্থান দিতে সক্ষম হয়। এর ফলে সমকালীন মুফতীগণ তার গায়ে নিজেদের রঙ লাগিয়ে দিতে সক্ষম হবেন না।

কুরআনে কিয়াসের ভিত্তি

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোকে কিয়াসের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে :

---

২. হুসামী, পৃ. ৯১

www.pathagar.com

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"কাজেই হে চক্ষুষ্মান (চিন্তাশীল) ব্যক্তিরা! তোমরা (এ থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করো।"[৩]

(فاعتبروا) 'শিক্ষা গ্রহণ করো' কথাটির ব্যাখ্যায় ফকীহগণ বলেছেন :

رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ أَيْ : الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا هُوَ ثَابِتٌ لِنَظِيرِهِ

"কোনো ব্যাপারকে তার نظير বা সদৃশের সাথে যুক্ত করে দেয়া অর্থাৎ নযীরের বেলায় যে হুকুমটি প্রতিষ্ঠিত এর বেলায়ও সেই হুকুমটি প্রয়োগ করা।"[৪]

আয়াতের فَاعْتَبِرُوا কথাটির মধ্যে استنباط অর্থাৎ উদ্ভাবনের আদেশের ইঙ্গিত রয়েছে। এই উদ্ভাবন ক্ষমতাকে কুরআন মাজীদে তাফাক্কুহ (تفقه) নামে অভিহিত করা হয়েছে :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

ভাবার্থ : "মুসলিমদের মধ্য থেকে একটি ছোট দলকে (طَائِفَةٌ) দীনের ব্যাপারে গভীর অন্তরদৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (শিক্ষা) সফর করা উচিৎ।"[৫]

এই طَائِفَةٌ হচ্ছে পূর্ববতী আয়াতের أُولِي الْأَبْصَارِ বা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যাদের উপর আল্লাহ আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন এবং রসূলুল্লাহ স. যাদেরকে হিকমত (তত্ত্বজ্ঞান) শিক্ষা দিতেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

"তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিতেন"।[৬]

কুরআন মাজীদে এই ক্ষুদ্র দলকে কখনো কখনো أُولُو الْأَلْبَابِ অর্থাৎ মস্তিষ্কধারীও বলা হয়েছে,[৭] তাদের সম্বন্ধে الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ অর্থাৎ যারা উদ্ভাবনকারী- এইরূপ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।[৮]

কিয়াসের মাধ্যমে আহকাম উদ্ভাবনের ব্যবস্থা এজন্য করা হয়েছে যেন ইসলামী শরীয়ত সর্বকালীন ব্যবস্থারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর মুসলিমগণকে কখনও নতুন কোনো জীবন ব্যবস্থার সন্ধানে পেরেশান হতে না হয়।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, কুরআন ও সুন্নাহ্র বহু বিধানের সাথে তাদের 'ইল্লাত' ও 'লক্ষ্য' (غاية) বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন মদ্য পান হারাম- এই বিধানের

---

৩. সূরা হাশর : ২
৪. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ, পৃ. ৫৪
৫. সূরা তাওবাহ : ১২২
৬. সূরা আলে ইমরান : ১৬৪
৭. সূরা আল-বাকারাহ : ২৬৯; সূরা আলে ইমরান : ০৭
৮. সূরা আন-নিসা : ৮৩

www.pathagar.com

'ইল্লাত হচ্ছে سكر অর্থাৎ মাদকতা। এই 'ইল্লাত যতসব বস্তুতে থাকবে সবই হারাম। যেমন গাঁজা, আফিম ইত্যাদি। আর এই হুকুমের غاية বা লক্ষ্য হচ্ছে اَلْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (শত্রুতা এবং হিংসা) থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

একথা ঠিক, 'ইল্লাত (কার্যকারণ) ও লক্ষ্য জেনে নেয়ার পর হুকুম পালন করা সহজ হয়ে যায়, কেউ কেউ একথা মনে করে থাকেন। কিন্তু উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য মেনে নিলেও কোনো অনিবার্য সমস্যার সৃষ্টি হয় না। বরং এর ফলে আরো অনেক সুবিধার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিয়াসের বিরুদ্ধ মতবাদ

কিয়াসের পক্ষে বলিষ্ঠ প্রমাণ এমনসব আয়াতেই রয়েছে যেগুলোকে কিয়াসের বিরুদ্ধেও পেশ করা হয়ে থাকে। যেমন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"সমস্ত ব্যাপারে বর্ণনা প্রদানের জন্য আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি"।[৯]

وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"শুকনা ও ভিজা প্রতিটি জিনিস সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।"[১০]

এ কথাটি সত্য, উভয় আয়াতেই কুরআন মাজীদের সর্বজনীনতা, সর্বকালীনতা এবং ব্যাপকতা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে কুরআন মাজীদের এই শব্দগুলো এবং আভিধানিক অর্থের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলা অকল্পনীয় যে কুরআন মাজীদ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ-ত্রিকালের সর্ববিষয়ের বিস্তারিত আহকাম-এর ধারক বলে দাবী করে। অবশ্য মৌলিক ও ব্যাপক নীতি (اصول এবং كليات) নির্ধারণে কুরআন মাজীদ স্বয়ংসম্পূর্ণ, শাখা-প্রশাখার (جزئيات) ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ স.-এর উপর এবং প্রয়োজনীয় কিয়াসের সাহায্যে বিধান উদ্ভাবন মানুষের 'আকলে সালীম' (عقل سليم তথা সত্যাগ্রহী)-এর উপর ন্যস্ত। অন্যপক্ষে, মুফাস্‌সিরীন 'কিতাবুম মুবীন' (كتاب مبين)-এর অর্থ বলেছেন লাওহে মাহ্‌ফূয (لوح محفوظ) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত ফলক যাতে সব কিছুই বিবৃত রয়েছে। আর تبيان মানে মৌলিক ও সার্বিক নীতি। অভিজ্ঞজনেরা এই গভীরতার ইঙ্গিত করেছেন :

> "কুরআনের বিস্ময়কর বিষয়াদির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গভীর তত্ত্বের কোনোদিন পরিসমাপ্তি হবে না এবং পুনরাবৃত্তি করার কারণে এই কালাম পুরানোও হয়ে যাবে না বরং প্রত্যেক বারের পাঠে চিন্তাশীল পাঠক ও গবেষকের জন্য তা গভীর তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত করবে।"

---

৯. সূরা আন-নাহল : ৮১

১০. সূরা আল-আন'আম : ৫৯

www.pathagar.com

এইসব তত্ত্ব ও গভীর জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"এগুলোর অভিজ্ঞতা লাভ করতে গিয়ে বড় বড় কর্মবীরের কোমর ভেঙে গেছে এবং চিন্তা ও কল্পনার উর্ধমুখী পাখিগুলো তাদের আবাস গৃহের চতুঃসীমায় চক্কর লাগাতে অপারগ হয়েছে।"

দ্বিতীয় আয়াতে 'কিতাব' বলতে যেমন কুরআন মাজীদ বুঝানো হয় এবং প্রথম আয়াতে 'তিবয়ান' বলে মূলনীতি ও পূর্ণাঙ্গ বা সর্বজনীন নীতি না বুঝানো হয়, বরং খুটিনাটি বিষয় বুঝানো হয়, তেমনি এক অবস্থায় এমনটি হয়। অন্যথায় গবেষক মুফাসসিরগণের মতে 'কিতাব' বলতে লাওহে মাহ্‌ফূযকে (আল্লাহ্‌র ইল্‌ম) বুঝানো হয়েছে এবং তারই সর্বজনীনতার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আর 'তিবয়ান' বলতে মূলনীতি ও সর্বজনীন নীতি বুঝানো হয়েছে। এছাড়া আরো কয়েকটি আয়াত কিয়াসের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়। কিন্তু স্থান ও কাল নির্ধারণের পর আর বিরোধিতার অবকাশ থাকে না।

রসূলুল্লাহ স.-এর কিয়াস অন্যদের জন্য দলীল নয়

কিয়াসের প্রমাণ হিসেবে রসূলুল্লাহ স.-এর কর্মপদ্ধতিকে পেশ করে যায় না। যেহেতু তিনি ছিলেন ওহীর প্রকাশস্থল, ইলাহী হিকমতের জ্ঞানের অধিকারী, যেহেতু তাঁকে ইজতিহাদী ভুল থেকে সুরক্ষিত রাখা হতো এবং যেহেতু উম্মতের মধ্যে কেউ এসব গুণের অধিকারী ছিলেন না তাই শুধু তাঁর কিয়াস অন্যদের কিয়াসের বৈধতার দলীল হতে পারে না। তিনি বলেন,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"নিজেদের দুনিয়াবী বিষয়গুলো তোমরাই ভালো জানো।"[১১]

এবং

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

"যখন নিজের রায়ের ভিত্তিতে আমি তোমাদের কোনো জিনিসের হুকুম দিয়ে থাকি তখন জেনে রাখো আমি একজন মানুষ।"[১২]

অবশ্য তাঁর হাদীস অন্যদের জন্য কিয়াসের সুযোগ সৃষ্টি করে।

তিনি মু'আয ইবনে জাবাল রা.কে ইয়ামেনে পাঠাবার সময় তাকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করেছিলেন এবং তার জবাব দিয়েছিলেন মু'আয রা.। যা থেকে কিয়াসের বৈধতা প্রমাণিত হয় :

---

১১. সহীহ মুসলিম, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : উজূবু ইমতিছালি মা কালাহু শারআন..., হাদীস নং-৬২৭৭

১২. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬২৭৬

www.pathagar.com

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلاَ فِى كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللَّهِ »

"রসূলুল্লাহ্ স. মু'আয রা.-কে বললেন, "কী দিয়ে বিচার করবে"? [রসূল স.-এর প্রেরিত কর্মকর্তারা একাধারে বিচারক, প্রশাসক এবং প্রচারকের দায়িত্ব পালন করতেন] তিনি উত্তরে বললেন : কিতাবে যা আছে তা দিয়ে; রসূলুল্লাহ্ স. জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ্র কিতাবে যদি কোন নির্দেশ না পাও তবে? মু'আয জবাব দিলেন : রসূলুল্লাহ্ স.-এর ফায়সালার ভিত্তিতে করবো; রসূলুল্লাহ্ স. বললেন : রসূলুল্লাহ্ স. যে ফায়সালা করেছেন তার মধ্যেও যদি (উদ্ভূত বিষয়ের ব্যাপারে কোন ফায়সালা) না পাও তবে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি ইজতিহাদ করে 'রায়' দেব"। রসূলুল্লাহ্ স. (খুশী হয়ে) বললেন, "মহান আল্লাহ্র শোকর, তিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন তাওফীক দিয়েছেন যাতে তাঁর রসূল সন্তুষ্ট"।[১৩]

অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে : মু'আয রা. ও আবূ মূসা রা.-কে রসূলুল্লাহ্ স. ইয়ামেনের এক একটি এলাকার কাযী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। এ সময় তাঁর প্রশ্নের জবাবে তারা যা বলেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

إذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الأمر بالأمر, فما كان أقرب إلى الحق عملنا به, فقال عليه الصلاة والسلام: "أصبتما"

"সুন্নাতে কোনো নির্দেশ না পেলে আমরা (উদ্ভূত) বিষয়কে একটি (সদৃশ) বিষয়ের ওপর কিয়াস করবো এবং যা সত্যের সব চাইতে নিকটবর্তী তার উপর আমল করবো। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, তোমাদের উত্তর সঠিক হয়েছে।"[১৪]

কিয়াসের অবৈধতা প্রমাণের জন্য একটি হাদীস পেশ করা হয়, তাতে রসূলুল্লাহ্ স. বললেন,

لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ وَأَبْنَاءُ سَبَايَا الأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"যতদিন পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের মধ্যে যুদ্ধ বন্দীদের সন্তানদের আধিক্য হয়নি ততদিন তাদের সব ব্যাপার ঠিকমতই চলতে থাকে। [বন্দীদের এসব সন্তান যারা

১৩. সুনানু আবি দাউদ, কিতাব : আল-আকযিয়া, বাব : ইজতিহাদুর রায় ফিল কাযা, হাদীস নং-৩৫৯৪

১৪. উসূলে ফিক্হের কিতাব সমূহ।

www.pathagar.com

ছিল মূর্খ, কুশিক্ষিত] তারা যা হয়নি তার কিয়াস করলো যা ছিল তার ওপর, ফলে তারা নিজেরা গোমরা হয় এবং অন্যদেরকেও গোমরা করে।"[১৫]

কিন্তু এই হাদীসটির শব্দের মধ্যেই এর জবাব রয়ে গেছে। 'যুদ্ধ বন্দীদের সন্তান' বলতে বুঝানো হয়েছে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সত্য ও বাস্তব সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদেরকে। 'ইলমী, তাত্ত্বিক ও চিন্তা-গবেষণার জগতে তাদের কোনো দখল ও অবস্থান থাকে না। এসত্ত্বেও নিজেদের সংকীর্ণমনা ও পশ্চাতমুখিতার কারণে তারা নিজেদেরকে অসাধারণ যোগ্যতা ও মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করে।

প্রত্যেক জাতির অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে এ ধরনের অবস্থা পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে পতনশীল জাতির মধ্যে এর বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। তাদের মধ্যে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা-গবেষণা করার যোগ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই ধরনের লোকেরা যখন কিয়াস করতে থাকবে তখন তার ফল গোমরাহী ছাড়া আর কী হতে পারে।

সাহাবীগণের আমল

রসূলুল্লাহ স.-এর পর সাহাবীগণের কিয়াসের প্রমাণ এতো বেশী পাওয়া যায় যে, ফকীহগণ দাবী করেন, কিয়াসের স্বপক্ষে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাদের যুগে তামাদ্দুনিক জীবন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি বেশী প্রসারিত হয়নি তাই কিয়াস শুধু কার্যকর বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শুধু নতুন যে সমস্যা দেখা দিতো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার সমাধান বের করা হতো। যদি সেখানে তার সমাধান না পাওয়া যেতো এবং ইজমা'রও কোনো সম্ভাবনা দেখা না যেতো তাহলে ইজতিহাদ ও রায়ের মাধ্যমে তার ফায়সালা করা হতো।

কয়েকটি উদাহারণ নিচে দেয়া হলো :

আবূ বকর রা.কে কালালা (كلالة) (যে মৃত ব্যক্তির পিতা ও সন্তান কেউ জীবিত নেই)-এর উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে প্রসঙ্গে যে বিধান তিনি দিলেন তৎসম্পর্কে বললেন :

إني سأقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان

"আমি নিজের 'রায়' (অর্থাৎ কিয়াস) থেকে একথা বলছি। যদি এটা সঠিক হয় তাহলে হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর যদি ভুল হয় তাহলে তা আমার পক্ষ থেকে এবং শয়তানের পক্ষ থেকে (মনে করবে)।"[১৬]

---

১৫. সুনানু ইবনি মাজাহ, কিতাব : ইফাতিতাহুল কিতাবি ফিল ঈমানি ওয়া ফাযায়িলিস সাহাবাতি ওয়াল ইলম, বাব : ইজতিনাবুর রায় ওয়াল কিয়াস, হাদীস নং-৫৬

১৬. আস-সুনানুস সগীর, কিতাব : আল-ফারায়েয, বাব : ফিল কালালা, হাদীস নং-১৭৮০

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে উমর রা. দাদার উত্তরাধিকার সম্পর্কে যা ফায়সালা দিলেন তার সম্পর্কে বললেন :

أقضي فيه برأيي

"আমি নিজের রায়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে ফায়সালা করছি।"[১৭]

উসমান রা. একবার উমর রা.-কে বলেন :

إن اتبعت رأيك فرأيك أسد وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي

"যদি আপনি নিজের রায় মেনে চলেন তাহলে ঠিকই করেন। আবার যদি আপনার পূর্ববর্তীর রায় মেনে চলেন তাহলে তো আরো ভালো।"[১৮]

আলী রা. একটি বিষয়ে বলেন,

প্রথমে আমার ও উমরের রা. রায় এ ব্যাপারে একই ছিল। কিন্তু এখন আমি ভিন্নমত পোষণ করি।[১৯]

যে স্ত্রীলোককে তালাক গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল তার সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন :

"আমি নিজের মতের ভিত্তিতে ফতোয়া দিচ্ছি। যদি সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর ভুল হলে তা হবে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল দোষমুক্ত।"[২০]

এভাবে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা., যায়দ ইবন সাবিত রা. ও অন্যান্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীগণের রায় (কিয়াস)-এর অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। কাজেই এর পরে কিয়াসের বৈধতার প্রশ্নে আর কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। তাঁরা নিজেদের ছাত্রদেরকে উচ্চপদস্থ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী প্রশাসকদেরকে কিয়াস করার নির্দেশ দিতেন। যেমন উমর রা. কাযী শুরাইহকে কূফার কাযী নিযুক্ত করে বলেন :

"কোনো বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহে সুস্পষ্ট বিধান না পেলে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় তুমি ইজতিহাদের মাধ্যমে ফায়সালা করো।"[২১]

অনুরূপভাবে 'উমর রা. আবূ মূসা আশ'আরী রা. কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করার সময় যে ফরমান দিয়েছিলেন তাও কিয়াসের ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট :

---

১৭. মিনহাজুল উসূল
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. প্রাগুক্ত
২০. তারীখু তাশরী'ইল ইসলামী
২১. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

اعْرِفْ الأَشْبَاهَ وَالنَّظَائِرَ, ثُمَّ قِسْ الأُمُورَ بِرَأْيِكَ

"(যে সব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলোর) সদৃশ ফায়সালা ও নযীরের খোঁজ করো এবং তার প্রেক্ষিতে কিয়াস করে নিজের রায় স্থির করো।"[২২]

কিয়াস সম্পর্কে সাহাবীগণের সাবধান বাণী

আবূ বকর সিদ্দীক রা. একবার বলেন :

أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللهِ بِرَأْيِي

"যখন আমি আল্লাহ্র কিতাবের ব্যাপারে নিজের রায় অনুযায়ী কিছু বলবো তখন কোন্ আকাশ তার ছায়াতলে আমাকে রাখবে এবং কোন্ মৃত্তিকা আমাকে উঠাবে?।"[২৩]

উমর রা. বলেন :

إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ ; فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ الدِّينِ أَعْيَتْهُمْ السُّنَّةُ أَيْ لَمْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"'রায়'ওয়ালাদের খপ্পর থেকে তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও। তারা সুন্নতের শত্রু। হাদীসের সংরক্ষণে তারা ক্লান্ত। তাই তারা রায়ের ভিত্তিতে কথা বলে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদের পথভ্রষ্ট করে।"[২৪]

এই হাদীসে "হাদীস সংরক্ষিত রাখতে তারা অক্ষম বলে নিজেদের রায়ের ভিত্তিতে কথা বলে" অংশটি বিশেষ আলোচনা সাপেক্ষ। এর মাধ্যমে হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। আলী রা. বলেন :

لو كان الدين يؤخذ قياسا, لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره

"যদি কিয়াসের মাধ্যমে দীন অর্জিত হতো তাহলে মৌজার উপরের অংশের তুলনায় তার নিচের অংশে মাসেহ করা বেশী ভালো হতো।"[২৫]

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন :

يذهب قراؤكم وصلحاؤكم, ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيمون الأمور برأيهم

"তোমাদের উলামা ও সৎ ব্যক্তিরা বিদায় নেবে এবং লোকেরা মূর্খদেরকে নেতারূপে গ্রহণ করবে। তারা সব বিষয়ে নিজেদের রায়ের মাধ্যমে কিয়াস করবে।"[২৬]

---

২২. মিনহাজুল উসূল
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

উপরোক্ত মন্তব্যগুলোর সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, কিয়াসের অনুমতি একমাত্র তারাই লাভ করবে যারা যথার্থই এর যোগ্যতা রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে-সব বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে কিয়াস-এর প্রয়োজন অনুভূত হবে সেসব ক্ষেত্রেই কেবল কিয়াস চালাতে হবে। আর উমরের রা. বক্তব্য মতে 'সদৃশ ও নযীরের' (اشباه ونظائر)-এর ভিত্তিতে কিয়াস করা হবে। শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের শ্রমকাতরতা কিংবা ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের বশে কিয়াসের কৃত্রিম ক্ষেত্র তৈরী করা এবং কিয়াসের নিয়ম-কানুনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা- এসব অবস্থায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য হবে না।

কিয়াসের যোগ্যতার মাপকাঠি কী? এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে "ফকীহের গুণাবলী" শিরোনামে কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিয়াস সম্পর্কে ফকীহগণ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম-কানুন, সীমা-পরিসীমা সংক্রান্ত কিছু কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

কিয়াস মূলত 'ইল্লাত নির্ভর

ফকীহগণের পরিভাষায় মূল নির্দেশকে (পূর্বতন ফায়সালা ও নযীর) "মাকীস আলাইহি" (অর্থাৎ যার ওপর কিয়াস করা হয়) এবং সমাধানযোগ্য নতুন সমস্যাকে 'মাকীস' (অর্থাৎ যাকে কিয়াস করা হয়) বলা হয়। এদের উভয়ের মধ্যে যে একই জিনিসটি থাকে অর্থাৎ যে কারণে মূলের হুকুমটিকে অ-মূলের (নতুন সমস্যা) ওপর প্রয়োগ করা হয়, সেটিকেই 'ইল্লাত নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এজন্য কিয়াসে 'ইল্লাতের ওপরই সব কিছু নির্ভর করে এবং তাকে ঘিরেই সমস্ত আলোচনা আবর্তিত হতে থাকে।

কিন্তু 'ইল্লাতের আলোচনা এত বেশী জটিল ও মতবিরোধে পরিপূর্ণ যে, এর মধ্য থেকে প্রাধ্যন্য লাভকারী ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য বের করা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। এক্ষেত্রে যথার্থ বলতে গেলে, কিয়াস ও রায়ই যেখানে ফায়সালার চূড়ান্ত ভিত্তি সেখানে মতবিরোধের জটিলতা মুক্ত হওয়া কেমন করে সম্ভব?

কোনো বক্তব্যকে প্রাধ্যন্য দেবার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দানকারীর চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনধারা বিরাট ভূমিকা পালন করে। একই সাথে অবস্থা ও চাহিদার প্রয়োজনও প্রভাব বিস্তার করে। কারণ মূর্ত ও বিমূর্ত পরিবেশ থেকে তো দুনিয়ার কোনো জিনিসই সংরক্ষিত থাকে না। এহেন অবস্থায় কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, এক যুগের অগ্রগণ্য অবস্থাসমূহ প্রত্যেক যুগেই একই পর্যায় তার অগ্রগণ্য মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবে? অথবা এক ব্যক্তি যে অবস্থাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সকল ব্যক্তির কাছে তা-ই প্রাধান্যের স্বীকৃতি লাভ করবে? কিন্তু ফকীহগণের বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য থেকে অর্জিত সবচেয়ে বড় যে ফায়দাটা

www.pathagar.com

হচ্ছে, একরকম আগাম তৈরী করা জমি পাওয়ার মতো। এখন অবস্থা ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অগ্রগণ্য অবস্থা বের করা এবং নতুন চারা ও পত্র-পল্লবে তাকে ভরিয়ে দেওয়াটা মিল্লাতের নিজস্ব যোগ্যতা এবং যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে।

ফকীহগণ বিধান-উদ্ভাবনের চারটি চাবি-কাঠির কথা বলেছেন :[২৭]

১. 'ইল্লাত (علة), ২. কারণ (سبب), ৩. শর্ত (شرط) এবং ৪. আলামত (علامة)। এগুলোর প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নরূপ :

(এক) 'ইল্লাত (علة) : আভিধানিক অর্থে 'ইল্লাত হচ্ছে এমন কোনো আনুসঙ্গিক অবস্থা (عارض) যা বস্তুর (محل) মধ্যে (وصف) গুণগত পরিবর্তন সৃষ্টি করে। যেমন: রোগ একটি আনুসঙ্গিক, সাময়িক অবস্থা যা মানুষের স্বাস্থ্যের মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং এ জন্য তাকে 'ইল্লাত বলে। ফকীহগণের পরিভাষায় যে عارض-এর উপস্থিতিকালে হুকুম বা বিধানের স্থিতি হয় তাকে 'ইল্লাত বলে।

ফকীহদের ভাষায় এর সংজ্ঞা হচ্ছে :

هِيَ (مَا) أَيْ وَصْفٌ (شُرِعَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِهِ لَا بِهِ

"যার অস্তিত্বের কালে (কারণে নয়) হুকুমের বিধান (সেই হচ্ছে 'ইল্লাত)।"[২৮]

এর দ্বিতীয় সংজ্ঞা হচ্ছে :

ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء

"যার সাথে সরাসরি হুকুম নির্ধারণ সম্পর্কিত করা যায় (তাকেই বলে 'ইল্লাত)।"[২৯]

"কারণ"-এর দিকেও হুকুম সম্পর্কিত হয়। কিন্তু তা হয় 'ইল্লাতের মাধ্যমেই। তবে হুকুমের প্রমাণ ও নির্ধারণের সম্পর্ক শুধুমাত্র 'ইল্লাতের দিকেই করা হয়। আর যদি কখনো 'কারণ'-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো অবশ্য 'ইল্লাতের পর্যায়ভুক্ত হয়।

(দুই) কারণ (سبب), 'আরবীতে 'সাবাব' বা কারণের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, এমন রাস্তা বা পদ্ধতি যা গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

"আর আমি তাকে (ذوالقرنين-কে) সব রকমের সাজ সরঞ্জাম দিয়েছিলাম।"[৩০]

---

২৭. উসূলে ফিক্‌হের যে কোনো গ্রন্থ দেখুন।

২৮. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, পৃ. ১৪১

২৯. কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২২৬

৩০. সূরা আল-কাহফ : ৮৪

www.pathagar.com

অর্থাৎ এমনসব কিছু দান করেছিলাম যা তাকে শাসন কর্তৃত্বের (গন্তব্যে) পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।[৩১]

ফিক্‌হের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হচ্ছে :

ما يكون طريقا الى الحكم

"যে পথে হুকুমে পৌঁছানো যায় তাকে সাবাব বলা হয়।"[৩২]

উল্লেখ্য, (ক) পথ এবং (খ) পথ চলা, এ দু'টি আলাদা ব্যাপার।

পথ হচ্ছে কারণ (سبب); পথ চলা হচ্ছে 'ইল্লাত (علة)। গন্তব্যে পৌঁছে যাবার সম্পর্ক হচ্ছে চলার সাথে, সরাসরি পথের সাথে নয় বরং পথ চলার মাধ্যমে। এই হচ্ছে 'ইল্লাত আর কারণ এর পার্থক্য। একটি উদাহরণ দেয়া যাক : ধরুন, কুয়া থেকে পানি তুলতে হবে, তার জন্য দরকার কুয়া, বালতি আর রশিগুলো হচ্ছে سبب কিন্তু পানি উঠানোর সম্পর্ক হবে মানুষের কাজের ('ইল্লাত) সাথে, রশি-বালতির (سبب) সাথে নয়, বরং মানুষের কাজের ('ইল্লাত) মাধ্যমে। তাই ফিক্‌হবিদগণ বলেন :

كل ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمى سببا له شرعا ويسمى الواسطة علة

"কোনো মাধ্যমের সহায়তায় হুকুম পর্যন্ত পৌঁছার যে পথ তা হচ্ছে সাবাব এবং মাধ্যমটিই 'ইল্লাত।"[৩৩]

(তিন) শর্ত (شرط) : আভিধানিক অর্থে শর্ত এমন একটি অবস্থা যার ওপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে হুকুমের অস্তিত্ব যার ওপর নির্ভরশীল হয় তাকে ফিক্‌হের পরিভাষায় বলা হয় শর্ত।

ما يضاف الحكم اليه وجودا عنده

"শর্ত এমন একটি বস্তু যার অস্তিত্বের সাথে হুকুমের অস্তিত্ব সম্পর্কিত হয়।"[৩৪]

হুকুমের অস্তিত্ব (বাস্তবে বিদ্যমান থাকা) এবং হুকুমের অপরিহার্যতা (প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া) দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। শর্তের ওপর অস্তিত্ব নির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে 'ইল্লাতের ওপর নির্ভরশীল হয় অপরিহার্যতা। এই তিনটি জিনিসের মাঝে হুকুমের সম্পর্ককে ফকীহগণ নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

ফকীহদের একটি মন্তব্য এই :

الحكم يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطه

"হুকুম তার সাবাব-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়, 'ইল্লাতের মাধ্যমে হুকুম প্রমাণিত হয় এবং শর্তের অস্তিত্বের সাথে হুকুম স্থিত হয়।"[৩৫]

---

৩১. কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২৬২
৩২. হুসামী, পৃ. ১২৯
৩৩. উসূলুশ্ শাশী, পৃ. ৯৬
৩৪. কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২৭৪
৩৫. উসূলুশ শাশী, পৃ. ৯৬

www.pathagar.com

(চার) আলামত (علامة) : আলামত মানে নিশান। যেমন মিনার হলো মসজিদের নিশান। ফিক্‌হের পরিভাষায় হুকুমের অস্তিত্বের সন্ধান প্রদানকারী জিনিসকে 'আলামত বলা হয়। ফকীহদের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

هِيَ مَا يُعْرَفُ وُجُودُ الْحُكْمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ وُجُودُهُ وَلَا وُجُوبُهُ

"যে জিনিসটি হুকুমের অস্তিত্বের সন্ধান দেয় কিন্তু হুকুমের স্থিতি ও প্রমাণের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না।"[৩৬]

কারণ ও আলামতের উপর হুকুমের অস্তিত্ব ও অপরিহার্যতা নির্ভরশীল নয়। এ ব্যাপারে উভয়ের অবস্থান সমান। কারণ হচ্ছে হুকুম পর্যন্ত পৌঁছার পথ ও পদ্ধতি এবং আলামত শুধুমাত্র আলামতের কাজ দেয়। তবে শর্ত ও 'ইল্লাতের মধ্যে পার্থক্য আছে। শর্তের সাহায্য হুকুম অস্তিত্ব লাভ করে এবং 'ইল্লাতের সাহায্যে তার প্রমাণ (ওয়াজিব) হওয়া বা অপরিহার্যতা উপস্থাপিত হয়।

প্রতিটি নস্‌ 'ইল্লাত বিশিষ্ট

প্রত্যেকটি হুকুম (নস) 'ইল্লাত বিশিষ্ট (অর্থাৎ প্রত্যেক হুকুমে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো 'ইল্লাত আছে) কিনা এ প্রশ্নটি ফকীহগণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষক ফকীহগণের মতে প্রতিটি হুকুম 'ইল্লাত বিশিষ্ট। অবশ্য এটা আলাদা কথা, কোনো হুকুমের বাস্তব প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের কারণে তার 'ইল্লাত অন্যের কাছে স্থানান্তরিত হয় না এবং সংশ্লিষ্ট 'ইল্লাতের ভিত্তিতে তার ওপর মাসায়েল কিয়াস করাও যেতে পারে না। আসলে সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের কল্যাণ হামেশা বৃদ্ধি এবং তার অকল্যাণ ও অনিষ্ট নির্মূল হওয়াটাই আল্লাহ্‌র হিকমতের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এটি দুই ভাবে কার্যকর হতে পারে :

১. এমন নিয়ম-কানুন রচনা করা যার মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করা যায়।
২. এমন সীমারেখা নির্ধারণ ও নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা যার সাহায্যে অনিষ্ট ও অকল্যাণ নির্মূল করা যায়।

এছাড়াও কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে তাকীদ করে যেতে হবে।

এই কৌশলগত পদ্ধতিকে কার্যকর করার জন্য মহান আল্লাহ শুরু থেকেই নিজের রসূল পাঠিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে মূলনীতি, শৃংখলা ও নিয়ম-কানুন সমন্বিত জীবন বিধান ও শাসনতন্ত্র দান করেছেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জীবন যাপন করলে আল্লাহ্‌র কৌশল অনুযায়ী মুনাফা অর্জিত ও অনিষ্টের মূলোৎপাটন হতে থাকবে। একথা সত্য, হুকুম-আহকাম মেনে চলা কৌশলের

---

৩৬. কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২৭৯

www.pathagar.com

(কল্যাণগত) ওপর নির্ভরশীল নয়। কারণ মানবিক বুদ্ধি-জ্ঞান সীমিত ও পারস্পরিক পার্থক্যের অধিকারী। তার ওপর নফসানী খাহেশ, স্বাধীনতা ও বন্ধনহীনতার তো কোনো সীমাই নেই। এহেন অবস্থায় কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কৌশল পুরোপুরি অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী কাজ করবে। তাই মানবিক দায়িত্বের সীমার মধ্যে এ জিনিসটি রাখা হয়নি।

কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যেতে পারে না যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষকে সম্মুখবর্তী ও কৌশলকে বাস্তবায়িত করার জন্য এইসব কল্যাণমূলক ও প্রয়োজনের বিষয় সম্পর্কে জানা এক পর্যায় পর্যন্ত অপরিহার্য ছিল। অবশ্য এটি আলাদা প্রশ্ন যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও কৌশল গুপ্ত ও সংগোপন থাকার কারণে এই জানার ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। একথা সুস্পষ্ট, প্রত্যেকটি হুকুমের অন্তঃস্থিত কল্যাণ ও প্রয়োজনের সন্ধান পাওয়া এবং তার অনিষ্ট দূর করার পথ অনুসন্ধান করে আল্লাহ্‌র কৌশলের সাথে উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন কাজ। এই সঙ্কট দূর করার জন্য এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয় যা এই সব কল্যাণ ও প্রয়োজনের জন্য অপরিহার্য এবং এর সুগভীর অন্তঃস্থলে পৌঁছার এমন সহজ মাধ্যম হবে। এর ফলে বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা এই কল্যাণ ও প্রয়োজনগুলো অনুধাবন করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করে নিজেকে অনিষ্টমুক্ত করে লাভবান হতে পারবে। ফিক্‌হের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'ইল্লাত। এখান থেকেই হিকমত তথা কৌশল ও 'ইল্লাতের পার্থক্য ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে হবে।

হিকমত ও 'ইল্লাতের পার্থক্য

১. হিকমত এমন একটি কল্যাণকর বিষয় যা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। হিকমত প্রচ্ছন্ন ব্যাপার, তাই একে চিহ্নিত করা কঠিন। কিন্তু নীতি, সীমারেখা, শর্তাবলী ইত্যাদি হিকমতের পথনির্দেশ করে। বরং এগুলো হিকমত উপলব্ধি করার মাধ্যমে পরিণত হয়।

২. অন্যদিকে মূলনীতি ও সীমারেখার কল্যাণকর পথনির্দেশ থেকে 'ইল্লাতের সন্ধান পাওয়া যায় এবং কল্যাণের সাথে 'ইল্লাতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। 'ইল্লাত এমন একটি একক যার মধ্যে রয়েছে বহুর অস্তিত্ব। এর বুদ্ধিসম্মত হওয়াটা অপরিহার্য।

এভাবে এটি হুকুমের ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই সাথে মানবিক ক্রিয়াকর্মের বিধান অবগত হয়ে লক্ষ্যকে সম্মুখবর্তী করা সম্ভব হবে। যেমন আরবী ব্যাকরণের একটি নিয়ম হচ্ছে, "কর্তার ওপর পেশ হবে এবং

www.pathagar.com

কর্মের ওপর বসে যবর"। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এ নিয়ম অবগত থাকবে সে কর্তার ওপর পেশ বসাবে এবং কর্মের ওপর যবর বসাবে। 'ইল্লাতের অবস্থাও এই ধরনের মনে করা উচিত। যে ব্যক্তি 'ইল্লাত সম্পর্কে অবগত থাকবে তার যখনই কোথাও মানবিক কাজকর্মের হুকুম জানার প্রয়োজন হবে তখনই এর মাধ্যমে তা জেনে নিয়ে সে গন্তব্য ও লক্ষ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে পারবে।

হিকমতকে 'ইল্লাত গণ্য করা হয় না

প্রচ্ছন্নতার কারণে হিকমত সাধারণত মানববুদ্ধির অগম্য। এ কারণে হিকমত কিয়াসের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে না। ফকীহগণ বলেন :

لا يصلح القياس لوجود المصلحة ، ولكن لوجود علة مضبوطة أدير عليها الحكم

"মাস্‌লিহাতের (কল্যাণ ও প্রয়োজন) ভিত্তিতে কিয়াস করা সঙ্গত নয়। বরং মজবুত 'ইল্লাতের ভিত্তিতে কিয়াস করতে হবে। আর 'ইল্লাত-কে কেন্দ্র করেই হুকুম আবর্তিত হবে"।[৩৭]

হিকমতের (মাস্‌লিহাত) ভিত্তিতে কিয়াস কোনো কোনো আহকামের ক্ষেত্রে বড়ই জটিলতার সৃষ্টি করবে, কোনো কোনোটার মধ্যে বৈপরীত্যের আশঙ্কা রয়েছে। যেমন সফরে নামাযে কসর (قصر)-এর হুকুম চার রাকাত ফরয-এর পরিবর্তে দুই রাকাত পড়া এবং সফরে রমযানের রোযা না রাখার (افطار) অনুমতি- উভয়ের 'ইল্লাত হচ্ছে সফর। উভয় ক্ষেত্রে হিকমত (মাস্‌লিহাত) হচ্ছে মানবের কিঞ্চিৎ পরিশ্রম ও কষ্ট লাঘব। কিন্তু এই পরিশ্রম ও কষ্ট তাদেরও হয় যারা স্বস্থানে অবস্থান করে রোযা রাখা অবস্থায় পরিশ্রমের কাজ করে। যেমন করে শ্রমিক, মজুর, কর্মকার ইত্যাদি পেশাজীবি লোকেরা। তাই হিকমতকে 'ইল্লাতে পরিণত করলে এই ধরনের মেহনতী লোকদেরকেও মুসাফিরদেরকে প্রদত্ত সুবিধা অর্থাৎ নামাযে কসর এবং রমযানের রোযা না রাখার অনুমতি দিতে হবে কষ্ট লাঘব করার মাস্‌লিহাতের ভিত্তিতে। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত 'ইল্লাতকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলে এই জটিলতা দেখা দেয় না।

অথবা যেমন আল্লাহ্‌র আহ্‌কামের একটি হিকমত (মাস্‌লিহাত) হচ্ছে মানবের জীবন রক্ষা। যদি এই হিকমতকে সব ক্ষেত্রে 'ইল্লাতে পরিণত করা হয় তাহলে জিহাদ ফরয করার কোনো মানে হয় না। কারণ জিহাদে প্রাণনাশ হয়। কিন্তু জিহাদেও প্রাণের হিফাযত হয়। অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদে কতিপয় লোকের প্রাণের বদলে একটি সমাজ বা একটি জাতির সমগ্র জনসমষ্টির জীবন রক্ষা করা যায়। কবি বলেছেন :

---

৩৭. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ১২৯

www.pathagar.com

"কখনো প্রাণ আবার
কখনো প্রাণ সম্পূর্ণই জীবন"

বুদ্ধির সাথে 'ইল্লাতের সম্পর্ক

'ইল্লাত অবশ্যই মানবের সুস্থ বুদ্ধি (عقل سليم)-র পরিধিতে থাকতে হবে, যদি অবোধগম্য হয় তাহলে বিধান উদ্ভাবন সম্ভব হবে না। ফকীহ্‌দের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

> ويجب أن تكون علة الحكم صفة يعرفها الجمهور ولا تخفى عليهم حقيقتها ولا وجودها من عدمها
>
> "ইল্লাত হুকুমের এমন একটি বৈশিষ্ট্য (صفة) হতে হবে যাকে অধিকাংশ লোক জানতে পারবে। তার প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকবে না এবং তার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যেও প্রচ্ছন্নতা থাকবে না।"[৩৮]

কী কী জিনিস 'ইল্লাত হয়

'মাস্‌লাহাত' অর্জনের শক্তিশালী ধারণা সৃষ্টি করাই 'ইল্লাতের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য সাধারণ পর্যায়ে তা পাওয়া যেতে হবে। এটা কয়েকভাবে পাওয়া যেতে পারে :

১. সে মাধ্যম হতে পারে,
২. পন্থা ও পদ্ধতি হতে পারে,
৩. মাস্‌লিহাতের সাথে তার সংযোগ হতে পারে,
৪. তার অনিবার্য প্রয়োজনে পরিণত হতে পারে।

যেমন, মদ পান করলে অনেক রকম অনিষ্টকারিতা দেখা দেয় এবং ক্ষতি হয়। এ হচ্ছে মদ নিষিদ্ধ হবার 'ইল্লাত। যেহেতু সাধারণভাবে মদ পান করলে এসব অনিষ্টকারিতা অনিবার্য হয়ে ওঠে, আর এই অনিষ্টকারিতাগুলো নির্মূল করাই শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য তাই তিনি সকল প্রকার মাদক সেবন নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।[৩৯]

একথাও সুস্পষ্ট করে বলা যায়, যখন মাধ্যম ও পদ্ধতি অথবা কয়েকটি এমন পর্যায়ের অনিবার্যতা পাওয়া যায়, যা কারণ ও 'ইল্লাতে পরিণত হতে পারে তখন তাকেই 'ইল্লাতে পরিণত করবো। যাকে প্রাধান্য দেবার যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকবে। যেমন তা অন্যান্য মাধ্যম ও অনিবার্যতার মোকাবেলায় বেশী সুস্পষ্ট ও বেশী মজবুত হবে অথবা অনিবার্যতার মোকাবেলায় বেশী শক্তিশালী হবে (আত্মপ্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ ও অনিবার্যতার দিকনির্দেশনা থেকে প্রাধান্য দানের কারণ জানা যাবে)। যেমন নামাযে কসর ও রোযা না রাখার ক্ষেত্রে রোগ ও সফরকে 'ইল্লাত গণ্য করা হয়েছে। অথচ শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি অন্যান্য জিনিসও 'ইল্লাত হতে পারতো। কিন্তু

---

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৩৯. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

গরম ও ঠাণ্ডার সীমা নির্দেশ করা কঠিন। অন্যদিকে সফর ও রোগের ক্ষেত্রে বেশী সন্দেহ-সংশয় ছিল না এবং এর সীমা নির্দেশও কঠিন ছিল না। একারণে এ দু'টি 'ইল্লাত গণ্য হয়েছে এবং আগের দু'টি 'ইল্লাত হতে পারেনি।

'ইল্লাতের কাঠামো

'ইল্লাতের কাঠামোতে কখনো মানুষের অবস্থার দিকে নজর দেয়া হয় এবং তার সাথে যে জিনিসের ওপর মানুষের কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তার প্রতি নজর দেয়া হয়।

(এক) যে 'ইল্লাতের কাঠামোতে মানুষের অবস্থার দিকে নজর দেয়া হয় সে অবস্থা হবে মানুষের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। যেমন عقل (সুস্থবুদ্ধি) এবং بلوغ (প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া) (صفة) ; এ দু'টো মানুষের সাথে বরাবর যুক্ত থাকে। অন্যপক্ষে وقت আসে আর যায়। এই তিনটি সমন্বিতভাবে 'ইল্লাত হয় সালাত ওয়াজিব হওয়ার হুকুমের। ফিক্‌হের ভাষায় বলা হয় :

من ادرك وقت صلوة وهو عاقل بالغ وجب عليه ان يصليها

> "যে ব্যক্তি সুস্থবুদ্ধি ও সাবালক অবস্থায় নামাযের সময় পেয়েছে তার জন্য নামায পড়া ওয়াজিব।"

এক্ষেত্রে নামায ওয়াজিব হওয়ার বিধানের 'ইল্লাত হচ্ছে عقل + بلوغ + وقت .
এক্ষেত্রে সাওম ওয়াজিব সংক্রান্ত হুকুমের সমন্বিত 'ইল্লাত হচ্ছে :

ومن شهد الشهر وهو عاقل بالغ مطيق وجب عليه ان يصومه

> "যে ব্যক্তি সুস্থবুদ্ধি ও সাবালক অবস্থায় রমযানের মাস পেয়েছে এবং সে রোযা রাখার শক্তি রাখে, তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব।"

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার 'ইল্লাত হচ্ছে :

ومن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب ان يزكيه

> "যে ব্যক্তি নিসাব (যে সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পদ মালিকানায় থাকলে যাকাত ফরয হয়)-এর মালিক হয়েছে এবং তার নিসাবের মালিকানার একটি বছর গত হয়েছে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব।"

এই তিনটি অবস্থায় অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য গুণ হচ্ছে, সুস্থ বুদ্ধি ও সাবালকত্ব। আর অস্তিত্বশীল কাঠামো নামাযের বেলায় সময়, রোযার বেলায় মাস এবং যাকাতের বেলায় নিসাবের মালিক হওয়া। এই সবগুলো মিলে যে অবস্থা গঠিত হয়েছে সেটিই 'ইল্লাত হিসেবে গণ্য হয়েছে। কাজেই নামাযের 'ইল্লাত সময় পাওয়া, রোযার 'ইল্লাত রমযান মাস এসে যাওয়া এবং যাকাতের 'ইল্লাত নিসাবের মালিকানা। এ তিনটি 'কার্যকারণ' নামেও খ্যাত। কখনো এমনও হয়, শরীয়ত প্রণেতা কোনো ফায়দার প্রেক্ষিতে কোনো গুণের প্রভাব কমিয়ে দেন।

www.pathagar.com

যেমন যে ব্যক্তি নিসাবের মালিক হয় এবং এখন তার ওপর দিয়ে এক বছর কাল অতিক্রম করেনি সে যদি আগাম যাকাত আদায় করতে চায় তাহলে আদায় করতে পারে। যাকাতের বছর অতিক্রম করা হচ্ছে শর্ত। কিন্তু সে অবস্থায় ফায়দার প্রেক্ষিত শর্তের প্রভাব কমিয়ে দেয়।

এ ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হবার 'ইল্লাত হচ্ছে নিসাবের মালিকানা; আর حولان حول (অর্থাৎ পূর্ণ একবছর যাবৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকানায় থাকা হচ্ছে شرط (শর্ত); শর্ত পূর্ণ না হলে আদায় করা ওয়াজিব হবে না। তবে নিসাবের মালিক ইচ্ছা করলে আগাম আদায় করতে পারে।

'ইল্লাত যেক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য (صفة لازمة), তার কয়েকটি উদাহরণ ফকীহদের ভাষায় এইরূপ :

يحرم شرب الخمر

"মদ পান হারাম।"

يحرم اكل الخنزير

"শূয়োর খাওয়া হারাম"

يحرم اكل كل ذى ناب من السباع

"প্রত্যেক ধারালো দাঁতের অধিকারী হিংস্র প্রাণী খাওয়া হারাম"

يحرم كل ذى مخلب من الطير

"প্রত্যেক নখ (যা দিয়ে শিকার ধরে) বিশিষ্ট পাখি হারাম"

يحرم نكاح الامهات

"মায়েদেরকে বিয়ে করা হারাম"

এই উদাহরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে, যে বৈশিষ্ট্যেরকারণে হারাম হওয়ার বিধান দেয়া হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট পশু/পাখি/মানুষ হতে কোনো দিন বিচ্ছিন্ন হয় না।

এবারে নিম্নের উদাহরণগুলো দেখুন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"পুরুষ চোর ও মেয়ে চোর উভয়ের হাত কেটে দাও।"[৪০]

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

"যিনাকারী মেয়ে ও পুরুষের প্রত্যেককে একশো বার করে চাবুক মারো।"[৪১]

এই দৃষ্টান্তগুলোতে দণ্ডবিধানের ইল্লাত হচ্ছে চুরি ও যিনা; যা দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদের অবিচ্ছেদ্য বা সার্বক্ষণিক বৈশিষ্ট্য নয় বরং সাময়িক ব্যাপার। কখনো দু'টো

---

৪০. সূরা আল-মায়িদা : ৩৮

৪১. সূরা আন-নূর : ২

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে 'ইল্লাত হয়ে থাকে। নিম্নের উদাহরণগুলোতে ফকীহদের ভাষায় যে বিধান দেয়া হয়েছে তা দেখুন :

يجب رجم الزاني المحصن

"বিবাহিত যিনাকারীকে রাজম (পাথর মেরে হত্যা করা) করা ওয়াজিব।"

এক্ষেত্রে যিনা (زنا) এবং বিবাহ (احصان) মিলে 'ইল্লত গঠিত হয়েছে, যার ভিত্তিতে রাজমের বিধান।

يجب جلد زاني غير محصن

"অবিবাহিত যিনাকরীকে চাবুক মারা ওয়াজিব।"

يحرم الذهب والحرير على رجال الامة دون نسائها

"সোনা ও রেশম উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম, মেয়েদের জন্য নয়।"

এক্ষেত্রে দু'টো বস্তুর একই বৈশিষ্ট্যেরইঙ্গিত রয়েছে যার জন্য হারাম হওয়ার বিধান পুরুষের জন্যে দেওয়া হচ্ছে, মেয়েদের জন্য নয়, কারণ তাদের আল্লাহ প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন।

হিকমত ও 'ইল্লাত কীভাবে জানা যায়

গভীর গবেষণা ও পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হিকমত ও 'ইল্লাতের সন্ধান পাওয়া যায়। হিকমতের ব্যাপারটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তায় কাজ চলে না। এই সাথে আল্লাহ প্রদত্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং নবুওয়াতের প্রকৃতি অনুধাবনেরও প্রয়োজন হয়।

একজন উচ্চপর্যায়ের সফল চিকিৎসকের বুদ্ধিমান সহকারী দীর্ঘকাল চিকিৎসকের সাহচর্যে থাকার পর তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন রোগে যেসব ওষুধ ব্যবহার প্রয়োজন সেগুলোর বৈশিষ্ট্য গুণাবলী ও কার্যকারিতা জানতে পারেন। ঠিক তেমনি সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন তাঁরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্যে থেকে আল্লাহ ও রসূলের বিধানের উদ্দেশ্য ও হিকমত অবগত হয়েছিলেন। তারা শরীয়ত বিধানের স্থান-কাল-পাত্র দেখেছিলেন। বিধানগুলোর মূলনীতি অনুধাবন করেছিলেন। উপরন্তু যে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াতের জ্যোতির উৎস তাঁর মা'রিফাতও সাহাবাগণ রা. অর্জন করেছিলেন। তাই দীনের জ্ঞান ও তাৎপর্য অনুধাবন করার ব্যাপারে তাঁদের মর্যাদা ছিল সবার ওপরে। এ প্রসঙ্গে উমরের রা.-এ উক্তি যথার্থ ছিল :

وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ

"তিনটি বিষয়ে আমি আমার রবের সাথে মতৈক্যে উপনীত হয়েছিলাম।"[৪২]

---

৪২. সহীহুল বুখারী, আবওয়াব : আল-কিবলাহ, বাব : মা জাআ ফিল কিবলাহ, হাদীস নং-৩৯৩

www.pathagar.com

মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে, বদরের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচণের ব্যাপারে এবং বিবিগণের রা. প্রতি রসূলুল্লাহ্ স.-এর অসন্তোষ্টির এক উপলক্ষ্যে উমর রা. যা মন্তব্য করেছিলেন, পরবর্তীতে ঠিক তদ্রূপ ওহী নাযিল হয়েছিল, এই তিনটি বিষয়ে আল্লাহ্ উমর রা.-কে সমর্থন করেছিলেন বলে তিনি গর্ববোধ করতেন।

আয়েশা সিদ্দিকার রা. উক্তিও এ প্রসঙ্গে যথার্থ ছিল :

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"কতিপয় মেয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে রসূলুল্লাহ্ স. যদি তা দেখবার জন্য বেঁচে থাকতেন তাহলে তাদের মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিতেন যেমন বনী ইসরাঈলের মেয়েদের মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।"[৪৩]

এ থেকে বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ্ স.-এর দীর্ঘ সাহচর্যের ফলে সাহাবাগণ রা. দীনের রূহ (Sprit) আঁচ করতে সক্ষম ছিলেন।

সাহাবায়ে কিরামের পর যারা তাদের জীবনের সাথে বেশী সম্পর্ক সৃষ্টি এবং তাঁদের বেশী নৈকট্যলাভ করেছিলেন স্বাভাবিকভাবে সেই অনুপাতে তাঁরা অর্থাৎ তাবেঈগণ দীনের হিকমতের সাথে সম্পৃক্ত হবেন। অনুরূপ কথা বলা যায় তাবে তাবেঈগণের ব্যাপারে।

কুরআনে বর্ণিত হিকমত

কুরআন মাজীদে কোথাও কোথাও সুস্পষ্টভাবে হিকমতের কথা আলোচিত হয়েছে। যেমন :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"হে জ্ঞানবানগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যেই রয়েছে জীবন।"[৪৪]

প্রাণের বদলে প্রাণ নেয়াকে কিসাস বলে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থায় সমষ্টির জীবন রক্ষার হিকমত। এমনিভাবে রমযানুল মুবারকের রোযা সম্পর্কিত একটি বিধানের আওতায় (রাতে স্ত্রী সঙ্গমের অনুমতি দেয়ার হিকমত সম্পর্কে) বলা হয়েছে :

عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

"আল্লাহ্ জেনে নিয়েছেন, তোমরা (তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ) নিজেদের নফসের ব্যাপারে খেয়ানত করছিলে (অবৈধভাবে স্ত্রী সঙ্গমের গোনাহ্‌তে লিপ্ত হচ্ছিলে)"।[৪৫]

---

৪৩. সহীহুল বুখারী, কিতাব : সিফাতুস সলাত, বাব : ইনতিযারুন নাসি কিয়ামিল ইমামিল আলিম, হাদীস নং-৮৩১

৪৪. সূরা আল-বাকারা : ১৭৯

৪৫. সূরা আল-বাকারা : ১৮৭

www.pathagar.com

মানবের প্রকৃতিগত দুর্বলতার দরুন গোনাহ্ থেকে তাকে রক্ষা করার রহমানুর রহীমের ইচ্ছাই হচ্ছে রমযান মাসের রাতে স্ত্রী সঙ্গমকে হালাল ঘোষণার হিকমত।

ভ্রাতৃত্ববোধ ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"আর যদি তারা ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের সাহায্য কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে যে সম্প্রদায়ের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ আছো তাদের বিরুদ্ধে (সাহায্য) নয়। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদি তোমরা তা না কর তবে দেশে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মু'মিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।"[৪৬]

আবহমানকাল থেকে কুফর বনাম আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চরম অনর্থের উৎস হয়ে রয়েছে। তাই জিহাদের বিধান এবং এই বিধানের 'ইল্লাত হচ্ছে ফিতনা।

ফিতনা ও মহাবিপর্যয়ের উৎসমুখ কোথায়, তা অবশ্য চিন্তা করতে হবে। তাদের স্রোত কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং কোথায় গিয়ে পড়ছে, তাও ভেবে দেখতে হবে। তারপর দেখতে হবে মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা কেমনতর হিংস্রতার প্রদর্শনী করতে থাকে। যার পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ধর্ম, বুদ্ধিবৃত্তি, অর্থ-সম্পদ, বংশ, আত্মা সব কিছুর মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্র হিকমত হচ্ছে, এদের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এর ফলে মানবতা প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে পারবে। এই সাথে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব ও খেলাফতে ইলাহিয়ার অধিকারী হবার জন্য মানুষের যেসব মৌলিক গুণের প্রয়োজন সেগুলোর অনুশীলন হবে।

এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ

"তোমরা তাদের সাথে জিহাদ করো যে পর্যন্ত না ফিতনা ও ফাসাদ নির্মূল হয়ে যায় এবং (ফায়সালা যে পর্যন্ত না) একমাত্র আল্লাহ্র জন্য (তাঁর আহকামের আওতায়) নির্ধারিত হয়ে যায়।"[৪৭]

---

৪৬. সূরা আল-আনফাল : ৭২-৭৪

৪৭. সূরা আল-বাকারা : ১৯৩

www.pathagar.com

এই আয়াতেও জিহাদকে ফিতনা ও ফাসাদ নির্মূল করা তথা আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দেশ করা হয়েছে। জিহাদের চূড়ান্ত রূপ লড়াই ও প্রাণনাশ। তাও কবূল করতে হবে মানবের বৃহত্তর স্বার্থে, নয়তো দুনিয়া অশান্তি, জুলুম ও বিপর্যয়ের জাহান্নামে পরিণত হবে। এই ফিতনা সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"আর ফিতনা হত্যার চাইতেও মারাত্মক।"[৪৮]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে জিহাদের 'ইল্লাত এবং হিকতম বর্ণিত হয়েছে।

কুরবানী সম্পর্কে বলা হয়েছে :

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

"কুরবানীর পশুগুলোর গোশত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না এবং ওদের রক্তও না, তবে তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।"[৪৯]

অর্থাৎ হিকমতে ইলাহী হচ্ছে কুরবানীর মাধ্যমে বান্দাকে তাকওয়ার অনুশীলন করানো, প্রয়োজনে চরম কুরবানীর জন্য বান্দাকে প্রস্তুত করে নেয়া।

এছাড়াও কুরআন মাজীদে সুস্পষ্ট ভাবে (صراحة) এবং ইশারা-ইঙ্গিতে (كناية) বহু আহকামের হিকমতের কথা বলা হয়েছে। বরং কুরআন পুরোপুরি 'হিকমত'। আফসোস, যদি এই দৃষ্টিতে কুরআন মাজীদ পড়া ও পড়ানো হতো! বিভিন্ন কুরআনী আইনের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাঁর দু'টি গুণের [আলীম (عليم)-সর্বজ্ঞানী ও হাকীম (حكيم) প্রজ্ঞা সম্পন্ন] কথা উল্লেখ করেন অনেক ক্ষেত্রে; যুক্ত বা বিযুক্তভাবে। এথেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'ইলম ও হিকমত ছাড়া আইনের গিট খোলা (حل) এবং আঁটা (عقد) যায় না, اهل الحل والعقد হওয়া যায় না।

সুন্নাতে হিকমতের উল্লেখ

রসূলুল্লাহ স.-এর 'সুন্নাত' যেহেতু কুরআনী হিকমত সমন্বিত ব্যবহারিক রূপ তাই সুন্নাতের মধ্যেও হিকমতের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে রসূলুল্লাহ স. বর্ণিত কয়েকটি হিকমত বর্ণনা করা হলো।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তিনি বলেন :

فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

"(সূর্য) শয়তানের দুই শিঙের (মাথার দুই প্রান্তের) মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।"[৫০]

---

৪৮. সূরা আল-বাকারা : ১৯১

৪৯. সূরা আল-হাজ্জ : ২৭

৫০. সহীহুল বুখারী, কিতাব : বাদউল খালক, বাব : সিফাতু ইবলীস ওয়া জুনূদুহু, হাদীস নং-৩০৯৯

www.pathagar.com

অর্থাৎ এ সময় সূর্যপূজক মুশরিকরা সূর্য পূজার অনুষ্ঠান করে। কাজেই সময়ের দিক থেকে ইসলামের নামায মুশরিকদের পূজাসদৃশ হয়ে পড়ে বলে তা নিষিদ্ধ। একই কারণে সূর্যাস্তের সময়ও নামায নিষিদ্ধ।

ঘুম থেকে জেগে উঠে হাত ধোয়ার তাকিদ করে বলেন :

فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

"কারণ, সে জানে না তার হাত কোথায় রাত্রি যাপন করেছে।"[৫১]

অর্থাৎ নাপাক কিছুতে হাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং হাত ধুয়ে পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হবে।

পানি দিয়ে নাক সাফ করা প্রসঙ্গে বলেন :

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

"মানুষের নাকের হাড়ের ওপর শয়তান রাত কাটায়।"[৫২]

পরিচ্ছন্নতার তাগিদের জন্য এ ধরনের বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মুহররম মাসের দশ তারিখে রোযা রাখা প্রসঙ্গে বলেন, এর মাধ্যমে মূসা আলাইহিস সালামের সুন্নাতের ওপর আমল করা হয়। এ দিন ফিরাউন ধ্বংস হয়েছিল এবং আল্লাহ্র এক বিশিষ্ট নবী তাঁর উম্মতসহ বিপদমুক্ত হয়ে রোযা রেখেছিলেন।

এ ধরনের আরো বহু হিকমত সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। তা হলেও হিকমতের সন্ধান এবং নতুন নতুন সমস্যার সমাধানে হিকমতের আলোকপ্রাপ্তি সুকঠিন ব্যাপার।

হিকমত সন্ধানের পদ্ধতি

প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে শরীয়তের সম্যক জ্ঞান অর্জন তথা কুরআন ও সুন্নাতে আহকামের প্রেক্ষাপটে যে-সকল মূলনীতি এবং হিকমতের স্পষ্ট বর্ণনা বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার সামগ্রিক অনুধাবন। দ্বিতীয় পর্যায়ে অনুধাবন করতে হবে কিভাবে উপর্যুক্ত মূলনীতি ও হিকমতসমূহের আলোকে সুযোগ্য খ্যাতনামা ইমামগণ নানা বিধানের উদ্ভাবন করেছেন। তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে উদ্ভূত প্রশ্নাদির বিশ্লেষণ ফিক্হের যে অধ্যায়ের সাথে প্রশ্নগুলো সংশ্লিষ্ট বা সাদৃশ্যপূর্ণ, ব্যাপকভাবে সে অধ্যায়ের অধ্যয়ন। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে মুজতাহিদের মূলধন। তৃতীয় পর্যায়ে তার ইজতিহাদের শুরু। আশা করা যায় এ প্রক্রিয়ায় মুজতাহিদ যথার্থভাবে বিধান উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবেন- তবে একটি শর্তে, শর্তটি হচ্ছে 'তাকওয়া' যা আল্লাহ্র সহায়তা নিশ্চিত করবে। অন্তরে আল্লাহ্র আলো না থাকলে, বিদ্বান তিনি যত বড়ই হোন না

---

৫১. সহীহ মুসলিম, কিতাব : আত-তাহারা, বাব : কারাহাতু গামসিল মুতাওয়াযযি..., হাদীস নং-৬৬৫
৫২. সহীহুল বুখারী, কিতাব : বাদউল খালক, বাব : সিফাতু ইবলীস ওয়া জুনূদুহু, হাদীস নং-৩১২১

www.pathagar.com

কেন, ইজতিহাদের পিচ্ছিল পথে পা বাড়ালে হয়তো তিনি নিজেও পথভ্রষ্ট হবেন, মুসলিম উম্মাহ্কেও গোমরা করবেন। (নাউযুবিল্লাহ্)

‘ইল্লাত, শর্ত, কারণ ইত্যাদি চেনার পদ্ধতি

‘ইল্লাত, শর্ত, রুকন, কারণ ইত্যাদির অভিজ্ঞান লাভ করা এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করা আসলে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও স্থান-কাল চিহ্নিতকরণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। তাছাড়া বর্ণনাভঙ্গি, আলোচনার ভিত্তি ও যুক্তি প্রদর্শন এবং যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে আলোচনা এগিয়ে চলছে, এসবের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে তার মধ্যে ‘ইল্লাত, রুকন, শর্ত ও কারণ কোন্ কোন্‌টি এবং কেন তা জানা যেতে পারে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যখন আমরা বার বার দেখি লোকেরা কাঠ দিয়ে একটি বিশেষ আকৃতির আসবাব তৈরী করে। তার নাম দেয় তারা তখ্ত বা আসন। এখন যদি আমরা এই আসনের গঠনাকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করি, তাহলে এর মধ্যে কাঠের কার্যকর অবস্থা, ছুতারের কর্মকুশলতা, আসনের বিভিন্ন জোড় ও সংযোগ ইত্যাদি প্রত্যেকটি জিনিস একটি বিশেষ আকৃতি ও ধরন নিয়ে আমাদের মনের পাতায় ভেসে ওঠে। ফলে আমরা অবস্থান অনুসারে প্রত্যেকের একটা আলাদা নামকরণ করি। আসল ও বিধানের চেহারাও হুবহু এই একই ধরনের। যেমন, যখন দেখা গেলো রসূলুল্লাহু স.-এর কোনো নামায রুকূ ও সিজদাবিহীন নয় তখন বুঝা গেলো, এগুলো নামাযের আরকান (অর্থাৎ রুকন তথা মূল স্তম্ভ)। দেখা গেল, অযূ ছাড়া তিনি কোনো নামায পড়েননি। ফলে বুঝা গেলো, অযূ নামাযের জন্য শর্ত। দেখা গেল, তিনি প্রত্যেক নামায ঠিক যথা সময়েই পড়েছেন। এতে বুঝা গেল, সময় বা ওয়াক্ত নামাযের জন্য ‘ইল্লাত।

একথা স্পষ্ট, এ কাজের জন্য প্রচুর পরিশ্রম, সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও কুশলী অন্তর দৃষ্টির প্রয়োজন। কোনো জিনিস অনুধাবন করা, তারপর তার প্রতিটি অংশ এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয় ও তাকে প্রভাবিত করে বাহিরের এ ধরনের সব জিনিসকে তার অবস্থা অনুযায়ী স্থান নির্দেশ করা চাট্টিখানি কথা নয়। একাজ সবার আয়ত্তাধীন নয়। আল্লাহ যার দ্বারা এ দায়িত্ব পালন করতে চান একমাত্র সেই এ কাজ করতে পারে। তবে কাজটিকে কিছুটা সহজ করার জন্য ফকীহগণ কিছু মূলনীতি, নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। উসূলে ফিক্হের গ্রন্থাদিতে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হলো।

কুরআন ও সুন্নাহ্তে ‘ইল্লাতের উল্লেখ

১. স্পষ্ট “বাক্য”-এর মাধ্যমে ‘ইল্লাতের প্রকাশ

কুরআন মাজীদে অনেক ক্ষেত্রে ‘ইল্লাতের বিবরণ স্পষ্ট বাক্যে করা হয়, যেমন গৃহকর্মে নিযুক্ত লোকদের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে নির্ধারিত তিনটি সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে বিনা অনুমতিতে গৃহভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে :

www.pathagar.com

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

"এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময় (যদি তারা অনুমতি ছাড়া গৃহে প্রবেশ করে) তোমাদের ও তাদের জন্য কোনো দোষ নেই (কারণ) তোমাদের পরস্পরের কাছে বেশী বেশী যাতায়াত করার প্রয়োজন পড়ে"।[৫৩]

এই তিনটি সময় হচ্ছে :

এক. ফজরের নামাযের আগে।
দুই. 'ইশার নামাযের পরে।
তিন. দুপুরের সময়।

এই অনুমতির 'ইল্লাত হচ্ছে : পরস্পরের কাছে যাতায়াতের আধিক্যজনিত অসুবিধা এবং এই 'ইল্লাত বর্ণিত হয়েছে طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ এই স্পষ্ট বাক্যে। অথবা যেমন রসূলুল্লাহ্ স. বিড়ালের ঝুটা নাপাক না হবার 'ইল্লাত নিম্নোক্ত স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করেছেন :

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"সে (বিড়াল) বেশী বেশী যাতায়াতকারী এবং কারিণীদের অন্যতম।"[৫৪]

সম্ভবত উপরোল্লিখিত আয়াতের ভিত্তিতে এটি ছিল রসূলুল্লাহ্ স.-এর কিয়াস। কারণ উভয় স্থানেই বেশী বেশী করে যাওয়া আসাকে 'ইল্লাত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. স্পষ্ট শব্দ-এর মাধ্যমে 'ইল্লাতের প্রকাশ

স্পষ্ট শব্দের মাধ্যমে 'ইল্লাত প্রকাশের কয়েকটি উদাহরণ নিচে সংযোজিত করছি:

(ক) كي (যেন) শব্দের মাধ্যমে। যেমন "ফাই" (যুদ্ধ ছাড়াই শত্রুদের থেকে যে সম্পদ পাওয়া যায়)-এর বণ্টন ব্যবস্থার 'ইল্লাত বর্ণনা করা হয়েছে :

لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

"যাতে তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যেই সম্পদ পর্যায়ক্রমে সীমিত হয়ে না থেকে যায়।"[৫৫]

(খ) لاجل বা من اجل ব্যবহারে 'ইল্লাত বর্ণনা করা হয়, যেমন রসূলুল্লাহ্ স. বলেন:

إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

"দৃষ্টির কারণে অনুমতি চাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।"[৫৬]

---

৫৩. সূরা আন-নূর : ৫৮
৫৪. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : আত-তাহারাহ, বাব : সূরুল হিররাহ, হাদীস নং-৭৫
৫৫. সূরা আল-হাশর : ৭
৫৬. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-ইসতিযান, বাব : আল-ইসতিযান মিন আজলিল বাছার, হাদীস নং-৫৮৮৭

www.pathagar.com

অর্থাৎ মেয়েদের উপর দৃষ্টি সংযত করাই উদ্দেশ্য।

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِى دَفَّتْ

"কুরবানীর গোশ্‌ত জমা করে রাখতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যাতে (অন্যদের জন্য) ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়।"[৫৭]

(গ) اذن শব্দের মাধ্যমে 'ইল্লাত বর্ণনা করা হয়। যেমন রসূলুল্লাহ্ স. সাহাবী দাহ্য়া কালবীর একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন:

إِذاً تُكْفى هَمَّكَ ، وَيُغْفَر لَكَ ذَنْبُكَ

"তাতে তোমার উদ্বেগ নিবারিত হবে এবং তোমার গুনাহ্ মাফ করা হবে।"[৫৮]

৩. স্পষ্ট 'হরফ'[৫৯] -এর সাহায্যে 'ইল্লাতের প্রকাশ

(ক) "ل" (জন্য)। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

"(তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি) যাতে তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে যাও।"[৬০]

ফকীহ্গণ এই লাম (ل) অক্ষরটি সম্বন্ধে বলেন:

فان اهل اللغة قد نصوا على انه للتعليل

"অভিধানবিদরা বলেন, "লাম" তা'লীলের ('ইল্লাত বর্ণনা করা) জন্য ব্যবহৃত হয়।"

(খ) "باء" (ب) হরফের সাহায্যে 'ইল্লাত বর্ণনা করা হয়। যেমন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنتَ لَهُمْ

"আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আপনি লোকদের জন্য হয়েছেন কোমল স্বভাব সম্পন্ন।"[৬১]

(গ) "فاء" (ف) হরফের সাহায্যে 'ইল্লাত বর্ণনা করা হয়। এই "ফা" অক্ষরটি গুণবাচক বাক্যের সাথে যুক্ত হোক বা হুকুমবাচক বাক্যের সাথে যুক্ত হোক-উভয় অবস্থায় তা 'ইল্লাত নির্দেশের কাজ দিতে পারে। এর উদাহরণ হাদীসে নিম্নরূপ:

زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

৫৭. সহীহ্ মুসলিম, কিতাব : আল-আযাহী, বাব : বায়ানু মা কানা মিনান নাহয়ি আন আকলি লুহুমিল আযাহী বাদা ছালাছিন ফী আওয়ালিন ইসলাম ....., হাদীস নং-৫২১৫

৫৮. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : সিফাতুল কিয়ামাতি ওয়া ওয়ার রাকায়িক ওয়াল ওয়ার, হাদীস নং-২৪৫৭

৫৯. حرف = Preposition

৬০. সূরা ইবরাহীম : ১

৬১. সূরা আল ইমরান : ১৫৯

www.pathagar.com

"তাদেরকে (শহীদদেরকে) আহত ও রক্তাক্ত দেহ সহকারে আচ্ছাদিত (অবস্থায় দাফন) করো। কারণ এদেরকে এই অবস্থায় (কিয়ামতের দিন) উঠানো হবে।"[৬২]

এক্ষেত্রে "فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" কথাটিতে শহীদানের সৌভাগ্যের (গুণের) প্রকাশ রয়েছে-যা বিনা গোসলে দাফন করার হুকুমের 'ইল্লাত। কুরআনে বলা হয়েছে :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"চোর পুরুষ বা স্ত্রীলোক হোক তাদের হাত কেটে ফেলো।"[৬৩]

এক্ষেত্রে চুরি হচ্ছে 'ইল্লাত এবং তার বিধান (হুকুম) হলো হাত কাটা, 'ف' এই হুকুম বাচক শব্দ (فَاقْطَعُوا) -এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'ইল্লাত নির্দেশক রূপে। উল্লিখিত 'হরফ'গুলোকে স্থান-কালের সম্পর্কের ভিত্তিতেই 'ইল্লাত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কারণ এগুলোর ব্যবহারের অন্যান্য ক্ষেত্রও রয়েছে।

ان এবং ان ও স্থান-কাল ভেদে 'ইল্লাত নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। ان -এর উদাহরণ যেমন কুরআন মাজীদে ইউসুফ আ.-এর উক্তি :

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

"আমি নিজের নফ্‌সের সাফাই বর্ণনা করছি না, (কারণ) নফ্‌স তো অসৎ কর্মের অতি বড় প্ররোচক।"[৬৪]

এছাড়া যৌগিক শব্দও 'ইল্লাত নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন :
"لعلة كذا" "لموجب" " بكذا" "لكذا" "لمؤثر" "لسبب" ইত্যাদি।

'ইল্লাত নির্দেশে হরুফসমূহের মর্যাদা ও স্তর

ফকীহগণ উল্লিখিত শব্দ ও হরুফসমূহের মর্যাদা নির্ণয় করেছেন। যেমন তাঁরা اذن كى لاجل-কে প্রথম স্তরের মর্যাদা দিয়েছেন। লাম لام কে রেখেছেন দ্বিতীয় স্তরে, ان ও باء (ب) কে তৃতীয় স্তরে এবং فاء (ف) কে চতুর্থ স্তরে। এগুলো ছিল সুস্পষ্টভাবেই 'ইল্লাত নির্দেশের উদাহরণ। এখন ইশারার (اشارة) মাধ্যমে প্রকাশিত 'ইল্লাতের কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। এর বারোটি পদ্ধতিগত নমুনা নিম্নরূপ :

১. "فاء" এর ব্যবহারে। যে ক্ষেত্রে "হুকুম" এবং "সিফাত" (صفة) উভয়ের উল্লেখ করা হবে এবং فاء যুক্ত হবে হুকুমবাচক বাক্যে। রসূলুল্লাহ স.-এর বাণীতে এর উদাহরণ যেমন :

---

৬২. হাদীসটির প্রথমাংশ পাওয়া যায়। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং- ২৩৬৬০; পূর্ণ হাদীস ফিকহের গ্রন্থসমূহে রয়েছে। দ্র. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর।

৬৩. সূরা আল-মায়িদাহ : ৩৮

৬৪. সূরা ইউসুফ : ৫৩

www.pathagar.com

وَلا تُحَنِّطُوهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"এই ব্যক্তি (মৃত হাজী)-র শরীরে খোশ্‌বু মাখাবে না, কারণ (ف) হাশরের ময়দানে তাকে 'লাব্বায়িক' উচ্চারণ অবস্থায় সমবেত করা হবে।"[৬৫]

বর্ণনাকারীর বর্ণনায় হুকুমবাচক বাক্যে فاء সংযোগের উদাহরণ :

سهى فسجد "ভুলে গেছে, কাজেই (ف) সে সিজ্‌দা করেছে, অর্থাৎ সিজ্‌দায়ে সাহ্‌ও (سهو) করেছে। পূর্বে বর্ণিত কুরআন মাজীদের উদাহরণ যেমন:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"চোর পুরুষ হোক বা নারী (ف) উভয়ের হাত কেটে দাও।"[৬৬]

উল্লেখ্য, কোনো কোনো ফকীহ এই আয়াতে ف-কে صريح বলে বর্ণনা করেছেন, ইশারা রূপে গণ্য করেন না।[৬৭] বর্ণনাকারীর বর্ণনা হুকুমবাচক কথায় فاء এর উদাহরণ :

زنى ماعز فرجم "মাইয যিনা করেছিল। কাজেই (ف) তাকে রজম (প্রস্তর রাঘাতে হত্যা) করা হয়েছিল।"

২. কোনো ব্যক্তি রসূলে কারীম স.-এর কাছে এসে স্বীকৃতি প্রদান করে যে, সে রমযানের রোযা রাখা অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন : أَعْتِقْ رَقَبَةً "একটি গোলাম আযাদ করে দাও।"[৬৮]
এথেকে জানা গেলো, হুকুমের 'ইল্লাত হচ্ছে উক্ত 'সহবাস'। স্বীকৃতি প্রদানের সাথে সাথে হুকুমটি দেয়া হয়েছিল-এটাই 'ইল্লাত নির্দেশক ইঙ্গিত।

৩. কোনো বিশেষ সিফাত (صفة) বা বৈশিষ্ট্যের কারণে দু'টি হুকুমের মধ্যে পার্থক্য করা হলো। এক্ষেত্রে ঐ সিফাতটি হুকুমের পার্থক্যের 'ইল্লাত গণ্য হবে। যেমন :

لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ

"ঘোড় সওয়ারের জন্য (জিহাদ লব্ধ সম্পদ বণ্টনের বেলায়) দুই ভাগ এবং পদাতিকের জন্য একভাগ।"[৬৯]

৪. রসূলুল্লাহ স. বললেন : الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ অর্থাৎ হত্যাকারী উত্তরাধিকার পাবে না।[৭০] لاَ يَرِثُ-এই হুকুমটি হত্যাকর্মটির সাথে যুক্ত হওয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, হুকুমটির 'ইল্লাত হচ্ছে হত্যা।

---

৬৫. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-জানায়িয, বাব : আল-কাফানু ফী ছাওবান, হাদীস নং-১২০৬
৬৬. সূরা আল-মায়িদা : ৩৮
৬৭. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ
৬৮. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-আদাব, বাব : আত-তাবাস্‌সুমু ওয়ায্ যাহাক, হাদীস নং-৫৭৩৭
৬৯. সুনানু দারুকুতনী, কিতাব : আস-সিয়ার, হাদীস নং-১৮
৭০. সুনানু তিরমিযী, কিতব : আল-ফারায়িয, বাব : ইবতালু মীরাছুল কাতিল, হাদীস নং-২১০৯

www.pathagar.com

৫. দু'টি হুকুমের মধ্যে ব্যতিক্রম (استثناء) অর্থসূচক অব্যয়ের (যথা لا) মাধ্যমে পার্থক্য করা হলে তাতে 'ইল্লাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন :

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ

"যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে তালাক দাও এবং তাদের জন্য মহর (مهر)-এর অঙ্ক নির্ধারিত করে থাকো তাহলে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক দিতে হবে, ব্যতিক্রম হবে (لا) "যদি তারা মাফ করে দেয় (অর্থাৎ কিছুই দিতে হবে না)।"[৭১]

এখানে يَعْفُونَ (মাফ করে দেওয়া) কথাটিতে সংযুক্ত لا নির্ধারিত মহরের অর্ধাংশ নাকচ হয়ে যাবার 'ইল্লাতের ইঙ্গিত রয়েছে অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়নি।

৬. যখন কোনো হুকুমের চূড়ান্ত পর্যায় বর্ণনা করা হবে এবং তার সাহায্যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কায়েম করা হবে। যেমন :

فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ

"ঋতুকালীন সময়ে তাদের (স্ত্রীদের) থেকে আলাদা থাকো যে পর্যন্ত না তারা পাক হয়ে যায়।"[৭২]

এ আয়াতে حَتَّىَ শব্দটি لاَ تَقْرَبُوهُنَّ-এর হুকমটির সীমারেখা টানা হয়েছে। এ থেকে জানা গেলো, স্ত্রীদের থেকে আলাদা থাকার হুকুমের 'ইল্লাত হচ্ছে হায়য বা ঋতু।

৭. যখন শর্তের পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হবে এবং তা থেকে পার্থক্য বুঝা যাবে। যেমন : রিবা বা সুদ-এর ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর উক্তিতে দেখা যায় :

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد

"ভিন ভিন্ন জিনিস নগদে হলে যেভাবে চাও বিক্রি করো।"[৭৩] (সে ক্ষেত্রে কম বেশী করা জায়েয হবে)।

এখানে বিনিময় বস্তুর পণ্যের "শ্রেণীর বিভিন্নতা" কম বেশীর বৈধতার 'ইল্লাত হিসেবে গণ্য হবে এবং রিবা (সুদ) হবে না।

---

৭১. সূরা আল-বাকারা : ২৩৭
৭২. সূরা আল-বাকারা : ২২২
৭৩. সহীহ মুসলিম, কিতাব : আল-মুসাকাত, বাব : আস-সারফ ওয়া বায়'ইয যাহাবি বিল-ওয়ারাকি নাকদান, হাদীস নং-৪১৪৭

www.pathagar.com

৮. যখন لكن যোগে হুকুম বর্ণনা করা হবে এবং এর সাহায্যে দু'টো কাজের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাবে। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ

"আল্লাহ (অভ্যাসবশত অবচেতনভাবে উচ্চারিত) 'অর্থহীন কসম'-এর জন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না। তবে তোমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে যেসব কসম করেছো (সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন)।"[৭৪]

৯. যখন এমন কোনো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ থাকবে যাকে 'ইল্লাতের অর্থে নিলে তার উল্লেখই অর্থহীন হয়ে যাবে। যেমন খেজুর বিনিময়ের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স.-এর ফায়সালা :

أليس ينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم قال : فلا إذا

(রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন) "তাজা খেজুর কি শুকিয়ে গেলে (পরিমাণে) কমে যায়? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এ অবস্থায় (জায়েয) নয়।"[৭৫]

এক্ষেত্রে খেজুরের শুষ্কতায় পরিমাণ হ্রাসের ব্যাপারটিকে যদি হুকুমের 'ইল্লাত না মনে করা হয় তাহলে তার উল্লেখই অর্থহীন হয়ে যায়।

১০. কখনো সন্দেহের কারণ বর্ণনা করার মাধ্যমেও 'ইল্লাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। যেমন উমর রা. একবার রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন: শুধুমাত্র "চুম্বন" করলেই কি রোযা ভেঙ্গে যাবে? জবাবে রসূলুল্লাহ সা. বললেন : যদি "কুলি" করার জন্য মুখের মধ্যে পানি নাও এবং (এমনভাবে সাবধানে) কুলি করো যাতে হল্‌কের (কণ্ঠনালী) মধ্যে পানি প্রবেশ না করে তাহলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে? أكُنْتَ شَارِبَهُ তাতে কি বলা যাবে-তুমি পানি পান করেছো? এই জবাবে উমর রা.-এর সন্দেহ দূর করা হয়। বলা হলো, পানি পান করার সূচনা হয় মুখে পানি নেয়াতে। কিন্তু পান না করলে যদি রোযা নষ্ট না হয় তবে সঙ্গমের সূচনায় যে চুম্বন হয়, তারপর যদি সঙ্গম না হয় তাতে কেন রোযা ভাঙ্গে?

১১. হুকুমের সাথে মিলিয়ে যে صفة (বৈশিষ্ট্য) উল্লেখ করা হয়েছে সেটাই হুকুমের 'ইল্লাত গণ্য হবে। যেমন ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন,

لا يقضى القاضي وهو غضبان

"বিচারক যেন ক্রোধান্বিত অবস্থায় কোনো ফায়সালা না দেয়।"[৭৬]

---

৭৪. সূরা আল-মায়েদাহ : ৮৯

৭৫. সহীহ ইবনু হিব্বান, কিতাব : আল-বুয়ূ', বাব : আল-বায়' আল-মানহী 'আনহু, হাদীস নং-৪৯৯৭

৭৬. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : আল-আহকাম, বাব : মা জাআ লা ইয়াকযিল কাযী ওয়াহুআ গাযবান

www.pathagar.com

এখানে ক্রোধকে ফায়সালা নিষিদ্ধ করার 'ইল্লাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

১২. হুকুমকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি বাধা হয়ে দাঁড়ায় হুকুম উল্লেখ করার পর তা থেকে বাধা দেওয়াও 'ইল্লাতের দিকে ইঙ্গিত করে। যেমন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لا لِصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"হে ঈমানদারগণ! জুমআর দিনে যখন সালাতের আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র যিকিরের দিকে তাড়াতাড়ি যাও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো।"[৭৭]

এই আয়াতে যিকিরের (জুমু'আর নামায) দিকে দ্রুত যাওয়ার পথে বাধা হচ্ছে বেচাকেনা। অর্থাৎ কাজ কারবার জারী রাখা। কাজ কারবার বন্ধ করার আদেশের মধ্যে নিহিত রয়েছে জুমআর হুকুমের গুরুত্ব।[৭৮]

ইজমা'র মাধ্যমে 'ইল্লাত নির্ধারণ

কুরআন ও সুন্নায় সুস্পষ্টভাবে (صراحة) অথবা ইঙ্গিতে (اشارة) 'ইল্লাতের উল্লেখ যদি না থাকে তবে ইজমা'র মাধ্যমে 'ইল্লাত নির্ধারিত হতে পারে। যেমন মীরাসের ব্যাপারে ইজমা'র মাধ্যমে স্থির হয়েছে যে আপন ভাই পিতৃ-শরীক ভাইয়ের ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে, আর এর 'ইল্লাত বা কারণ হচ্ছে "امتزاج النسبين" (বাপ ও মা উভয় সম্পর্কের মিলন)। অথবা নাবালেগ ছেলে ও মেয়ের অভিভাবক হবে তার বাপ। আর এর 'ইল্লাত হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়স।

ইজতিহাদের সাহায্যে 'ইল্লাত বের করার কতিপয় পদ্ধতি

ফকীহগণ ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের মাধ্যমে 'ইল্লাত বের করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো নির্ধারিত করেছেন।

প্রথম পদ্ধতি 'সম্পর্ক'

সম্পর্কের মাধ্যমে 'ইল্লাত বের করা যেতে পারে। এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন :

(ক) ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নসের (হুকুম) সমস্ত গুণের প্রভাব হুকুমের মধ্যে পড়ে না। যেমন রসূলুল্লাহ স. কোনো গ্রামীণ আরবের জন্য কোনো কথা বলেন, এতে তার গ্রামীণতার গুণের কোনো প্রভাব মূল হুকুমে পড়বে না। বরং গ্রামীণ ও অগ্রামীণ এক্ষেত্রে সমান হবে।

(খ) এ ব্যাপারেও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নসের মধ্যে যতগুলো গুণ থাকে সবগুলো 'ইল্লাতে পরিণত হয় না। যেমন নিচের বহুল প্রচলিত হাদীসে দেখা যায় :

---

৭৭. সূরা আল-জুমু'আহ : ৯

৭৮. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ, শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, মিনহাজুল উসূল ইত্যাদি।

www.pathagar.com

اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

"গমের বদলে গম, যবের বদলে যব এবং খেজুরের বদলে খেজুর।"[৭৯]

এখানে মাপ বা ওজন শ্রেণী, স্বাদ, মূল্য ও খাদ্যপ্রাণ কয়েকটি গুণাবলী সহকারে রয়েছে। কিন্তু তবুও একজন ফকীহ্ সবগুলোকে 'ইল্লাত গণ্য করেননি। বরং বিভিন্ন জিনিসকে 'ইল্লাত গণ্য করেছেন।

(গ) ফকীহের জন্য বিনা প্রমাণে ইচ্ছামতো যে কোনো গুণকে 'ইল্লাত গণ্য করা জায়েয নয়। কারণ হুকুমে 'ইল্লাতের মর্যাদা ঠিক তেমনি যেমন দাবীর ক্ষেত্রে "চাক্ষুষ দেখার" মর্যাদা।

চাক্ষুষ দেখা বা সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হবার জন্য দু'টি বিষয় অপরিহার্য। সাক্ষ্যদানকারীর :

১. সৎ হওয়া;
২. আদিল তথা ভারসাম্য গুণের অধিকারী হওয়া।

অনুরূপভাবে যে গুণটি 'ইল্লাতে পরিণত হচ্ছে তার মধ্যে 'সৎগুণ' ও 'ভারসাম্যতা' থাকা অপরিহার্য। এই দু'টি থাকলে তবেই তা "ইল্লাত" হবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

'ইল্লাতের মধ্যে সৎগুণের মানে হচ্ছে এই যে, তা এমনসব 'ইল্লাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে "সুস্পষ্টভাবে", "ইশারা ইঙ্গিতে" অথবা ইজমা'র সাহায্যে প্রমাণিত হবে। যেমন বিবাহের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে "কম বয়স" হওয়া 'ইল্লাত। সম্পত্তির অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রেও এই একই গুণ অর্থাৎ "কম বয়স" হওয়াই 'ইল্লাত। এর সাথে সামঞ্জস্যশীল নসের ক্ষেত্রে যে গুণটির 'ইল্লাত হওয়া প্রমাণিত হয় সেটি হচ্ছে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত বিধানের ক্ষেত্রে "তওয়াফ" (অত্যধিক আসা যাওয়া) গুণটি। এদের উভয়ের সামঞ্জস্য হচ্ছে "আবশ্যকতা" ও "প্রয়োজন" উভয়ের মধ্যে এ গুণ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে নতুন বিষয়ের (বিবাহ ও সম্পত্তির অভিভাবকত্ব) গুণের ('ইল্লাত) সামঞ্জস্য নস্ বিধৃত গুণ থেকে প্রমাণিত হয়। 'ইল্লাতের মধ্যে "আদালত" বা ভারসাম্য গুণের মানে হচ্ছে, গুণের প্রভাব "মু'আল্লাল বিহি" (معلل به) (এই গুণকে যার 'ইল্লাত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে) হুকুমের মধ্যে পূর্বেই প্রকাশিত হয়। তবেই তো তার ওপর নতুন বিষয় বা মাস্আলার কিয়াসের বুনিয়াদ রাখা হবে। এর কতিপয় আকৃতি নিচে দেয়া হলো :

---

৭৯. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৭১৭১

www.pathagar.com

(১) ঠিক এই গুণের ('ইল্লাত) প্রভাব ঠিক এই "মুআল্লাল বিহি" হুকুমের মধ্যে প্রকাশিত হয়। যেমন "তওয়াফের" প্রভাব থাকে বিড়ালের উচ্ছিষ্টের মধ্যে।

(২) ঠিক এই গুণের প্রভাব এই হুকুমের "শ্রেণীর" মধ্যে প্রকাশিত হয়। যেমন "কম বয়স"-এর প্রভাব বিবাহের বিধানের শ্রেণীভুক্ত "সম্পত্তির অভিভাবকত্বের" মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। যেহেতু শ্রেণীর মধ্যে এ প্রভাবটি ছিল তাই বিবাহের মধ্যেও একে প্রভাবশালী গণ্য করা হয়েছে।

(৩) গুণ শ্রেণীগতভাবে এই হুকুমের (মুআল্লাল বিহি) ঠিক কেন্দ্রেই প্রভাব ফেলবে। যেমন বেহুঁশ হয়ে যাবার কারণে যদি কোনো ব্যক্তি অনেক ওয়াক্তের নামায পড়তে সক্ষম না হয় তাহলে তার কোনো কাযা নেই। এর মধ্যে গুণ ('ইল্লাত) হচ্ছে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। এটি "উন্মাদনা" শ্রেণীভুক্ত। এক্ষেত্রে "উন্মাদনা"র প্রভাব বিধানের মধ্যে ছিল এবং নামাযের কাযা উন্মাদের ওপর ওয়াজিব ছিল না। অনুরূপভাবে ঠিক এই বিধানেও "উন্মাদনার" শ্রেণীর প্রভাব মেনে নেয়া হয়েছে এবং দীর্ঘকাল বেহুঁশ থাকার পর সংজ্ঞা ফিরে এলে কাযা ওয়াজিব না হবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

(৪) গুণগত শ্রেণীর প্রভাব এই হুকুমের শ্রেণীর মধ্যে হবে। যেমন ওযর (عذر) সম্পন্ন স্ত্রীলোকের ওপর নামায ফরয থাকে না। আর ফরযের এই বিধান খতম হয়ে যাওয়ার হুকুমটি ('ইল্লাত) ওযরের দিনগুলোর কারণে সৃষ্টি হয়। সফরের কষ্ট এই গুণের শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল দুই রাকাত নামায থেকে অব্যাহতি দেয়ার মধ্যে। যেহেতু সম্পূর্ণ নামাযটি থেকে অব্যাহতি দেয়া তারই শ্রেণীর অন্তর্গত, তাই গুণগত শ্রেণীর প্রভাব বিধান শ্রেণীর মধ্যে প্রকাশিত হবে।[৮০]

মনে রাখতে হবে, শ্রেণী বলতে নিকটবর্তী শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। আর যদি উভয়ের শ্রেণী দূরবর্তী হয় তাহলে তাকে বলা হবে 'মাসালিহে মুরসালা' (المصالح المرسلة)। অনেক ফকীহ একে স্বীকার করেন আবার অনেকে করেন না। ইমাম মালিক রহ. এ থেকে "মাসালিহে মুরসালা" বা "ইস্‌তিস্‌লাহ"-এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে "উৎস" সম্পর্কিত বর্ণনার পর্যায়ে।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মতে "গুণগত" ভারসাম্যের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ভুলতা ও গ্রহণীয়তার প্রতি মানসিক ঝোঁক প্রবণতা সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়টি প্রথম

---

৮০. কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২২৫

www.pathagar.com

থেকে প্রকাশিত হওয়া জরুরী নয়। তারপর মানসিক ঝোঁক প্রবণতা সৃষ্টির পর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য নির্ধারিত নীতিমালার মানদণ্ডে তাকে যাচাই করে নেয়া যথেষ্ট হবে। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে প্রথম থেকে প্রকাশিত হওয়া জরুরী।

দ্বিতীয় পদ্ধতি 'তরূদ'

এর দ্বিতীয় পদ্ধতি "তরদ ও আক্‌স"। তরদীয়াত বা পশ্চাদ্ধাবনের মাধ্যমে 'ইল্লাত বের করা। এর পদ্ধতি হচ্ছে, গুণ পাওয়া গেলে হুকুমও পাওয়া যাবে এবং গুণ বদলে গেলে হুকুমও বদলে যাবে। এক্ষেত্রে গুণকে ভিত্তি বা নির্ভর এবং হুকুমকে নির্ভরকারী বলা হয়। এই পদ্ধতির দ্বিতীয় নাম হচ্ছে "দওরান" বা পাল্টে আসা। যেমন যতক্ষণ আঙ্গুরের রসের মধ্যে "সুকার" (নেশা) গুণটি সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ তা হালাল হবে। আর যখনই নেশা সৃষ্টি হয়ে যাবে তখনই তা হারাম হয়ে যাবে। এক স্থানে এটি "দওরান"-এর দৃষ্টান্ত। আবার কখনো এই "দওরান" দুই স্থানেও হয়। যেমন "তা'আম" (স্বাদ) সূদ হারাম হবার 'ইল্লাত। যেহেতু এই গুণটি ('ইল্লাত) "আপেল" এর মধ্যে পাওয়া যায়, তাই এটি সূদ-সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হবে। অন্যদিকে "রেশমে" এই গুণ পাওয়া যায় না, তাই রেশম সূদ-সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম গাযালী রহ. প্রমুখ ফকীহগণ "তরদ ও আক্‌স" পদ্ধতি বেশী ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা রহ. এই পদ্ধতি বেশী ব্যবহার করেননি।

তৃতীয় পদ্ধতি 'শিবৃহ'

তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে "শিবৃহ"। এটি এমন একটি গুণ, চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা-পর্যালোচনার পরও যার মধ্যে হুকুমের সাথে সম্পর্ক প্রকাশিত হয় না। তবে অন্য কোনো হুকুমের মধ্যে এর প্রতি শরীয়ত প্রণেতার আকর্ষণের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি সম্পর্কের চাইতে কম পর্যায়ের এবং "তরূদ ও আক্‌সের" তুলনায় উঁচু পর্যায়ের। একদিক দিয়ে সম্পর্কের সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে আবার অন্য দিক দিয়ে এর সাদৃশ্য রয়েছে "তরদ্ ও আক্‌সের" সাথে। এ কারণে একে "শিবৃহ" বলা হয়। যেমন নাজাসাত অপবিত্রতা দূর করা সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর রহ. উক্তি:

طهارة تراد لاجل الصلوة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث

> "নামায পড়ার জন্য এই পবিত্রতা লাভ করার সংকল্প করা হয়। তাই পানি ছাড়া অন্য কোনো প্রবাহমান জিনিসের সাহায্যে এই পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নয়। এভাবে (পানি ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্যে) অযুও জায়েয নয়।"

"নাজাসাত দূর করা" এবং "হাদাস থেকে তাহারাত" লাভ করা, এ দু'য়ের মধ্যে তাহারাত সর্বজনীন জিনিস। এটি অর্জন করা হয় নামাযের জন্য। কিন্তু

www.pathagar.com

তাহারাতের সম্পর্ক হচ্ছে হুকুমের (পানি-এর) সাথে। তার জন্য একমাত্র পানিই নির্ধারিত হয়েছে। তবে অন্যান্য বিধান যেমন কুরআন মাজীদে হাত লাগাবার ও কাবাঘরের তওয়াফ ইত্যাদি করার জন্য শরীয়ত প্রণেতা তাহারাতের ওপর নির্ভর করেছেন। এথেকে মনে হয় "সর্বজনীন গুণ" তাহারাতের ভিত্তিতে পানি নির্দিষ্টকরণের হুকুম এই অবস্থারও অন্তরভুক্ত হবে। শাফেয়ী ফিক্‌হ বিশেষজ্ঞগণ শিব্‌হের এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।[৮১]

মূলত ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম শাফেয়ীর রহ. একটি মতবিরোধের ওপর এ অবস্থাটির ভিত্ গড়ে ওঠেছে। 'ইল্লাত সম্পর্কিত এ অবস্থাটির আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে করেছি। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার রহ. মতে 'ইল্লাতের "প্রভাবশালী" (মুয়াসসিরাহ্) হওয়া জরুরী। তবেই তা কার্যকর হতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে ইমাম শাফেরী রহ. বলেন, 'ইল্লাতের "মাখলীয়া" হওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ 'ইল্লাত ও তার নির্ভুলতার প্রতি কেবল ঝোঁক প্রবণতাই কার্যকর হবে। তার জন্য প্রভাবশালী হবার কোনো প্রয়োজন নেই।

চতুর্থ পদ্ধতি 'কিয়াসুল ইশ্‌বাহ'

চতুর্থ পদ্ধতি হচ্ছে কিয়াসুল ইশ্‌বাহ। এর আকৃতি নিম্নোক্তভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে :

নতুন বিষয়টি দু'টি মূল বিষয় সদৃশ হবে। একটির সাথে সাদৃশ্য হবে হুকুমের ক্ষেত্রে এবং অন্যটির সাথে হবে আকৃতির ক্ষেত্রে।

ইমাম শাফেয়ী রহ. হুকুমের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে প্রাধান্য দেন। অন্যদিকে ইমাম আহমদ রহ. ও ইমাম আবু হানীফা রহ. (একটি উক্তি অনুযায়ী) আকৃতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে অগ্রাধিকার দেন। যেমন নিহত গোলাম প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর মত হলো, তার বিধান হবে অন্যান্য গোলামের মতো। অর্থাৎ হত্যাকারীর ওপর তার মূল্য দেয়া ওয়াজিব হবে। সেই মূল্য দীয়াত তথা 'রক্তমূল্যের' চাইতে বেশী হয়ে গেলেও। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. যেহেতু আকৃতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে অগ্রাধিকার দেন, তাই তাদের মতে মূল্য "দীয়াতের" চাইতে বেশী ওয়াজিব হবে না।

পঞ্চম পদ্ধতি 'বিভক্তি ও পরীক্ষা'

পঞ্চম পদ্ধতি হচ্ছে, "তাকসীম ও সাব্‌র" অর্থাৎ বিভক্ত করা ও পরীক্ষা করা। এর আকৃতি নিম্নোক্তভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে :

---

৮১. মিনহাজুল উসূল এবং আত্-তাকরীর ওয়াত তাহ্‌বীর, পৃ. ২০০

www.pathagar.com

যেসব গুণ সম্পর্কে মনে করা হবে যে, সেগুলো 'ইল্লাত হতে পারে সেগুলোকে এমনভাবে পরীক্ষা করতে হবে যাতে তার মধ্য থেকে যথার্থ 'ইল্লাতটি ছেঁকে বের করা সম্ভব হয়। এজন্য নির্দিষ্ট নিয়ম করে নাকচ করে দিতে হবে। তারপর নিয়ম অনুযায়ী যেদিকে নাকচ করা সম্ভব হবে না কেবলমাত্র সেটিই 'ইল্লাত গুণবিশিষ্ট বলে গণ্য হবে। যেমন বিবাহের অভিভাবকত্বের বিষয়টি। এর 'ইল্লাত কি 'বাকারাত' (কুমারীত্ব) হবে, না সিগ্‌র (স্বল্প বয়স) অথবা এ দু'টি ছাড়া অন্য কোনো গুণ? মোটকথা যেসব গুণ 'ইল্লাত হবার যোগ্যতা রাখে তাদের সবাইকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী যাচাই করা হবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর রহ. নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী উপর্যুক্ত অবস্থায় শুধুমাত্র "বাকারাত" 'ইল্লাত হবার যোগ্যতা রাখে এবং "বাকারাত" ছাড়া অন্য সবগুলো নাকচ হয়ে যাবে। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফার রহ. মতে একমাত্র "সিগ্‌র" 'ইল্লাত গণ্য হবে এবং অন্য সবগুলো নাকচ হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ পদ্ধতি তরদ্‌

ষষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে তরদ্‌। এর আকৃতি নিম্নরূপ :

এমন গুণের মাধ্যমে হুকুম প্রমাণ করতে হবে যে হুকুমের সাথে তার সম্পর্ক জানা যাবে না এবং তা নতুন আকৃতি (যার উদ্ভব হয়েছে) ছাড়া অন্যান্য ভিন্নধর্মী আকৃতির সাথে সম্পর্ককে অপরিহার্য করে তুলবে। যেমন "শিব্‌হের" ক্ষেত্রে হয়।

এই পদ্ধতিটির প্রামাণ্য হবার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। গবেষক ফকীহগণের মতে, এ পদ্ধতিটি প্রামাণ্য নয়। (এজন্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না)

সপ্তম পদ্ধতি "তানকীহে মানাত"

সপ্তম পদ্ধতি হচ্ছে "তানকীহে মানাত"(تنقيح المناط) অর্থাৎ মূল (পূর্বতন হুকুম) ও শাখার (নতুন সমস্যা) মধ্যে পার্থক্যকারী যে জিনিসটি থাকবে তাকে যুক্তির মাধ্যমে অর্থহীন ও বাতিল গণ্য করতে হবে। তারপর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে হুকুমের মধ্যে উভয়কে শরীক করতে হবে। যেমন ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ভারী জিনিস দিয়ে কাউকে হত্যা করা এবং ধারাল জিনিস দিয়ে হত্যা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শুধু এতটুকু যে, একজন ভারী জিনিসের সাহায্যে এবং অন্যজন ধারাল জিনিসের সাহায্যে নিহত হয়েছে।

যেহেতু ইমাম শাফেয়ীর রহ. মতে 'ইল্লাতে এই পার্থক্যের কোনো দখল নেই, তাই শুধুমাত্র হত্যাকে দেখা হবে এবং উভয়ক্ষেত্রে মূল হত্যাকর্মকেই 'ইল্লাত গণ্য করা হবে। আর এই হত্যা যেভাবে ধারাল অস্ত্রের সাহায্যেও পাওয়া গেছে তেমনি ভারী অস্ত্রের সাহায্যেও পাওয়া গেছে।

www.pathagar.com

উসূলবিদদের মতে 'তানকীহে মানাত'-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق، بأن يقال: لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا، وذلك لا مدخل له في الحكم ألبتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له

"মাঝখানে পার্থক্যকারী বস্তুটিকে নাকচ গণ্য করে শাখাকে মূলের সাথে এমনভাবে শামিল করা যাতে মূল ও শাখার মধ্যে বিশেষ পরিমাণ ছাড়া কোনো পার্থক্য থাকবে না। আর এই বিশেষ পরিমাণের হুকুমের মধ্যে কোনো দখল নেই। মূল বস্তুতে যখন উভয়ে শামিল তখন হুকুমেও উভয়ে শামিল হবে।"[৮২]

সাধারণভাবে প্রচলিত আছে যে, হানাফীগণ (১) শিব্‌হ (২) তাকসীম (৩) দওরান ও (৪) তানকীহ-এই চারটি পদ্ধতি স্বীকার করেনা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একথা ঠিক নয়। কাজেই "দওরান" পদ্ধতিতে মাসায়েল নির্ণয় ও উদ্ভাবন হানাফীদের এখানেও দেখা যায়। যেমন এর বিস্তারিত আলোচনা সামনের দিকে আসবে। "তানকীহ"-এর তাৎপর্যও তারা স্বীকার করেন, যদিও যথারীতি পারিভাষিক রূপের প্রমাণ তাদের এখানে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে "তাকসীম"-এর ব্যাপারেও তারা ব্যাপকতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তবে "শিব্‌হ" কে তারা স্বীকার করেন না। কারণ "শিব্‌হ" এর ভিত্ কায়েম রয়েছে "ইল্লাতে মাখলিয়া"-এর ওপর। আর ইমাম আবু হানীফার রহ. মতে 'ইল্লাতের জন্য "মুয়াস্‌সিরাহ" হওয়া জরুরী, শুধুমাত্র "মাখলীয়া' হলে কাজ হবে না।[৮৩]

ফকীহগণ এ প্রসঙ্গে আরো দু'টি পরিভাষাও ব্যবহার করে থাকেন: এক, তাখরীজে মানাত এবং দুই, তাহকীকে মানাত।

তাখরীজে মানাত ও তাহকীকে মানাতের সংজ্ঞা

(১) তাখরীজের সংজ্ঞা হচ্ছে :

استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق المتقدمة كالمناسبة

"মু'আইয়্যেনা (নির্দিষ্টকরণ), মুনাসিবাত (সম্পর্কিতকরণ) ইত্যাদি উল্লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে চিন্তা-গবেষণা করে হুকুমের 'ইল্লাত নির্ণয় করা।"[৮৪]

যেমন সুদের 'ইল্লাত বের করতে হলে চিন্তা করতে হবে, এর 'ইল্লাত কি স্বাদহীন পরিমাপ হবে, না খাদ্যপ্রাণ ?

(২) তাহকীকে মানাতের অর্থ হচ্ছে : যে 'ইল্লাত স্থিরীকৃত হবে চিন্তা-গবেষণার পর নতুন বিষয়ের ক্ষেত্রে তাকে প্রমাণ করা। যেমন সুদের 'ইল্লাত স্থিরীকৃত

---

৮২. হুসূলুল মামুল মিন ইল্‌মিল উসূল, পৃ. ৯৪

৮৩. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত

৮৪. মিনহাজুল উসূল, আল হাশিয়া আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, পৃ. ৫১

www.pathagar.com

হলো পরিমাপ বা ওজন। এক্ষেত্রে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে দেখতে হবে এই 'ইল্লাতটি কার মধ্যে পাওয়া যায়, যার ভিত্তিতে তাকে সুদ-সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করা যায় এবং কার মধ্যে পাওয়া যায় না, যার ভিত্তিতে তাকে সুদ-সামগ্রীর বাইরে রাখা যায়। উসূলবিদগণের মতে তাহকীকে মানাতের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

أن يقع الاتفاق على كلية وصف بنص أو إجماع؛ فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي خفي فيها وجود العلة

"নস্ বা ইজ্‌মা'র মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে যে 'ইল্লাত প্রমাণিত হয় চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে নতুন বিষয়ের (তার মধ্যে 'ইল্লাত নিহিত রয়েছে) মধ্যে তা প্রমাণ করা।"[৮৫]

যেমন চোরের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তার 'ইল্লাত হচ্ছে চুরি করা। এটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। এক্ষেত্রে "নাব্বাশ" বা কাফন চোরের নতুন বিষয়টির উদ্ভব হয়। এখন চিন্তা-গবেষণা করে প্রমাণ করতে হবে "নাব্বাশ"কে চোরের দলে শামিল করা যেতে পারে কিনা?

আল্লামা শাতিবীর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা বেশী ব্যাপক ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল মনে হয় :

أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله

"তাহকীকে মানাতের মানে হচ্ছে, হুকুম স্বস্থানে শরীয়ত বিধৃত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হবে। কিন্তু তার স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা করার কাজ বাকি থাকবে।"[৮৬]

যেমন "আদালত" তথা ন্যায়পরায়ণতা বা ভারসাম্যতার অর্থ স্বস্থানে শরীয়ত বিধৃত পদ্ধতিতে প্রমাণিত। কিন্তু স্থান-কালের প্রেক্ষিতে কার মধ্যে কোন্ পর্যায়ের "আদালত" পাওয়া যায়, উপরন্তু অবস্থা ও চাহিদার দৃষ্টিতে তার প্রকাশ্য মানদণ্ড কী হবে-একাজ মূলত বাকি থেকে যায়। প্রতি যুগে এর প্রয়োজন হয়।

'ইল্লাতের শর্তসমূহের বর্ণনা

ফকীহগণ 'ইল্লাতের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাদি নির্ধারণ করেছেন।

১. 'ইল্লাতের জন্য 'মুনাসিবাত' (مناسبة) তথা উপযোগিতা শর্ত। অর্থাৎ আহকাম নির্ধারণ করার ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার সামনে যে হিকমত (মাসলাহাত) ছিল এই 'ইল্লাত সেই হিকমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন মুসাফির-এর ইফতার (افطار) অর্থাৎ রমযানের রোযা না রাখার এখতিয়ার দেয়ার 'ইল্লাত হচ্ছে "সফর" এবং কষ্ট (مشقت) হচ্ছে তার হিকমত। এই رخصة, (হুকুমকে শিথিল করা)-এর

---

৮৫. হুসূলুল মামুল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৯৪ এবং ফাতহুল মুলহিম, মুকাদ্দমা, পৃ. ৮৯
৮৬. ফাতহুল মুলহিম, পৃ. ৮৯

www.pathagar.com

মাধ্যমে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষতি নিবারণ। সফরে কষ্টের মাধ্যমে মুসাফির ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই ক্ষতি নিবারণের লক্ষ্যে সফর 'ইল্লাত হিসেবে গণ্য হয়েছে এবং মুসাফির ইফতারের অনুমতি পেয়েছে।

একটি নীতি হচ্ছে, শরীয়তের বিধান সমূহের লক্ষ্যে জালবে নাফা (جلب نفع) অর্থাৎ যা লাভজনক তা আকর্ষণ (অর্জন) করা এবং দাফায়ে দারার (دفع ضرر) অর্থাৎ যা ক্ষতিকর তা প্রতিরোধ করা। যেমন উসূলের কিতাব গুলোতে বলা হয়েছে :

أن الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد والشارع انما حكم بها على ما اقتضته مصالح العباد

"শরীয়তের হুকুমসমূহ বান্দার মাস্‌লাহাত তথা কল্যাণ ও প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত এবং বান্দার মাস্‌লাহাতের যা চাহিদা শরীয়ত প্রণেতা তারই হুকুম দিয়েছেন।"[৮৭]

এই মাস্‌লাহাতের সম্পর্ক রয়েছে তিনটি জিনিসের সাথে :

১. পাঁচটি কুল্লিয়্যাত (كليات خمسة) : মানবের ধর্ম (دين), বুদ্ধি (عقل), সম্পদ (مال), বংশ (نسب) ও নফ্‌স (نفس) অর্থাৎ জীবন। এ গুলোর হিফাযত বা রক্ষণের জন্য শরীয়তে বহু বিধান রয়েছে।

২. মুআমালাত (معاملات) : বেচাকেনা, ভাড়া, বণ্টন ইত্যাদির জন্যও বিধান জারী হয়েছে।

৩. মানুষের জাহেরী (ظاهرى) ও বাতেনী (باطنى) জীবনের পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা সাধনের ও রক্ষণের গরযে শারঈ বিধানাবলী প্রণীত হয়েছে। প্রত্যেকটি বিধানের পশ্চাতে রয়েছে মানবকল্যাণ বা মাস্‌লাহাত (المصلحة)।

ব্যাপকতর পরিমণ্ডলে আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংস্কার এবং নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, লেনদেন, ব্যবহারিক জীবন ও রাজনৈতিক সংস্কার ইত্যাদি মানবিক মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়-এর অন্তর্ভুক্ত।

২. 'ইল্লাত নির্দিষ্ট হওয়াই শর্ত। হিকমতকে (মাস্‌লাহাত) 'ইল্লাত গণ্য না করার কারণ হচ্ছে হিকমতের প্রচ্ছন্নতা। অথচ হুকুমের সমগ্র ক্ষেত্রে 'ইল্লাত দৃশ্যমান হওয়া জরুরী, কোনো ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন থাকলে চলবে না। যেমন রমযানে রোযা না রাখার অনুমতির 'ইল্লাত হচ্ছে "সফর" এবং কষ্ট হচ্ছে তার 'হিকমত'। কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যানবাহনে সফরকারীদের সফরের কষ্ট দৃশ্যমান নয়। তবে কি তারা এই ছাড় লাভের অযোগ্য প্রমাণিত হবে না। সফরকে 'ইল্লাত নির্ধারণ করলে কোনো মুসাফিরকে ছাড় থেকে বঞ্চিত করার প্রয়োজন হয় না। কারণ কে এই ছাড় লাভ করবে, কে করবেনা- এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিও হয় না।

---

৮৭. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত লি বাহ্‌রিল উলূম, পৃ. ৫৪২

www.pathagar.com

তবে শুদ্ধ মত হচ্ছে : যদি হিকমত দৃশ্যমান হয়, যদি তাতে কোন প্রচ্ছন্নতা না থাকে, তবে তাকে 'ইল্লাত রূপে গণ্য করা যায়, অর্থাৎ তার সাথে হুকুমের সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয বরং ওয়াজিব, অবশ্য যদি কোন বিঘ্ন না থাকে। এই কথাটিই নিম্নোক্ত বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে :

ولو وجدت الحكمة ظاهر منضبطة جاز ربط الحكم بها لعدم المانع بل يجب

"যদি হিকমত প্রকাশিত হয় (হুকুমের সমস্ত ক্ষেত্রে পাওয়া যায়) এবং সুশৃঙ্খল হয় (যাতে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় থাকে) তাহলে হিকমতের সাথে হুকুমের সম্পর্ক বৈধ বরং ওয়াজিব হবে। কারণ এ অবস্থায় কোনো প্রতিবন্ধক থাকে না।"[৮৮]

ইমাম রাযী রহ. ও ইমাম বাইযাবী রহ. হিকমতকে 'ইল্লাত গণ্য করার ব্যাপারে আরো উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। তাহলে উচ্চ শ্রেণীর মুসাফির কি রোযা না রাখার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন? তাঁদের জবাব হচ্ছে : না।[৮৯] مشقت (কষ্ট) বহুস্তরের হতে পারে, তার মাত্রাও অসংখ্য। এই মুশাক্‌কাত মাত্রা ভেদে প্রত্যেক মুসাফির-এর সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই কষ্ট নিবারণের হিকমতকে 'ইল্লাত গণ্য করলে কেউ ছাড় থেকে বঞ্চিত হবে না।

কিন্তু ফকীহগণ-এর জবাবে বলেন, হিকমতের (যা 'ইল্লাতে পরিণত হচ্ছে) সাধারণভাবে হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির সাথে শামিল হওয়াই যথেষ্ট। হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির মধ্যে একই ধরনের কষ্টের অস্তিত্ব থাকা জরুরী নয়। বরং অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী ধারণা হিসেবে নিছক কষ্টের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেই হবে। আর উপর্যুক্ত অবস্থাতেই এটা সম্ভব।

হিকমতকে 'ইল্লাত বানাবার উপর্যুক্ত উদাহরণটি শুধু বিষয়টি বুঝাবার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। সফররত অবস্থায় ছাড়ের ক্ষেত্রে কষ্ট (হিকমত) 'ইল্লাতে পরিণত হতে পারে একথা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ কষ্টকে 'ইল্লাতে পরিণত করলে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

একথা সুস্পষ্ট যে, সফর হয় বিভিন্ন ধরনের। এ হিসেবে কষ্টের মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়। এদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। সবগুলোকে একটি নিয়ম শৃঙ্খলার আওতায় আনা, তারপর পর্যায় নির্ধারণ করে কোনোটাকে ছাড় দেয়া এবং কোনোটাকে ছাড় না দেয়া বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

---

৮৮. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত লি বাহরিল উলূম, পৃ. ৫৪২

৮৯. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, খ. ২, পৃ. ২২৯

www.pathagar.com

কোনো অভাব ও কমতির কারণে কোনো সময় কিছু কিছু ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করার মতো পার্থক্য সৃষ্টি করার কোনো অবকাশ আইনের জগতে নেই। তবে পার্থক্যটা যদি মামুলি পর্যায়ের হয় এবং অন্য কোনো পথে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় তাহলে মূল বিধান অপরিবর্তিত রেখে ক্ষতি পূরণের পথ বের করা যেতে পারে। যেমন সফরে একদিকে রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে সবধরনের কষ্ট ও ধকল সহ্য করতে হয়। আবার অন্যদিকে 'এয়ার কন্ডিশন' কম্পার্টমেন্টের যাত্রীর ঠাণ্ডা-গরম সবরকমের অবস্থার হাত থেকে আত্মরক্ষার পুরোপুরি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই পারস্পরিক পার্থক্যের ক্ষতিপূরণ কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত হুকুম থেকে হতে পারে।

কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"যারা এর (রমযানের রোযা রাখার) শক্তি রাখেনা, প্রতি রোযার বদলে (فدية) তারা একজন মিসকিনকে আহার করাবে।"[৯০]

এই হুকুমের সার্বিকতার ক্ষেত্রে আসল ছাড়কে অপরিবর্তিত রেখে 'এয়ার কন্ডিশন' মুসাফিরদেরকেও যদি শামিল করে নেয়া হয় এবং তাদের জিম্মায় ছাড়ের বদলে একজন মুসাফিরকে আহার করিয়ে দেয়া অপরিহার্য গণ্য করা হয়, তাহলে এর মাধ্যমে কষ্টের মধ্যে পার্থক্যের ক্ষতিপূরণ অনেকটা হয়ে যাবে। আবার এর ফলে অন্যদিকে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তাকে উৎসাহিত করার একটি ক্ষেত্রও সৃষ্টি হয়ে যাবে।

কিন্তু এই অবস্থাটিকে কোনো 'ইল্লাতের আওতাধীনে আনা যাবে না। কারণ পার্থক্যের বহুতর অবস্থা ও পর্যায় রয়েছে। তাদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা অপরিবর্তিত রেখে কোনো অবস্থাকে গ্রহণ ও কোনোটাকে বর্জন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

মুফাস্‌সিরগণ يُطِيقُونَهُ কে لا يُطِيقُونَهُ এর অর্থে নিয়েছেন। বাবে افعال এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎসকে বিলীন করে দেয়া। তাই مفلس (مفلس থেকে افلاس) তাকেই বলে যার কাছে فلوس (পয়সা) নেই এবং مريد (اراد থেকে مريد) তাকেই বলে যে নিজের ইরাদা (ইচ্ছা) নির্মূল ও খতম করে দিয়েছে। এ কারণে এখানে لا কে উহ্য বলারও কোনো প্রয়োজন নেই। উহ্য না বলেও لا এর অর্থ এখানে পাওয়া যেতে পারে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফররত সে অন্য দিনে রোযা রেখে দিনের গণনা পুরা করবে।"[৯১]

---

৯০. সূরা আল-বাকারা : ১৮৪

www.pathagar.com

কিন্তু উপরের আয়াতে রোগী ও মুসাফিরের জন্য ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। এর পরপরই وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ -এর হুকুম এই ছাড়ের বিস্তারিত বিবরণ দেবার জন্যও বর্ণনা করা যেতে পারে। যদি রোগ ও সফরের ধরন এমন না হয়, যার ফলে রোযা রাখতে গিয়ে কষ্ট সহ্য করতে হয় তাহলে মূল সফরের ভিত্তিতে অবশ্যই ছাড় হবে। তবে এর ক্ষতিপূরণের জন্য প্রত্যেকটি রোযার বদলে তাকে একজন মিসকিনকে আহার করাতে হবে।

আয়াতের উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক বাক্য হিসেবে যাদের রোযা রাখার একদম ক্ষমতা নেই এবং ভবিষ্যতে যারা তার কাযাও আদায় করতে পারবে না। যেমন লালচর্ম বৃদ্ধের জন্য প্রত্যেক রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাতে হবে, তাদের জন্য যে নতুন হুকুমটি প্রমাণ করা হয় সেটি অবশ্য প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতা কায়েম হয়ে যাবে। উপরন্তু রোযা না রাখার ছাড়ের ব্যাপকতার ক্ষেত্রে অসমতার সন্দেহ রয়েছে তা অনেকটা দূর হয়ে যাবে। (আয়াতের এ ব্যাখ্যা কোনো কিতাবে দেখিনি)

অবশিষ্ট শর্তসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

ইতিবাচক হুকুমের 'ইল্লাত নেতিবাচক না হওয়া উচিত। তবে নেতিবাচক হুকুমের 'ইল্লাত নেতিবাচক হতে পারে। যেমন গনীমতের মালের ন্যায় 'ফাই' এর মালে 'খুমুস' (এক পঞ্চমাংশ) নেই। কারণ 'ফাই' লাভ করার জন্য যুদ্ধ করতে হয় না। এ অবস্থায় হুকুমের অস্তিত্ব নেই (অর্থাৎ খুমুস নেই) এবং 'ইল্লাতও (যুদ্ধের অস্তিত্ব না থাকে) ঋণাত্মক।

অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি 'গর্ভবতীকে' ছিনতাই করে নিয়ে যায় এবং ছিনতাইকারীর গৃহে তার সন্তান জন্ম নেয়, তারপর মা ও সন্তান উভয়ই মারা যায়, এ অবস্থায় ছিনতাইকারীর ওপর সন্তানের ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হবে না এবং সন্তানটি ছিনতাইকৃত হিসেবে গণ্যও হবে না। এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়া ঋণাত্মক হুকুম এবং 'ইল্লাতও "ছিনতাইকৃত না হওয়া" ঋণাত্মক।

'ইল্লাত "কাসেরা" হবে না

'ইল্লাতে কাসেরা বা অপারগ 'ইল্লাত বলা হয় এমন 'ইল্লাতকে যা স্থানের বিশেষত্বের কারণে মূল থেকে শাখার দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে না। যেমন সোনা ও রূপার মধ্যে সুদের 'ইল্লাত হচ্ছে "মূল্যমান" হওয়া। যেহেতু এ দু'টি ছাড়া সৃষ্টিগতভাবে আর কোনো বস্তু মূল্যমান হিসেব স্বীকৃত নয়, তাই এই 'ইল্লাত আর কোথাও স্থানান্তরিত হয় না।

---

৯১. সূরা আল-বাকারা : ১৮৪

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ীর রহ. মতে 'ইল্লাতে কাসেরা 'ইল্লাত হতে পারে এবং কোনো কোনো হানাফী ফকীহও এই মত পোষণ করেন। এই 'ইল্লাত যেক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে জানা যায় সেক্ষেত্রে ইমামগণের মধ্যে এই মতবিরোধ দেখা যায়। তবে এই 'ইল্লাতে কাসেরা যদি নসের মাধ্যমে জানা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তার বৈধতা স্বীকৃত।

যদি 'ইল্লাতে কাসেরা ও 'ইল্লাতে 'মুতা'আদ্দীয়া' (স্থানান্তর হবার ক্ষমতা সম্পন্ন) একত্র হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে মুতা'আদ্দীয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কারণ মুতা'আদ্দীয়ার মধ্যে (শাখার দিকে স্থানান্তরিত হবার) বাড়তি গুণ রয়েছে।

অনুরূপভাবে দু'টি গুণ যখন একত্র হয় এবং উভয়ের 'ইল্লাত হবার যোগ্যতা থাকে, একটি 'ইল্লাতে কাসেরা এবং অন্যটি 'ইল্লাতে মুতা'আদ্দীয়া, তখন এ অবস্থায়ও মুতা'আদ্দীয়াকে স্থায়ী 'ইল্লাত গণ্য করা হবে, উভয়ের সমষ্টিকে 'ইল্লাত গণ্য করা হবে না।

'ইল্লাত এমন হতে হবে যাতে কোনো স্থানে 'ইল্লাত হুকুমের পেছনে না থাকে। অর্থাৎ 'ইল্লাত পাওয়া যাবে আর হুকুম পাওয়া যাবে না, এমনটি যেন না হয়। তবে যদি কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহলে অন্য কথা। হানাফীদের মতে এই প্রতিবন্ধকের ভিত্তিতেই 'ইস্‌তিহ্‌সানের' বুনিয়াদ গড়ে ওঠেছে। স্বতন্ত্র উৎসের শিরোনামে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

'ইল্লাত না পাওয়া গেলে হুকুমও পাওয়া যাবে না। গবেষক ফকীহদের মতে এই শর্তের কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ হুকুমের একটিমাত্র 'ইল্লাত হয় এবং এই 'ইল্লাত না পাওয়া গেলে অনিবার্যভাবে হুকুম 'ইল্লাতবিহীন থেকে যায়, এরি ওপর এই শর্তটির ভিত্তি স্থাপিত। অথচ অধিকাংশ ফকীহের মতে স্বতন্ত্র 'ইল্লাত একাধিকও হয়। এ অবস্থায় একটি 'ইল্লাত না পাওয়া গেলেও অন্য 'ইল্লাতের কারণে হুকুম পাওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে গ্রহণীয় উক্তি অনুযায়ী হুকুমের একটিই স্বতন্ত্র 'ইল্লাত হবে। যেমন মিথ্যা অপবাদ দানকারীর শাস্তির 'ইল্লাত এবং তার সাক্ষ্য গৃহীত না হবারও 'ইল্লাত।

'ইল্লাতের মোকাবেলায় মূল হুকুমের মধ্যে এমন কোনো গুণ থাকবে না যা 'ইল্লাত হিসেবে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করার যোগ্যতার অধিকারী হবে। আর কোনো হস্তক্ষেপকারী থাকলে উভয়ের সমষ্টিকে 'ইল্লাত বানানো বৈধ হবে। কিন্তু উভয়ের স্থায়ী অস্তিত্ব থাকা অবস্থায় এই শর্ত বিদ্যমান থাকবে না। বরং এদের মধ্য থেকে একটিই 'ইল্লাত গণ্য হবে। যেমন : সুদের 'ইল্লাত প্রসঙ্গে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। হস্তক্ষেপকারী অস্থায়ী হলেও এই শর্তের সম্পর্ক হবে উদ্ভাবিত 'ইল্লাতের সাথে, নসসে 'উল্লিখিত 'ইল্লাতের সাথে নয়।

www.pathagar.com

'ইল্লাতের যুক্তি এমন পর্যায়ের হবে না যা শাখার অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ শাখার মধ্যে যে হুকুম বিদ্যমান তা ঐ যুক্তির সাহায্যেই প্রমাণিত হবে, সেখানে 'ইল্লাতের প্রয়োজন হবে না। তবে যদি যুক্তির সর্বজনীনতায় প্রবেশের ক্ষেত্রে শাখা থেকে কোনো সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে নিঃসন্দেহে 'ইল্লাত থেকে শাখার প্রমাণ হবে। বিশেষজ্ঞ ফকীহদের মতে এই শর্তটির কোনো প্রয়োজন নেই।

'ইল্লাত বুদ্ধির জন্য গ্রহণীয় হতে হবে। যেমন ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে

ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول

"জ্ঞানী ও চক্ষুষ্মানদের সামনে পেশ করা হলে তা যেন গ্রহণীয় হয়।"

ফকীহগণের বর্ণনাকৃত 'ইল্লাতের প্রকারভেদ

ফকীহগণ প্রাথমিক পর্যায়ে তিন প্রকার 'ইল্লাত বর্ণনা করেছেন :

১. ইস্‌মী ২. মান্‌বী ও ৩. হুকমী।

(এক) **ইস্‌মী 'ইল্লাত :** শরীয়তের ভিত্তিতে যাকে হুকুমের জন্য গঠন করা হয়েছে অথবা মাধ্যম ছাড়াই হুকুমকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

(দুই) **মান্‌বী 'ইল্লাত :** হুকুম প্রমাণ করার জন্য যার কোনো না কোনো প্রভাব থাকে।

(তিন) **হুক্‌মী 'ইল্লাত :** যার অস্তিত্ব থেকে হুকুম এমনভাবে প্রমাণিত হয় যে হুকুম তার সাথে মিশে থাকে।

তিন প্রকারের পরিবর্তে একে বরং 'ইল্লাতের তিন পর্যায় বলা যেতে পারে। কখনো এ তিনটি 'ইল্লাত একত্র হয়ে যায়। কখনো দু'টি একত্র হয়। আবার কখনো মাত্র একটি পাওয়া যায়। এ তিনটি যখন একত্র হয় তখনই সত্যিকার 'ইল্লাত গঠিত হয়।

১. তিনটির একত্র সমাবেশের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বেচাকেনা। এটিকে গঠন করা হয়েছে মালিকানার জন্য। মালিকানার সম্বন্ধও তার সাথে হয়। অন্যদিকে হুকুমও (মালিকানা) তার সাথে মিশে থাকে।

২. ইস্‌মী ও মান্‌বীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'বাই বিল খিয়ার' (যে বেচাকেনায় ক্রেতার বিক্রিত সামগ্রী ফেরত দেবার এখতিয়ার থাকে) এর মধ্যে হুক্‌মী ছাড়া বাকি দু'টি পর্যায়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

৩. ইস্‌মী ও হুক্‌মীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সফর। এটি ছাড়ের 'ইল্লাত। হুকুমের মধ্যে আসল প্রভাব হচ্ছে কষ্টের। এই সফর তার প্রমাণ। প্রমাণকে প্রামাণ্য বস্তুর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে সফর 'ইল্লাত নির্ধারিত হয়েছে। অথবা এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঘুম। এটি অযু ভেঙে যাবার 'ইল্লাত। এখানে আসল 'ইল্লাত হচ্ছে শরীরে জোড় গুলো ঢিলে হয়ে যাওয়া। এ অবস্থায়

www.pathagar.com

যে জিনিস বের হয়ে গেলে অযু ভেঙে যায় তা বের হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। এই ঘুম হচ্ছে তার প্রমাণ। আর প্রমাণকে প্রামাণ্য বিষয়ের স্থলাভিষিক্ত করে 'ইল্লাত বানানো হয়েছে।

৪. মান্‌বী ও হুক্‌মীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সংযুক্ত 'ইল্লাতের শেষ অংশ। তা অনেকটা প্রভাব বিস্তারকারী এবং হুকুমও তার সাথে মিশে আছে। কিন্তু হুকুমকে তার জন্য গঠন করা হয়নি এবং তার সাথে হুকুমের সম্বন্ধও নেই। যেমন, নিকট আত্মীয় গোলামের মালিক হয়ে গেলে গোলাম আযাদ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আযাদীর 'ইল্লাত হচ্ছে নিকট আত্মীয়তা ও মালিকানা উভয়ই। মালিকানা উভয়ের মধ্যে শেষ অংশ। প্রথমটিকে বাদ দিয়ে হুকুমের সম্পর্ক করে দেয়া হয়েছে মালিকানার সাথে। মালিকানা পাওয়া গেলেই আযাদ হয়ে যায়। নিকট আত্মীয়তার উল্লেখ করা হয়নি।

৫. শুধু ইস্‌মীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে "ইজাবে মু'আল্লাক" (কোনো শর্তের ভিত্তিতে কোনো কথা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা) হুকুমের সম্বন্ধ তার সাথে হতে পারে। কিন্তু শর্তের কারণে হুকুম তার সাথে সংযুক্ত হয় না এবং প্রভাব ফেলে না। যেমন কাফ্‌ফারার জন্য কসম ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে কসমের অবস্থা। নিঃসন্দেহে কাফ্‌ফারাকে তার সাথে সম্পর্কিত করা হয় কিন্তু তা তার জন্য গঠিত নয়।

৬. নিছক মান্‌বীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সংযুক্ত 'ইল্লাতের প্রথম অংশ। প্রভাব বিস্তারে নিশ্চিতভাবে তার দখল রয়েছে। যেমন ৪ নম্বরে নিকট আত্মীয়তার দৃষ্টান্তে বলা হয়েছে। মিশ্র 'ইল্লাতের বিভিন্ন অংশের আলাদা আলাদা ক্রিয়া হয় কি না এ ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ্‌দের মতে, সমস্ত 'ইল্লাত' সমস্ত 'মালুলের' কার্যকারণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়। পৃথক অংশের ক্রিয়া তারা মানে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মতে এটি কোনো সর্বজনীন নীতি নয়। বরং পৃথক অংশের ক্রিয়াও হতে পারে। তাই মিশ্র রোগের মিশ্র ওষুধের আলাদা আলাদা ক্রিয়া কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মিশ্র 'ইল্লাতের অংশসমূহের অবস্থাও এমনি মনে করা উচিত।

৭. নিছক হুক্‌মীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে শর্তের অস্তিত্ব। এমন হুকুমের জন্য যা শর্তের সাথে ঝুলানো আছে অথবা মিশ্র কারণের শেষ অংশ। কিন্তু দৃষ্টান্তের জন্য বেশী উপযোগী হচ্ছে নিকট আত্মীয়ের ক্রয়। যে মালিকানা আযাদীকে ওয়াজিব গণ্য করে, এটি তার জন্য।

www.pathagar.com

মোটকথা এভাবে সাত প্রকার 'ইল্লাত দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি 'ইল্লাত তিনটির মিশ্র চেহারা ও তিনটি 'ইল্লাত প্রত্যেকে দু'টির মিশ্ররূপ এবং তিনটি 'ইল্লাত একক চেহারা সমন্বিত। ফকীহগণের মতে একটি শরয়ী হুকুম ও অন্য হুকুমের 'ইল্লাতে পরিণত হতে পারে। এই ধরনের 'ইল্লাতও কখনো 'মিশ্র' 'ইল্লাত হয়। যেমন 'ওজন' ও 'জিনস' (শ্রেণী) হয় সুদের 'ইল্লাত।

'ইল্লাতের প্রতিবন্ধকের বর্ণনা

ফকীহগণ 'ইল্লাত গণ্য হবার পথে নিম্নলিখিত "প্রতিবন্ধকগুলো" বর্ণনা করেছেন। এগুলোর উপস্থিতিতে 'ইল্লাত তার যথার্থ স্থান লাভ করতে পারবে না।

১. যা 'ইল্লাতকে 'ইল্লাতে পরিণত হতেই দেয় না। যেমন স্বাধীন মানুষের কেনাবেচার ক্ষেত্রে "স্বাধীনতা" প্রতিবন্ধক হয়।

২. যা 'ইল্লাতের ক্রিয়ার এবং তার পূর্ণতা লাভ করার প্রতিবন্ধক হয়। যেমন অন্য লোকের গোলাম কেনাবেচা। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া কেনাবেচা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

৩. যা হুকুমের সূচনাকেই বাধাগ্রস্ত করে। যেমন বিক্রেতার শর্তাধীন এখতিয়ার (অর্থাৎ বিক্রেতা তার বিক্রিত পণ্য সঠিক মূল্যে বিক্রি হয়নি মনে করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ফেরত নেবার শর্ত আরোপ করে) ক্রেতার মালিকানাকে বাধাগ্রস্ত করে। যদিও তা প্রভাবশালী কিন্তু তার প্রভাব ও ক্রিয়া মুলতবী হয়।

৪. যা হুকুমের পূর্ণতা লাভ করতে বাধা দেয়, যদিও শুরুতেই তা প্রমাণ হয়ে যায়। যেমন দেখার এখতিয়ার[৯২] দেয়ার পর না দেখা পর্যন্ত মালিকানা পরিপূর্ণ হয় না।

৫. যা হুকুমের অনিবার্য হতে বাধা দেয়। যেমন দোষের এখতিয়ার[৯৩] (অর্থাৎ পণ্যের মধ্যে দোষ বের হয়ে পড়লে তা ফেরত দেবার এখতিয়ার)। তবে কোনো কোনো অবস্থায় যদি 'ইল্লাত পাওয়া যায় এবং হিকমত না দেখা যায় তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। কারণ হিকমত অবশ্যই থাকে কিন্তু প্রচ্ছন্নতার কারণে তা দেখা যায় না। আসলে 'ইল্লাতের আকারে হিকমতকেই মজবুতভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাই মূলত 'ইল্লাতের ওপর ভরসা করা হবে এবং হুকুমের জন্য তাকেই নির্ভরশীল গণ্য করা হবে।

---

৯২. কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২২৬, শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ৫৪২

৯৩. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

কার্যকারণের বিধান ও তার প্রকারভেদ

উপরে কার্যকারণের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিধান নিম্নরূপ:

১. কোনো জায়গায় 'ইল্লাত ও কার্যকারণ একত্র হয়ে গেলে হুকুমের সম্পর্ক 'ইল্লাতের সাথে হবে, কার্যকারণের সাথে নয়। তবে যদি 'ইল্লাতের সাথে হুকুমকে সম্পর্কিত করা কঠিন হয় তাহলে তখন অবশ্য তার সম্পর্ক কার্যকারণের সাথে হবে। যেমন কেউ শিশুর হাতে অস্ত্র দিয়েছে এবং সে সেই অস্ত্র দিয়ে নিজেকে জবাই করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে অস্ত্রদাতা দোষী হবে না। কারণ 'ইল্লাত স্বয়ং অর্থাৎ শিশুর কর্ম এখানে বিদ্যমান এবং জবাই করার কাজকে তার সাথে সম্পর্কিত করা কঠিনও নয়। অনুরূপভাবে চোরকে কেউ সম্পদ দেখিয়ে দিয়েছে এবং চোর চুরি করেছে। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি সম্পদ দেখিয়ে দিয়েছে সে দোষী হবে না। কারণ 'ইল্লাত স্বয়ং অর্থাৎ চৌর্যকর্ম এখানে বিদ্যমান। অথবা শিশুকে কেউ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিয়েছে। শিশু ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। ঘোড়া ডানে বায়ে বাক নেবার সময় শিশু পড়ে গিয়ে মারা গেছে। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিয়েছিল সে দোষী হবে না। তবে যদি সেই ব্যক্তি নিজেই ঘোড়া ছুটায় তাহলে সে দোষী হবে। কারণ এ অবস্থায় ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দেবার কাজটিকে তার সাথে সম্পর্কিত করা যেতে পারে।

২. কার্যকারণ যদি কোথাও 'ইল্লাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটা তখন হয় যখন কার্যকারণ 'ইল্লাতকে প্রমাণ করে। এ অবস্থায় হুকুমের সম্পর্ক হবে কার্যকারণের সাথে এবং কার্যকারণ "ইল্লাতুল ইল্লাহ" অর্থাৎ "ইল্লাতের ইল্লাত" পর্যায়ে অবস্থান করবে। যেমন কোনো ব্যক্তি একটি পশুর পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। পথে কিছু পশু মারা গেলো। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো সে দোষী হবে। কারণ পশুদের চলার সম্পর্ক হবে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে। যদিও এখানে পশুদের মারা যাবার 'ইল্লাত পশুকর্ম নিজেই বিদ্যমান কিন্তু এই 'ইল্লাত সৃষ্টিকারী কারণ হচ্ছে (হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া)। অনুরূপভাবে সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের ফলে কারোর হক মারা যায়। তারপর সাক্ষী নিজের সাক্ষ্য ফিরিয়ে নেয়। এ অবস্থায় সাক্ষী দোষী হবে। যদিও হক মারা যাওয়ার 'ইল্লাত হচ্ছে কাযীর (বা শাসকের) ফায়সালা তবুও সাক্ষ্যদান কর্ম হচ্ছে এই 'ইল্লাত প্রমাণকারী। এ অবস্থায় পশু ও কাযী একই পর্যায়ভুক্ত হবে। পশু রয়েছে যে ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার কব্জায় এবং কাযী রয়েছেন সাক্ষীর কব্জায়। কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়ার পর সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতে তিনি বাধ্য।

www.pathagar.com

৩. কার্যকারণ কোথাও 'ইল্লাতের স্থলাভিষিক্ত হয়। যখন আসল 'ইল্লাত সম্পর্কে জানা কঠিন হয়। তখন ঐ কার্যকারণই হুকুমের ভিত্তি স্থিরীকৃত হয় এবং সে-ই 'ইল্লাতের কাজ করে। যেমন খেজুর ভেজানো পানি (কার্যকারণ) "হাদাস" ('ইল্লাত) এর স্থলাভিষিক্ত। খেজুর ভেজানো পানি দিয়ে অযু করলে অযু হবে না। এ অবস্থায় "হাদাসের" প্রকৃত তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হবে না। আর এর সন্ধান পাওয়াও কঠিন।

৪. কখনো অ-কার্যকারণকেও পরোক্ষভাবে কার্যকারণ বলা হয়। যেমন কাফ্‌ফারার কারণ ধরা হয় "ইয়ামীন"কে (কসম খাওয়া)। অথচ এর কারণ হচ্ছে 'হানাস' (কসম ভেঙে ফেলা)।

এভাবে কার্যকারণ চার ভাগে বিভক্ত :

১. প্রকৃত কার্যকারণ-এর সংজ্ঞা আগেই আলোচিত হয়েছে।
২. কার্যকারণ 'ইল্লাতের অর্থে ব্যবহৃত হয়। দুই নম্বরে এটা আলোচিত হয়েছে।
৩. এমন কার্যকারণ যার জন্য 'ইল্লাতের সাদৃশ্য রয়েছে। তিন নম্বরে এটা আলোচিত হয়েছে।
৪. পরোক্ষ কার্যকারণ চার নম্বরে আলোচিত হয়েছে।[৯৪]

শর্তের বিধান ও প্রকারভেদ

শর্তের আলোচনাও ইতোপূর্বে করা হয়েছে। শর্ত পাঁচ প্রকারের :

১. নিছক শর্ত। এর সংজ্ঞা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. 'ইল্লাত অর্থে ব্যবহৃত শর্ত। যদি এমন 'ইল্লাত বিদ্যমান না থাকে যার সাথে হুকুমকে সম্পর্কিত করা যেতে পারে, তাহলে এ অবস্থায় যে শর্ত 'ইল্লাত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কূপে মানুষের পড়ে যাওয়া। এই পড়ে যাওয়ার শর্ত হচ্ছে পথে কূপ খনন করা। পড়ে যাওয়ার 'ইল্লাত হচ্ছে ভারী। পথ চলা হচ্ছে এর কারণ। যেহেতু ভূমির বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল তাই সে ভারকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কূপ খনন করার কারণে সে ক্ষমতা সরে গেছে। ভার ('ইল্লাত) একটি প্রাকৃতিক বিষয় এবং চলা (কারণ) হচ্ছে একটি মুবাহ্ কর্ম। এদের উভয়ের সাথে হুকুম (প্রাণনাশ) সম্পর্কিত হতে পারে না। কাজেই অনিবার্যভাবে শর্ত 'ইল্লাতের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং কূপ খননকারীর ওপর জামানত দেয়া ওয়াজিব হবে। কূপের মধ্যে অর্থ-সম্পদ পড়ে যাওয়ারও এই একই বিধান। ফিক্‌হের কিতাবে এ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

---

৯৪. কিতাবুত তাহকীক

www.pathagar.com

আর যদি এমন 'ইল্লাত বিদ্যমান থাকে যা 'ইল্লাত হবার যোগ্যতা রাখে তাহলে আর শর্তকে 'ইল্লাতে পরিণত করা হবে না। যেমন, যে ব্যক্তি কূপের মধ্যে পড়ে গেছে তার ওয়ারিসগণ ও কূপ খননকারীর মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে যে, সে স্বাভাবিকভাবে কূপের মধ্যে পড়ে গেছে না স্বেচ্ছায় নিজেকে সেখানে ফেলে দিয়েছে। এ অবস্থায় (উপস্থিত) খননকারীর বক্তব্যই গ্রাহ্য হবে। কেননা পতিত ব্যক্তির কাজের মধ্যে 'ইল্লাতের যোগ্যতা বিদ্যমান পাওয়া গেছে। কাজেই শর্তকে 'ইল্লাত গণ্য করার কোনো কারণ সেখানে থাকছে না।

৩. এমন শর্ত যার জন্য রয়েছে কার্যকারণের বিধান। যেমন : কোনো ব্যক্তি আস্তাবলের ফটক খুলে দিয়েছে অথবা পিঞ্জিরার দরজা খুলে দিয়েছে। এর ফলে ঘোড়া পালিয়ে গেছে বা পাখি উড়ে গেছে। এই দৃষ্টান্তে খুলে দেয়া হচ্ছে "শর্ত"। কারণ তা প্রতিবন্ধক দূর করে যেমন কূপ খনন করায় পতিত হবার বাধা দূর করেছিল। কিন্তু এখানে শর্ত হচ্ছে কার্যকারণের স্থলাভিষিক্ত এবং মাঝখানে ঘোড়া ও পাখির কাজ বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে ক্ষতির সম্বন্ধ খুলে দেয়ার সাথে হবে না। এ অবস্থায় খেসারত দিতে হবে না। বিপরীত পক্ষে কূপ খনন করার ক্ষেত্রে শর্ত 'ইল্লাত হিসেবে গণ্য হয়েছিল এবং সেখানে যোগ্যতার 'ইল্লাত বিদ্যমান ছিল না।

৪. ইস্‌মী শর্ত। এটি এমন অবস্থায় হবে যখন কোনো হুকুমের দু'টি শর্ত থাকবে এবং তার মধ্যে প্রথমটি বর্তমান থাকবে। হুকুম তার মুখাপেক্ষী তাই তাকে শর্ত বলা হবে। আবার যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় শর্ত না পাওয়া যাবে ততক্ষণ হুকুম পাওয়া যাবে না, তাই তাকে ইস্‌মী বলা হবে। এ অবস্থায় এ শর্তটি হবে নাম মাত্র, হুকুম হিসেবে নয়।

৫. শর্ত হবে আলামতের অর্থে। যেমন যিনার অধ্যায়ে 'ইহ্‌সান' (সতীত্ব) আলামত অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৯৫] ইহ্‌সান মূলত একটি গুণ। যিনার শাস্তির ক্ষেত্রে শরয়ী দৃষ্টিতে এর দিকে নজর রাখা হয় এবং এর কারণে শাস্তির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যেমন একব্যক্তি স্বাধীন, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলিম, বিবাহিত এবং নিজের স্ত্রীর কাছে গমন করেছে। এ অবস্থায় তাকে "মুহ্‌সিন" বলা হবে।

কোনো কোনো ফকীহের মতে ইহ্‌সান এক্ষেত্রে শুধুমাত্র শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সম্ভবত ফকীহগণ আলামতকে আরো বিভক্ত করেননি। তাই প্রচলিত কিতাবগুলোতে এর উল্লেখ নেই।

---

৯৫. কিতাবুত তাহকীক

www.pathagar.com

কিয়াসের শর্তের বর্ণনা

'ইল্লাত, কার্যকারণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করার পর এবার আমরা আসল কিয়াসের শর্তগুলো বর্ণনা করবো। এগুলোর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ১. হুকুম, ২. মূল ও ৩. শাখার সাথে।

হুকুম সম্পর্কিত শর্তসমূহ

হুকুম সম্পর্কিত কতিপয় শর্ত নিম্নরূপ :

১. হুকুমের 'ইল্লাত বুদ্ধির সাহায্যে অনুধাবন করা যেতে পারে। আর যদি এমন না হয় বরং হুকুম বুদ্ধির অগম্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিয়াস করা যাবে না। যেমন, নামাযের রাকাত সমূহের সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ সমূহ ইত্যাদি। এগুলোর ওপর কিয়াস করা যাবে না। যাকাতের পরিমাণ এবং পরিমাণের আনুপাতিক হার এ দুয়ের পার্থক্যকে উপেক্ষা না করা উচিত। পরিমাণের ক্ষেত্রে অবশ্য কিয়াসের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্রত্যেক যুগে পরিমাণে আনুপাতিক হার সৃষ্টি করার প্রয়োজন থাকে। তবে শর্ত হচ্ছে, এই আনুপাতিক হারের প্রতি দৃষ্টি রেখেই শরীয়তপ্রণেতা "পরিমাণ সমূহ" নির্ধারণ করেছেন।

২. হুকুমের ব্যতিক্রমী আকৃতি হতে পারবে না, যেমন, রসূলুল্লাহ স. রোযা রাখা অবস্থায় ভুলে পানাহারকারীকে বলেছেন :

أَتِمَّ صِيَامَكَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْكَ

"নিজের রোযা পুরো করো। এর কাযা নেই। আল্লাহ তোমাকে পানাহার করিয়েছেন।"[৯৬]

কিয়াস তো এটাই দাবী করে, খাদ্য ও পানীয় জাতীয় যে কোনো জিনিস শরীরের ভিতরে প্রবেশ করলে রোযা ভেঙে যাওয়া উচিত। কিন্তু উল্লিখিত হাদীসের কারণে উল্লিখিত অবস্থাটি কিয়াসভিত্তিক হুকুমের ব্যতিক্রম গণ্য হয়েছে।

৩. হুকুম কোনো বিশেষ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে জড়িত হবে না। যেমন, রসূলুল্লাহ স. খুযাইমা ইবনে সাবিত রা. সম্পর্কে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন :

مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"যার জন্য খুযাইমা একাকী সাক্ষ্য দিয়েছে তা তার জন্য যথেষ্ট।"[৯৭]

---

৯৬. সুনানু দারা কুতনী, কিতাব : আস-সওম, বাব : তাবঈতুন নিয়্যাহ মিনাল লায়লি ওয়া গাইরিহি, হাদীস নং-৩৩

৯৭. আস-সুনানুল কুবরা, কিতাব : আশ-শাহাদাত, বাব : আল-আমরু বিল-ইশহাদ, হাদীস নং-২১০২১

www.pathagar.com

এই ধরনের অবস্থায় বিশেষ প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে 'হুকুম' নির্ধারিত হয়। আর এই প্রতিক্রিয়া নিজেকে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের হকদার প্রমাণিত করে কিন্তু এ থেকে কোনো ব্যাপক আইনগত নীতি বা ধারা প্রমাণ হয় না।

৪. হুকুম 'মানসূখ' হতে পারবে না। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একটি হুকুম দেয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষিত শেষ হয়ে গেলে তার জায়গায় সেখানে দ্বিতীয় একটি হুকুম এসে গেছে। এখন অন্য পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পূর্বতন হুকুমের ওপর কিয়াস করা সঠিক হবে না।

৫. হুকুম শারয়ী হতে হবে। অ-শারয়ী হুকুমে পারিভাষিক কিয়াস সঠিক হবে না।

মূলের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ

মূলের সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. মূলের হুকুমের দলীল এমন হবে না যার ফলে তা শাখার হুকুমকেও শামিল না করে নেয়। অন্যথায় হুকুম দলীলের সাহায্যে প্রমাণিত হবে এবং কিয়াসের প্রয়োজনই থাকবে না।

২. মূলের হুকুম অন্য কোনো মূলের শাখা হবে না। সেই হুকুম স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। যেমন, নিয়ত ওয়াজিব হবার ব্যাপারে অযুকে তায়াম্মুমের ওপর এবং তায়াম্মুমকে নামাযের ওপর কিয়াস করলে এই কিয়াস সঠিক হবে না। কেননা এখানে হুকুম স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং মূলের শাখা।
কিন্তু হুকুমের পরিবর্তে স্বয়ং মূলই যদি অন্য কোনো মূলের শাখা হয় এবং ঐ উভয় মূলের মধ্যে একই 'ইল্লাত পাওয়া যায় তাহলে এ অবস্থায় কিয়াস সঠিক হবে। যেমন সিরকাকে যায়তুন তেলের ওপর কিয়াস করা। এক্ষেত্রে 'ইল্লাত হয় 'ওজন' এবং তা উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। আবার যায়তুন তেলকে লবনের ওপর কিয়াস করা হয় একই 'ইল্লাতের ভিত্তিতে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রথম অবস্থাতেই কিয়াসকে সঠিক গণ্য করেন।

শাখা সম্পর্কিত শর্তসমূহ

শাখা সম্পর্কিত কতিপয় শর্ত নিম্নরূপ :

১. শাখার 'ইল্লাত মূলের 'ইল্লাতের সমান হবে। অর্থাৎ উভয়ের একই 'ইল্লাত হবে। যদিও ডিগ্রী এবং শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে। যেমন খেজুর ভেজানো গাঁজানো পানি ও মদ উভয়ই হারাম হবার ব্যাপারে 'ইল্লাত (নেশা) একই। যদিও উভয়ের ধরন এবং এই প্রেক্ষিতে 'ইল্লাতের শক্তিমত্তা ও শক্তিহীনতায় পার্থক্য রয়েছে।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে উভয়ের হুকুমের ক্ষেত্রে সাম্য থাকা জরুরী। যেমন নাবালেগ শিশুর বিবাহের অভিভাবকত্বকে সম্পত্তির অভিভাবকত্বের ওপর কিয়াস করা হয়। এক্ষেত্রে হুকুমে সাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

২. শাখায় গিয়ে মূলের হুকুম বদলে যেতে পারবে না। ইমাম শাফেঈ রহ. যিম্মীর 'যিহার'কে (স্ত্রীকে মা ইত্যাদির সাথে তুলনা করা । যেমন স্ত্রীকে বলা, তোমার পিঠ আমার মায়ের পিঠের মতো ইত্যাদি) মুসলিমের যিহারের ওপর কিয়াস করেন। কিন্তু যিম্মীর কাফ্‌ফারা দেবার যোগ্যতা না থাকার কারণে হুকুমের ক্ষেত্রে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, এই শর্তের কারণে ইমাম আবু হানীফা রহ. এই কিয়াসকে সঠিক গণ্য করেন না।

৩. শাখার হুকুম মূলের হুকুমের অগ্রবর্তী হবে না। অর্থাৎ হুকুমকে নাযিলের দিক দিয়ে বিচার করলে শাখার হুকুম আগে এবং মূলের হুকুম পরে নাযিল হয়েছে। এমনটি হবে না যেমন নিয়ত ওয়াজিব হবার ব্যাপারে অযুকে তায়াম্মুমের ওপর কিয়াস করা। অথচ অযুর হুকুম হিজরতের পূর্বে এবং তায়াম্মুমের হুকুম হিজরতের পরে নাযিল হয়।[৯৮]

কিয়াসের ক্ষেত্র ও হুকুম

কিয়াস সম্পর্কিত উল্লিখিত বিস্তারিত বিবরণের পর তার সময় ও ক্ষেত্র এবং হুকুমের বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

ফকীহগণের মতে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র মাধ্যমে যে ক্ষেত্রে হুকুম পাওয়া যাবে না একমাত্র সে ক্ষেত্রেই কিয়াস চলবে।

"খবরে ওয়াহিদ" কে কিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। তবে ইমাম মালিক রহ.-এর যে মতটি অধিকতর প্রকাশ লাভ করেছে তাতে দেখা যায় যে, তিনি খবরে ওয়াহিদের মোকাবেলায় কিয়াসকে অগ্রাধিকার দানের পক্ষপাতি ছিলেন।

অনুরূপভাবে যে কিয়াস কোনো নস[৯৯]-এর প্রতিকূলে রদ করা হবে। যেমন রসূলুল্লাহ স. এক ঘটনায় নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দেয়ায় অযু ভেঙে যাওয়ার বিধান দিয়েছিলেন, অথচ কিয়াস অযু নষ্ট হওয়ার পক্ষে রায় দেয় না। ক্ষেত্রে নসের ওপর 'আমল করা হবে এবং কিয়াস পরিত্যক্ত হবে।

কিয়াসের হুকুম হচ্ছে, এর মাধ্যমে "যন্নে গালেব" তথা বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের কাছাকাছি প্রত্যয় লাভ করা যায়। এতে অবশ্য ভুলের সম্ভাবনা থাকে। কিয়াসের চাইতে বড় দলীল (কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা') যেক্ষেত্রে থাকে না সেক্ষেত্রে এর ওপর আমল করা অপরিহার্য গণ্য করা হয়।

---

৯৮. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত

৯৯. نص = কুরআন ও হাদীসে ব্যক্ত স্পষ্ট দলীল।

www.pathagar.com

ইস্‌তিহ্‌সান : ফিক্‌হের পঞ্চম উৎস

ইস্‌তিহ্‌সান-এর সংজ্ঞা

ইস্‌তিহ্‌সান-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে عد الشئ حسنا "কোনো জিনিসকে ভালো মনে করা।"[১] ফকীহগণের পরিভাষায় কোনো বিষয়ের দু'টো দিকের মধ্য থেকে কোনো একটি দিককে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়ার নাম ইস্‌তিহ্‌সান। নিচে এই পারিভাষিক শব্দ ইস্‌তিহ্‌সানের কতিপয় সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى

"ইস্‌তিহ্‌সান হচ্ছে- কোনো বিষয়ের হুকুমকে তার নযীর সমূহ থেকে অধিকতর শক্তিশালী যুক্তির কারণে আলাদা করে নেয়া।"[২]

العدول عن قياس إلى قياس أقوى

"ইস্‌তিহ্‌সান হচ্ছে- এক কিয়াস পরিত্যাগ করে তার চেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত কিয়াস অবলম্বন করা।"[৩]

العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى

"কোনো প্রশ্নের নযীরসমূহের ব্যাপারে যে হুকুম দেয়া হয়েছে, অধিকতর যৌক্তিক কারণে তাকে বাদ দিয়ে বিপরীত হুকুম দেয়া।"[৪]

ইস্‌তিহ্‌সানের গুরুত্ব ও প্রয়োজন

মানবের প্রয়োজন ও মানব কল্যাণের ক্ষেত্র এত বেশী বিস্তৃত যে, নীতি-নিয়ম ও আইন-কানুনের গণ্ডীর মধ্যে তাকে সাকুল্যে আবদ্ধ করা বড়ই কঠিন। প্রয়োজন ও কল্যাণ-অকল্যাণের ভিত গড়ে ওঠে প্রথমেই। তারপর তাকে সংগঠিত রূপ দেবার জন্য রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন বেধে দেয়া হয়। স্থান-কালের প্রেক্ষিতে যেমন মানব সমাজে পরিবর্তন ঘটে পরিবেশ ও পরিস্থিতির বৈচিত্র্যে নিত্যনতুন প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন বাঁধা ও নিয়ম-কানুন অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়, এমনকি কিয়াসের বিস্তীর্ণ পরিধিও সংকীর্ণ কখনও বা অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়। এহেন অবস্থায় ফকীহগণ 'প্রয়োজন'কে মানদণ্ড হিসেবে ধরে

---

১. কিতাবুত তাহকীক

২. প্রাগুক্ত

৩. মিনহাজুল উসূল

৪. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

হুকুম উদ্ভাবন করে থাকেন, এলাহী কানুনের লক্ষ্য অর্থাৎ অকল্যাণ পরিহার করে কল্যাণকরকে অবলম্বন করেন, এতেই ইস্‌তিহ্‌সান-এর উদ্ভব ঘটে এবং ইস্‌তিহ্‌সান শারঈ আহকামের অন্যতম উৎস রূপে পরিগণিত হয়। নিম্নে উদ্ধৃত ফকীহ্‌দের কয়েকটি কথা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় :

الاستحسان ترك القياس والاخذ بما هو أوفق للناس

"ইস্‌তিহ্‌সান হচ্ছে, কিয়াসকে বাদ দিয়ে মানুষের প্রয়োজনের সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হুকুমকে গ্রহণ করা।"[৫]

الاستحسان طلب السهولة في الاحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام

"বিশিষ্ট এবং সাধারণ নির্বিশেষে মানব যে সমস্ত ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাতে বিধান দানের ক্ষেত্রে 'সহজসাধ্যতা' (سهولة) অনুসন্ধানের নাম হলো ইস্‌তিহ্‌সান।"[৬]

الاخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة

"ব্যাপকতা অবলম্বন করা এবং যাতে স্বস্তি আছে তার অনুসন্ধানের নাম ইস্‌তিহ্‌সান।"[৭]

الاخذ بالسعة وابتغاء الدعة

"প্রশস্ততা (উদারতা) অবলম্বন করা এবং প্রসারতা অনুসন্ধান করাকে ইস্‌তিহ্‌সান বলা হয়।"[৮]

এই সংজ্ঞাগুলোর নির্যাস হচ্ছে, বিধান দানের বেলায় কঠিনকে পরিত্যাগ করে সহজকে অবলম্বন করা; কারণ আল্লাহ্‌র হিকমতও এরি মধ্যে নিহিত। ইরশাদ হচ্ছে :

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং যা কঠিন ও ক্লেশকর তা তোমাদের জন্য চান না।"[৯]

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ

"নিশ্চয় তোমাদের দীনের কল্যাণকর দিক হচ্ছে এর সহজসাধ্যতা।"[১০]

---

৫. আল-মাবসূত, খ. ১, পৃ. ১০৫
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত
৯. সূরা আল-বাকারা : ১৮৫
১০. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫৯৩৬

www.pathagar.com

মু'আয রা. ও আবূ মূসা রা.-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় রসূলুল্লাহ্ স. তাঁদেরকে আদেশ করেন :

يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا

"লোকদের জন্য তোমরা বিচার ব্যবস্থাকে সহজসাধ্য করো, কঠিন দুঃসাধ্য করো না, তাদেরকে সুসংবাদ দাও, তাদের মধ্যে বিরূপ ভাব জাগিয়ো না।"[১১]

এই কঠিন ও সহজের অর্থ আগেই বর্ণনা করেছি। 'উসূল ও কুল্লীয়াত' শিরোনামে আরো কিছু আলোচনা করা হবে।

প্রাচীন আইনে ইস্‌তিহ্‌সান সদৃশ একটি নীতি

যেসব প্রয়োজন ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ফকীহগণ ইস্‌তিহ্‌সানের নীতি প্রণয়ন করেছেন, প্রাচীন আইনে প্রায় সেই একই ধরনের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে অবলম্বিত একটি নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রীকদের মধ্যে "এপাইকিয়া" (Epieikeia) নামে নীতিটি প্রসিদ্ধ। আর রোমানদের মধ্যে তা "একুইটা" (Aequita) নামে পরিচিত। ইংরেজি প্রতিশব্দ (Equity)।

এরিস্টটল বলেন, দেশজ কোনো সাধারণ আইনে যখনই কোনো ত্রুটি দেখা যায়, কল্যাণকর মূলনীতির মাধ্যমে তার সংশোধন করা হয়। সিসেরো (Cicero) (রোমান order)-এর রচনাবলীতে বিভিন্ন স্থানে 'নিসফত' (Jushie) ও আইনের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং নিস্‌ফতকে আইনের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টিকারী গণ্য করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য আইনগ্রন্থগুলোতে নিসফতের কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি অর্থ ইস্‌তিহ্‌সানের অর্থের সাথে মিলে। আইনগ্রন্থগুলোতে এই নীতিটি রচনার বিভিন্ন কারণ ও বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে নিম্নরূপ :

এ নীতির সূচনা হয় রোমে। বিদেশীদের অধিকার ও দায়িত্ব সংরক্ষণ এবং আন্ত র্জাতিক বিষয়াবলীর মীমাংসা, উপরন্তু ব্যবসায়িক উন্নতিকল্পে এই নীতির উদ্ভব ঘটে। সে যুগে এক জাতির পক্ষে অন্য জাতির আইন ও রসম-রেওয়াজ মেনে নেয়াটা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এজন্য রোমের আইনবিদগণ এমন কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করেন যেগুলোর আওতায় তাঁরা স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক বিষয়সমূহের মীমাংসা করতেন এই নীতির অনুকূলে।

যেহেতু দেশীয় আইনে সাধারণ নীতি বর্ণনা করা হয়ে থাকে এবং সেখানে পৃথক পৃথক স্থানের বিশেষ অবস্থার প্রতি নজর রাখা হয় না, তাই আইনের সর্বজনীনতার কারণে অধিকাংশ ছাড়া-ছাড়ির মামলায় লোকদের অধিকার রক্ষার

---

১১. সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-২৮৭৩

www.pathagar.com

ব্যাপারে বেইনসাফী হয়ে থাকে। আবার কখনো আইন নির্ধারণ করার সময় তার কোনো কোনো দিক আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যায়। একারণে দ্বিতীয় পক্ষ কোনো উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ধরনের সমুদয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আইন ফরিয়াদীদের প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ বা ফরিয়াদের যথাযথ জবাব দানের ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়।

আদালতগুলো দেশীয় আইনের সীমালঙ্ঘন করার প্রয়োজন অনুভব করে এবং স্বাভাবিক ইনসাফ (Natural Justice) অনুযায়ী ফায়সালা করতে বাধ্য হয়। এবং এই স্বাভাবিক ইনসাফ হচ্ছে সৎবুদ্ধি এবং ঈমানদারীর চাহিদা অনুযায়ী ফায়সালা করা, যদিও তা দেশীয় আইনের কিছুটা বরখেলাফ হয়। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সংক্ষেপে এই যে, প্রাচীন ধর্মীয় সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিরা ধর্মীয় আইন থেকেই অধিকাংশ মূলনীতি সংগ্রহ করতেন। পরবর্তীকালের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোমীয় আইনের সাহায্য নিতেন। আর এই আইনের বিধি-বিধানগুলো জাগতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনের তুলনায় বেশী কার্যকর হতো।[১২] কিন্তু এই প্রাচীন রোমান আইনও বিশেষত বিদেশীদের মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হলো এবং ইস্‌তিহ্‌সান সদৃশ কতিপয় নীতির প্রবর্তন করে সে ঘাটতি পূরণ করা হয়েছিল।

কুরআনে ইস্‌তিহ্‌সান

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে ইস্‌তিহ্‌সানের সমর্থন পাওয়া যায় :

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

"আমার এই বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও, যারা (আমার) বাণী শোনে, অতঃপর সর্বোত্তম কথাগুলোর অনুসরণ করে।"[১৩]

মূসা আ.-কে কিতাব প্রদানের পর আল্লাহ তা'আলা (কুরআনে বর্ণিত) এই আদেশ দিচ্ছেন :

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا

"নিজের জাতিকে সর্বোত্তম/সর্বোৎকৃষ্ট বিধানগুলো গ্রহণের হুকুম দিয়ে দাও।"[১৪]

---

১২. দেখুন, প্রাচীন আইন, পৃ. ৩৫; আইনের মূলনীতি, খ. ১, পৃ. ২৬১

১৩. সূরা আয-যুমার : ১৭-১৮

১৪. সূরা আল-আ'রাফ : ১৪৫

www.pathagar.com

ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োজন প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহ্ দীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোনো প্রকার সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি।"[১৫]

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং তোমাদের জন্য যা কঠিন ও ক্লেশকর তা চান না।"[১৬]

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কাউকে তার সামর্থের বাইরে দায়িত্ব চাপাতে চান না।"[১৭]

হাদীসে ইস্‌তিহ্‌সান

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণিত মাওকূফ[১৮] হাদীসে ইস্‌তিহ্‌সানের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"মুসলিমগণ যা ভালো (কল্যাণকর) মনে করে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতেও তা ভালো।"[১৯]

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ

"নিশ্চয় তোমাদের দীনের কল্যাণকর দিক হচ্ছে এর সহজসাধ্যতা।"[২০]

দীনকে সহজ করা সম্পর্কে মু'আয রা. ও আবূ মূসা রা.-কে রসূলুল্লাহ স. যে হেদায়াত দেন তা উপরে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর যতগুলো উক্তি আছে তা সবই ইস্‌তিহ্‌সানের অনুকূল।

সাহাবীগণের কর্মধারায় ইস্‌তিহ্‌সানের প্রমাণ

মীরাস[২১]-এর একটি প্রশ্নের মীমাংসায় সাহাবীগণের কর্মধারায় ইস্‌তিহ্‌সান প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। এক মহিলার মৃত্যু হয়। তার উত্তরাধিকারীদের

---

১৫. সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮

১৬. সূরা আল-বাকারা : ১৮৫

১৭. সূরা আল-বাকারা : ২৮৬

১৮. যে হাদীসের বর্ণনা সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে, রসূলের সাথে সংযুক্ত হয়নি এটিকে মাওকূফ হাদীস এবং এক অর্থে একে আসার (اثر)ও বলা হয়- অনুবাদক।

১৯. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৩৬০০, বর্ণনটি রসূলুল্লাহ স. এর হাদীস নামে প্রচলিত থাকলেও মূলত এটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. এর উক্তি হিসাবে প্রমাণিত। হাদীস হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই। (সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফা ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাছ ছায়্যি ফিল উম্মাহ, হাদীস নং-৫৩৩)।

২০. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫৯৩৬

২১. ميراث = উত্তরাধিকার

মধ্যে ছিল তার স্বামী, মা, দুই সহোদর ভাই ও দুই বৈপিত্রেয় ভাই। উত্তরাধিকার আইনে সহোদর ভাই 'আসাবাহ' (عصبات)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং বৈপিত্রেয় ভাই "আসহাবুল ফুরূয" (اصحاب الفروض)-এর মধ্যে শামিল হয়। "আসহাবুল ফুরূয" হচ্ছে তারা, যাদের অংশ কুরআন মাজীদে নির্ধারিত হয়েছে। অন্যদিকে "আসবাহ"-এর অংশ নির্ধারিত নয়। বরং 'আসহাবে ফুরূয' অংশ দেবার পর যা অবিশষ্ট থাকে তারা তারই হকদার হয়।

উল্লিখিত ক্ষেত্রে স্বামী অর্ধেক, মা এক ষষ্ঠমাংশ এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা পাবে এক তৃতীয়াংশ। এতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির সবটাই চলে যায়, সহোদর ভাইদের জন্য আর কিছুই থাকে না। অথচ মৃতের সাথে তাদের সম্পর্ক মা ও বাবা উভয় দিক দিয়ে নিকটতর। উমরের রা. সামনে এ ঘটনা পেশ করা হলে তিনি সহোদর ভাইদের ক্ষতির পথ রোধ করার জন্য ইস্‌তিহ্‌সানের পথ ধরেন। তিনি সহোদর এবং বৈপিত্রেয় ভাইদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। আসহাবুল ফুরূয-কে আসাবার সাথে সংযুক্ত করা কুরআনী বিধানের বিপরীত, তবুও ইস্‌তিহ্‌সানের আশ্রয় নিয়ে একটি সুস্পষ্ট ক্ষতি নিবারণ করা হলো। তবে, উত্তরাধিকারীদের এহেন সমাবেশ কদাচিৎ হয়।

অনুরূপ উত্তরাধিকার প্রশ্নে নাতির বিষয়টিও। দাদার জীবদ্দশায় যদি বাবা মারা যায়, এ অবস্থায় নাতি দাদার সম্পত্তির মীরাস লাভ করবে না। যদি দাদার কোনো ছেলে জীবিত থাকে। আক্ষরিকভাবে উত্তরাধিকার আইনের এই হচ্ছে বিধান। দাদা যদি নাতির জন্য কোনো ব্যবস্থা করে যান অথবা নাতির বাপ যদি নিজস্ব সম্পত্তি ছেড়ে যান, তবে রক্ষা, নতুবা অনেক ক্ষেত্রে নাতির জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যদি চাচারা তাদের ভাইপো ভাইজিদের জীবিকার ব্যবস্থা সাধ্যমত না করে তা হলে ইস্‌তিহ্‌সানের আওতায় বিচারক যদি তাদের উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা করেন তবে তা ইসলামী আইনের স্পিরিট-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ইস্‌তিহ্‌সানের চারটি ভিত্তি

ফকীহগণকে ইস্‌তিহ্‌সানকে 'কিয়াসে খাফী' (قياس خفى)-এর মধ্যেও গণ্য করেছেন, অন্য কথায় কিয়াসে খাফীর অপর নাম ইস্‌তিহ্‌সান। কিয়াসে খাফী (প্রচ্ছন্ন কিয়াস)-এর বিপরীত হচ্ছে কিয়াসে জালী (قياس جلى) বা প্রকাশ্য কিয়াস। কিয়াসে জালী তাড়াতাড়ি মানসপটে জাগে, বেশী চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন পড়ে না। অন্য দিকে কিয়াসে খাফী গভীর মনোনিবেশের পর হৃদয়ঙ্গম হয়।[২২] কিয়াসের বিপরীত ইস্‌তিহ্‌সানের ভিত্তিতে বিধানদানের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো :

২২. শরহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ৫৮১

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নাহর নস[২৩]-এর বিপরীতে বা ضرورة (প্রয়োজন)-এর প্রেক্ষিতে ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োগ। ইস্‌তিহ্‌সানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

كل دليل في مقابلة القياس الظاهر نص أو إجماع أو ضرورة

"যাহিরী কিয়াস-তা নস, ইজমা' বা প্রয়োজন যাই হোক না কেন-তার মোকাবেলায় প্রত্যেকটি দলীলের নাম ইস্‌তিহ্‌সান।"

অনুরূপভাবে যাহিরী কিয়াসের মাধ্যমে যে হুকুম প্রমাণিত হয় চারটি জিনিস তাকে পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার বিরুদ্ধবাদী হুকুমকে প্রাধান্য দেয়। সে চারটি জিনিস হচ্ছে : ১. নস, ২. ইজমা', ৩. প্রয়োজন ও ৪. কিয়াসে খাফী। আর এই সবগুলোর জন্য ইস্‌তিহ্‌সান শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেহেতু এটি কোনো নীতিগত আলোচনা নয়, শুধুমাত্র ব্যবহারিক, তাই ফকীহ্‌গণ এদিকে বেশী নজর দেননা। তাঁরা কিয়াসে খাফীর দ্বিতীয় নাম দেন ইস্‌তিহ্‌সান। তবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সময় তাঁরা এদের প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। কয়েকটির দৃষ্টান্ত নিচে দেয়া হলো।

১. কিয়াসের বিপরীতে নস-এর ভিত্তিতে ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োগ : বায়' সালাম (بيع سلم)[২৪] সাধারণ কিয়াসের নিরিখে অবৈধ হওয়া উচিৎ, কারণ পণ্য সামগ্রীর উপস্থিতি এবং মূল্যের বিনিময়ে তা ক্রেতার হাতে অর্পণ ক্রয়-বিক্রয় (بيع) শুদ্ধ হবার জন্য আবশ্যক। কিন্তু রসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নোক্ত ফরমানের ভিত্তিতে কিয়াস পরিত্যাগ করে ইস্‌তিহ্‌সানের ওপর আমল করা হয় :

مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"যে ব্যক্তি খেজুরের ক্ষেত্রে 'বায়-ই-সালাম' করতে চায় তার কর্তব্য নির্দিষ্ট পরিমাপক, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা।"[২৫]

২. কিয়াসের বিপরীতে ইজমার ভিত্তিতে ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োগ : যেমন, মূল্য স্থিরীকৃত হবার পর জুতা তৈরীর অর্ডার দেয়া হলো। জুতার মাপও দেয়া হলো। সাধারণ কিয়াসের নিরিখে এ কারবারটি অবৈধ হওয়া উচিত। কারণ জুতা পরে তৈরী হবে। কিন্তু লোকেরা এত ব্যাপকভাবে এ কাজটি করে আসছে যাতে মনে হয় যেন এ বিষয়টির ওপর ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ কাজটি জায়েয। তাই এখানে কিয়াস পরিহার করে ইস্‌তিহ্‌সানের ভিত্তিতে কাজটির বৈধতার হুকুম দেয়া হল।

---

২৩. نص = স্পষ্ট হুকুম।

২৪. পণ্যের অনুপস্থিতিতে, পরে ক্রেতাকে তা দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে বেচা-কেনা।

২৫. সহীহ মুসলিম, কিতাব : আল-মুসাকাত, বাব : আস-সালাম, হাদীস নং-৪২০২

www.pathagar.com

৩. কিয়াসের বিপরীতে, কিয়াসে খাফী-র ভিত্তিতে ইস্‌তিহ্‌সানের প্রয়োগ : যেসব প্রাণীর গোশত হারাম তাদের উচ্ছিষ্টও হারাম। কারণ উচ্ছিষ্টে লালার মিশ্রণ ঘটে। এই নীতির ভিত্তিতে যেসব পক্ষী নখের সাহায্যে শিকার ধরে এবং যাদের গোশত হারাম তাদের উচ্ছিষ্টও হারাম হওয়া উচিত। কিন্তু কিয়াসে খাফী হচ্ছে, পাখিরা চঞ্চু দিয়ে খায় ও পান করে এবং চঞ্চুতে হাড় ছাড়া আর কিছুই নেই এবং এই হাড় নাপাক নয়। তাই চঞ্চুর সংস্রবে কোন পাক খাদ্য বা পানীয় নাপাক হয় না। অন্যদিকে হিংস্র প্রাণীরা জিহ্বার সাহায্যে পানাহার করে। আর জিহ্বায় লালা লেগে থাকে। এই লালা হারাম গোশত নিঃসৃত। এই নাপাক লালা পাক জিনিসের সাথে মিশলে অবশ্য তাকে নাপাক করে দেবে। এ কারণে পাখিদের জুটা হিংস্র জন্তুদের জুটার সদৃশ বিবেচনা করা যাবে না। তাই এখানে সাধারণ কিয়াস বাদ দিয়ে ইস্‌তিহ্‌সান (কিয়াসে খাফী)-এর ভিত্তিতে বিধান দান করা হয়েছে।

চার প্রকার ইস্‌তিহ্‌সান

ইতোপূর্বেকার বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, ইস্‌তিহ্‌সান চার প্রকার :

১. ইস্‌তিহ্‌সানে সুন্নাত;
২. ইস্‌তিহ্‌সানে ইজমা';
৩. ইস্‌তিহ্‌সানে যরূরত;
৪. ইস্‌তিহ্‌সানে কিয়াসী।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের ইস্‌তিহ্‌সানের ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ নেই (কারণ এ দুই ক্ষেত্রে কিয়াসের বিপরীতে থাকে নস (সুন্নাত) অথবা ইজমা')। এ দুই ক্ষেত্রে অবশ্যই কিয়াস পরিহার করার উদাহরণ আমরা দেখেছি। বাকী রইল তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের ইস্‌তিহ্‌সান। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

ইস্‌তিহ্‌সানে যরূরত

কিয়াসের ভিত্তি সবক্ষেত্রে এক এবং অভিন্ন অর্থাৎ 'ইল্লাত। কিন্তু অনেক সময় কিয়াসলব্ধ বিধান সমভাবে ফলপ্রসূ বা কল্যাণকর হয় না। বরং কোথাও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং কোথাও তা ক্ষতিকর বা অন্যায়রূপে প্রতিভাত হয়। স্বাভাবিকভাবে এহেন কিয়াসলব্ধ সিদ্ধান্ত পরিহার করতে হয় এবং ভিন্নরূপ ব্যবস্থা করতে হয়। ফকীহগণের পরিভাষায় এই ব্যবস্থা হচ্ছে "ইস্‌তিহ্‌সানে জরুরত" (প্রয়োজনের তাগিদে ইস্‌তিহ্‌সান)। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য কথা হচ্ছে এই 'প্রয়োজন' হবে আল্লাহ্‌র হিকমতের সাথে সামঞ্জস্যশীল, বান্দার

www.pathagar.com

মনগড়া প্রয়োজন নয়। সে প্রয়োজন কল্যাণবাহী হতে হবে। ফকীহ্‌দের মতে সে কল্যাণ হবে নিম্নোক্ত রূপ :

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق

"সে কল্যাণ (মাস্‌লাহাত) হবে যা মানব জীবনের প্রতিষ্ঠামুখী (সহায়ক) এবং পূর্ণতা বিধায়ক, মানবের কামনা-বাসনামূলক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলোর চাহিদা পূরণের সহায়ক হবে সর্বতোভাবে।"[২৬]

মূলত মাস্‌লাহাত বা কল্যাণ তিন প্রকার :

১. মাসালিহে যরূরিয়্যাহ- مصالح ضرورية
২. মাসালিহে হাজিয়্যাহ- مصالح حاجية
৩. মাসালিহে তাহ্‌সীনিয়্যাহ- مصالح تحسينية

উপর্যুক্ত তিন প্রকার মাস্‌লাহাতের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

(এক) "মাসালিহে যরূরিয়্যাহ" বলতে আমরা বুঝি এমন পাঁচটি (كليات خمس)-মৌলিক বিষয়ের হিফজ (সংরক্ষণ) যার জন্য শরীয়তে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা রয়েছে। এই পাঁচটি কুল্লিয়্যাত হচ্ছে :

(ক) ধর্ম রক্ষা (حفظ الدين)

(খ) জীবন রক্ষা (حفظ النفس)

(গ) বুদ্ধি রক্ষা(حفظ العقل)

(ঘ) বংশ রক্ষা (حفظ النسل)

(ঙ) সম্পদ রক্ষা (حفظ المال)।

এ মৌলিক বিষয়গুলোর সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতিগত প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এবং তার সমাজ জীবনের সংগঠন ও স্থিতিশীলতা। এ কারণে প্রত্যেক যুগের শরীয়ত তার আইনে এই পাঁচটি মৌলিক বস্তু হেফাজতের ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং এগুলো সর্বজনীন (كليات) বলে অভিহিত হয়।

আল্লাহ্‌র হিকমত অনুযায়ী যেভাবে ইসলামী শরীয়তে এ ব্যাপারগুলোর হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে অর্থাৎ এজন্য যে ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার কতিপয় উদাহরণ নিচে দেয়া হলো :

(ক) দীনের হেফাজতের জন্য কয়েক প্রকার ইবাদত নির্ধারিত হয়েছে, দীনের প্রচার (تبليغ) এবং জিহাদ ফরয করা হয়েছে;

---

২৬. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ২৫

www.pathagar.com

(খ) প্রাণের হেফাজতের জন্য দণ্ডবিধান আইনে হত্যার শাস্তি 'কিসাস'[২৭] অথবা দিয়াত[২৮]-এর ব্যবস্থা রয়েছে;

(গ) বুদ্ধিবৃত্তির হেফাজতের উদ্দেশ্যে মাদকদ্রব্যের বেচা-কেনা নিষিদ্ধ এবং মাদকসেবীর শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে;

(ঘ) বংশধারা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিবাহের বিধান নির্ধারিত হয়েছে, অবৈধ যৌন কর্ম নিষিদ্ধ হয়েছে এবং অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে;

(ঙ) ধন-সম্পদ হেফাজতের উদ্দেশ্যে চুরি-ডাকাতি ইত্যাদির জন্য শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এগুলো ছাড়াও আরো অনেক বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। যেমন পানাহার ও বসবাস সম্পর্কিত বিধান এবং এমনসব ব্যাপারে বিধান ও শাস্তিসমূহ যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ কার্য সম্পাদনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবন এবং বুদ্ধি সংরক্ষণের সাথে এদের সম্পর্ক। অনুরূপভাবে পারস্পরিক লেনদেন, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি সম্পর্কিত বিধানসমূহ বংশ, সম্পদ এবং ধর্ম ইত্যাদি সংরক্ষণের সাথে সম্পর্ক রাখে।

(দুই) মাসালিহে হাজীয়া (حاجية) বলে যার ওপর পাঁচটি কুল্লীয়াতের রক্ষণ এবং স্থিতি নির্ভরশীল নয় ঠিকই কিন্তু তার মাধ্যমে জীবন উপভোগ্য হয়, কষ্ট ও অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে মুক্তিলাভ করা যায় এবং জীবনের এমনসব বিপদ সঙ্কুল পথের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায় যেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত না করে যথার্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাপন করা যায় না এবং সদাচার সৃষ্টিও সম্ভবপর হয় না।

এই মাস্‌লাহাতের গরযে কেনা-বেচা, অংশীদারিত্ব ব্যবসায়, কৃষি, ভাড়া ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়েছে এবং এই মাস্‌লাহাতসমূহকে পূর্ণতা দান করার জন্য স্ত্রীদের মহর, তালাক, কতিপয় বিধান লঙ্ঘনের কাফ্‌ফারা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানসমূহ প্রণীত হয়েছে।

(তিন) মাসালিহে তাহসীনিয়া (تحسينية) বলতে যেসব বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল নয় কিন্তু মানবিকতার গণ্ডির মধ্যে থাকতে হলে যেগুলোকে বাদ দিয়ে চলা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর নয় তাকেই বোঝান

---

২৭. قصاص = হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড।

২৮. دية = রক্ত পণ।

www.pathagar.com

হয়। যেমন উত্তম চরিত্র, সৎ অভ্যাস, উদার হৃদয়, সৎ সাহস ইত্যাদি। এ জাতের মাসালিহের আওতায় নৈতিক বিধি-বিধান রচিত হয়েছে। উপদেশ ও উৎসাহ্ দানের মাধ্যমে সেসব বিধি-বিধানকে সক্রিয় রাখার জন্য তাকিদ করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও শিক্ষা দান, পানাহারের নিয়ম, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সমতা ও ভারসাম্য সৃষ্টি করার বিধি-বিধানের সম্পর্কও এই মাসালিহের সাথে রয়েছে। এগুলো অর্জন করার পথে যেসব বাধা-বিপত্তি হতে পারে অথবা যা কোনো প্রভাব ফেলতে পারে সেসবের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন নোংরা ও নাপাক জিনিস ব্যবহার থেকে বিরত রাখার বিধান এবং পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র জিনিস ব্যবহার করার হুকুম দেয়া হয়েছে; কারণ নৈতিক জীবন অনেকাংশে নোংরা জিনিসের ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সাদাকা ও খায়রাত সম্পর্কিত বিধান, ক্ষমা ও দাবী প্রত্যাহার করার প্রেরণা দান করা, লেনদেন ইত্যাদি ব্যাপারে কঠোরতা বর্জন এবং নরম নীতি অবলম্বন করা ইত্যাদি এবং অনুরূপ বিধিসমূহ মাসালিহে-তাহ্সীনিয়ার পর্যায়ে পড়ে।[২৯] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে ইস্‌তিহ্‌সান নীতির প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় এই তৃতীয় পর্যায়ের মাসালিহ্ অর্থাৎ মাসালিহে-তাহ্সীনিয়ার পরিধিতে। তাই ইস্‌তিহ্‌সান রীতি ও বিধি-বিধান মানবজীবনের সৌন্দর্য বা সৌকর্য সাধন (تحسين)-এর সাথে সম্পর্কিত।

ফকীহগণ নির্ধারিত অগ্রবর্তিতা ও বিলম্ব নীতি

ফকীহগণ অগ্রবর্তিতা ও বিলম্বের দিক দিয়েও মাসালিহের পর্যায় ও স্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। মূলগতভাবে তাঁরা অগ্রবর্তিতা ও বিলম্বের ক্ষেত্রে মাস্‌লাহাত ও প্রয়োজনের শক্তির প্রতি নজর দেন কাজেই তাদের মতে মাসালিহে জরুরীয়া অগ্রবর্তী হবে মাসালিহে হাজীয়ার ওপর এবং হাজীয়া অগ্রবর্তী হবে তাহ্সীনিয়ার ওপর। অতঃপর তাদের প্রত্যেকের পরিপূর্ণ রূপ অন্যের পরিপূর্ণ রূপের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে।[৩০]

কোনো কোনো ফকীহের মতে 'মুকাম্মিলাতে জরুরীয়া' অগ্রবর্তী হবে "নফসে হাজীয়া'র ওপর। অনুরূপভাবে "মুকাম্মিলাতে হাজীয়া" প্রাধান্য লাভ করবে "নফসে তাহ্সীনিয়া"র ওপর।[৩১] কিন্তু এই মতবিরোধটি খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে অতি সহজেই এর মীমাংসা করা যেতে পারে।

---

২৯. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ৫২৫

৩০. শারহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ৫৮২

৩১. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, পৃ. ২৩০

www.pathagar.com

তারপর জরুরীয়া অগ্রবর্তী হবে দীন সংরক্ষণের ওপর, তার পরবর্তী পর্যায়ে প্রাণ সংরক্ষণের ওপর, তার পরবর্তী পর্যায়ে বংশ সংরক্ষণের ওপর, তার পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধি সংরক্ষণের ওপর এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে অর্থ সংরক্ষণের ওপর। এ ব্যাপারে এ ধরনেরও একটি মত পাওয়া যায় যে, পরবর্তী চারটি সংরক্ষণই দীনের ওপর অগ্রবর্তী হবে। কারণ এগুলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। আর দীনের বেশীর ভাগ সম্পর্ক আল্লাহ্‌র অধিকারের সাথে। অন্যদিকে বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার আল্লাহ্‌র অধিকারের ওপর অগ্রবর্তী হয়। যেমন কিসাসের শাস্তি মুরতাদের শাস্তির ওপর অগ্রবর্তী। ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কখনো জুমুআর নামায ও জামায়াত ত্যাগ করারও অনুমতি পাওয়া যায়।

قَدْ كَانَ الأَحْسَنُ تَقَدِّمَ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ عَلَى الدِّيْنِ

"পরবর্তী চারটির অগ্রবর্তিতা দীনের ওপর বেশী ভালো হতে পারে।"[৩২]

কিন্তু গবেষক ও বিশেষজ্ঞ ফকীহ্‌গণ এর জবাব দিয়েছেন এবং দীনের অগ্রবর্তিতা বজায় রেখেছেন। সঠিকভাবে বলা যায়, এই বিরোধমূলক ব্যাপারও অনেকাংশে স্থান ও কালের নিগড়ে বাধা এবং এই দৃষ্টিতে সহজে এর ফায়সালা করা যেতে পারে।

শরীয়ত প্রণেতা কল্যাণ ও ক্ষতির প্রাধান্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন

এখানে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন মনে করি যে, মাস্‌লাহাত (কল্যাণ) ও ক্ষতি দু'টি আপেক্ষিক জিনিস। একটি জিনিস একদিক দিয়ে উপকারী ও লাভজনক এবং অন্যদিক দিয়ে ক্ষতিকর হতে পারে। কখনো এই দু'টি দিক সমান হয়ে যায়। আবার কখনো এদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। শরীয়তপ্রণেতা বিধান নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রাধান্যের দিকে নজর রেখেছেন। অর্থাৎ কোনো বিষয়ের মধ্যে লাভের দিকটি প্রবল ছিল বলে তাকে বৈধ গণ্য করেছেন। আবার সেই একই বিষয়ের মধ্যে ক্ষতির দিকটি প্রবল থাকার কারণে তাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাই ফকীহ্‌গণ বলেছেন :

ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة والمقصود للشارع ما غلب منها

"দুনিয়ায় কোনো কল্যাণ ও ক্ষতি নির্ভেজাল হয় না। তাই শরীয়তপ্রণেতা তাদের প্রাধান্যকেই লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন।"

---

৩২. আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, পৃ. ২৩১

www.pathagar.com

তবে নির্দেশ পালন করার জন্য এসব মাস্লাহাতের তাৎপর্য অবহিত হওয়া অপরিহার্য নয়। অথবা আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও চিন্তা-ভাবনার সাথে সেগুলোর সমতা ও সাজুয্য থাকার প্রয়োজন নেই। শরীয়তপ্রণেতা আমাদের দীনি ও দুনিয়াবী সাফল্য কল্যাণ এবং আমাদের লাভ-ক্ষতি অনুধাবন করে যে নির্দেশ ও বিধান (আদেশ ও নিষেধ) নির্ধারিত করেছেন সেগুলো পালন করা আমাদের জন্য জরুরী।

ইস্তিহ্সানে যরূরতের উদাহরণ

১. শরীয়তের একটি বিধান হচ্ছে, যদি আমানতদারের হাতে গচ্ছিত জিনিস নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে তার দোষ বা অবহেলা না থাকে, তাহলে আমানতদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যেখানেই আমানতের রূপ পাওয়া যাবে সেখানেই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন, যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শরীকদের কারো হাতে যদি পণ্য নষ্ট হয়ে যায়, অথবা কর্মচারীর হাতে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় কিংবা কোনো জিনিস ধারে নেয়া হয় এবং ধার গ্রহণকারীর হাতে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে এসব ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, যাদের হাতে মাল নষ্ট হলো তাদের পক্ষ থেকে যদি কোনো ত্রুটি না হয় এবং নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো হাত না থাকে। এই লেন-দেনগুলো আমানত সদৃশ। কিন্তু যে পেশাদার ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয় বরং অনেকের কাজ করে যেমন ধোপা, রঞ্জক, দরজী, রুটিওয়ালা ইত্যাদি। এদের জিনিস নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তার অবশ্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন (জরুরত) ও কল্যাণ (মাস্লাহাত) হচ্ছে এই যে, যদি তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ না নেয়া হয় তাহলে লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তাদের অনেকেই হয়তো লোকের সম্পদ নষ্ট বা লোপাট করবে এবং জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে যদি তাদের ক্ষমতার বাইরে কোনো কারণে সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, যেমন আগুন লেগে বা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাহলে তাদের থেকে ক্ষতিপূরণের দাবী করা যাবে না।

২. যে সব জিনিস ওজন (وزن) করে বা পরিমাপকের (كيل) সাহায্যে মেপে বেচা-কেনা করা হয় বা ধার শোধ করা হয়। এই ধরনের জিনিসের বিনিময়ে একই জাত (جنس)-এর জিনিস হলে যথা গমের পরিবর্তে গম, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর, চালের বদলে চাল ইত্যাদি বিনিময়ে ওজনে বা মাপে সমান সমান হওয়া জরুরী। অন্যথায় কমবেশী হলে অতিরিক্ত পরিমাণ জিনিসটি রিবা বা সুদে গণ্য হয়ে যাবে। কিন্তু রুটির লেনদেনে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না, যেমন

www.pathagar.com

কোনো ব্যক্তি এক ছটাক ওজনের দু'টি রুটি ঋণ নেয় এবং দেড় ছটাক ওজনের দু'টি রুটি ফেরত দেয়। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত (فضل) সুদ গণ্য হবে না, কারণ প্রয়োজন (জরুরত) ও কল্যাণ (মাসলাহাত)। প্রতিবেশীদের মধ্যে সাধারণভাবে হাতের আন্দাজে তৈরী সামগ্রীর বিনিময় চলতে থাকে যাতে সামান্য হেরফের স্বাভাবিক। এ সামান্য ব্যাপারে কড়াকড়ি সামাজিক জটিলতা সৃষ্টি করবে। তাই ইস্‌তিহ্‌সানের চাহিদায় কিয়াস পরিত্যক্ত হবে।

যদি এই ধরনের জিনিসের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তাহলে লোকেরা অনবরত অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং তাদের প্রয়োজন পূর্ণ হবে না। সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে যেসব জিনিসের প্রচলন রয়েছে এবং যেগুলোর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করলে তাদের নানান সংকট ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় সেসব জিনিস এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা এভাবে হানাফী ফকীহগণ ইস্‌তিহ্‌সান পদ্ধতি ব্যবহার করে ইসলামী ফিক্‌হের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেদমত করেছেন। এভাবে তাঁরা সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন এবং দেশীয় ও জাতীয় কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধার সাথে ইসলামী ফিক্‌হকে সামঞ্জস্যশীল করেছেন। অবশ্য তাঁরা কোনো হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেননি।

নিষিদ্ধ বস্তুও কখনো মুবাহ্ হয়

কোনো কোনো প্রয়োজন এবং কল্যাণ এমনো হতে পারে যাতে নিষিদ্ধ বস্তুও মুবাহ বা হালাল হয়ে যায়। ফকীহগণ নিম্নোক্ত নীতি নির্ধারণ করেছেন :

الضرورات تبيح المحظورات

"প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকেও মুবাহ্ করে দেয়।"

لا ضرر ولا ضرار

"ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা, ক্ষতিগ্রস্ত করোনা।"[৩৩]

الضرر يزال

"ক্ষতি দূর করা উচিত।"

অনুরূপভাবে এ নিয়মগুলোও প্রণিধানযোগ্য :

الضرر لا يزال بالضرر

"কোন ক্ষতিকে অন্য এক ক্ষতির মাধ্যমে দূর করা যায় না।"

المشقة تجلب التيسير

"কষ্ট সহজ উপায় সন্ধান করে।"

৩৩. শারহে সীয়ারে কাবীর, পৃ. ৩২১

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত নীতিগুলোর প্রয়োগ হবে প্রয়োজনের অনুপাতে, তার বেশী নয়। যেমন, দাই সন্তান প্রসব করানো ব্যাপারে এবং চিকিৎসক চিকিৎসার অপরিহার্য প্রয়োজনে যতটা আবশ্যক ততটা সতর[৩৪] অনাবৃত করার অনুমতি পাবে, যেমন প্রয়োজনের আকৃতির ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ বলেন :

الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة

"যরূরত-এর ভিত্তিতে যে হুকুম দেয়া হবে, তা যরূরতের নিরিখে হতে হবে।"

অনুরূপভাবে প্রয়োজন এবং কল্যাণ ও সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে যেসব বিধান দেয়া হবে, অবস্থা ও কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে যখন প্রয়োজন এবং কল্যাণের ধারণা ও সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন সে বিধানগুলোও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন :

"অনেক মাসআলা এমন আছে, যামানার অবস্থা ও মাস্‌লাহাতের প্রেক্ষিতে যেগুলোর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছিল কিন্তু পরে না সেই যামানার লোকেরা থাকে আর না সেই অবস্থা ও মাস্‌লাহাত বর্তমান থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে অবস্থা ও মাস্‌লাহাতের পরিবর্তনের ফলে বিধানের মধ্যে পরিবর্তন অনিবার্য হয়। কারণ পরিবর্তন না করা হলে লোকেরা কষ্ট ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হয় এবং এভাবে উপকার অর্জন ও ক্ষতি দূরীকরণ ভিত্তিক আল্লাহ্‌র হিকমতের বিরুদ্ধাচরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠবে।"

ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে এমন বহু মাসাআলা রয়েছে যেখানে এইসব মাস্‌লাহাত ও প্রয়োজনের পরিবর্তন ফকীহ্‌গণের মতভেদের বৃহত্তম কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন ও মাস্‌লাহাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে আল্লামা শাতিবীর নিম্নোক্ত নীতিটি অপরিহার্য :

أن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك لا من حيث إدراك المكلف

"মাস্‌লাহাত-এর বিবেচনা হবে শরীয়া প্রণেতার দর্শন অনুযায়ী (তাঁর হিকমত অনুযায়ী); মুকাল্লাফ[৩৫]-এর অনুভূতি অনুযায়ী নয়।"

এ প্রসঙ্গে কোন কোন ফকীহ্‌ নিম্নরূপ মন্তব্যও করেন :

المراد بالمصالح والمفاسد ما كانت كذالك فى نظر الشرع لا ما كان ملائما اومنافرا الطبع

"কল্যাণ ও অকল্যাণ বলতে যা বোঝান হয় তা হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে যা কল্যাণ ও অকল্যাণ তাই। ব্যক্তির প্রকৃতিগত ধ্যান-ধারণার আনুকূল্য অথবা প্রতিকূলতার বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল হবে না।"

---

৩৪. ستر = ঢেকে রাখা।

৩৫. مكلف = শরীয়ত অনুসরণের দায়িত্ব যার উপর অর্পিত।

www.pathagar.com

কিয়াস ভিত্তিক ইস্‌তিহ্‌সানের বিবরণ

কিয়াসী ইস্‌তিহ্‌সান (قياسى استحسان) হচ্ছে- যদি সুস্পষ্ট কিয়াসের ভিত্তিতে যা হুকুম বা বিধান হওয়া উচিত তদনুযায়ী কাজ করা কঠিন অথবা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় সে অবস্থায় সে কিয়াসের বিপরীত হুকুম দেয়া এবং তার উপায় হচ্ছে- উদ্ভূত ব্যাপারটির গভীরে গিয়ে সূক্ষ্মতর দিক বের করা এবং এই প্রচ্ছন্ন দিকটির বিবেচনায় হুকুম বা বিধান দান করা। ফকীহগণের পরিভাষায় একে বলা হয় 'কিয়াসে খাফী' বা অস্পষ্ট কিয়াস। যেহেতু এক্ষেত্রে দু'টি কিয়াসের মধ্যে বিরোধ বাধে এবং যুক্তির ভিত্তিতে একটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাই তাকে ইস্‌তিহ্‌সানও বলা হয়।

ফকীহগণের মতে আসল বিবেচ্য হচ্ছে যুক্তির ('ইল্লাত) প্রভাবের শক্তির ও নির্ভুলতার, সুস্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার নয়। একারণে ইস্‌তিহ্‌সানের প্রাধান্যমূলক অবস্থা সেখানেই হতে পারবে যেখানে অস্পষ্ট যুক্তি তার নিজ প্রভাব গুণে সুস্পষ্ট যুক্তির (কিয়াসে জলী) মোকাবেলায় বেশী নির্ভুল ও শক্তিশালী হবে। আর যদি এমন না হয় বরং সুস্পষ্ট যুক্তিই যদি অস্পষ্টের মোকাবিলায় প্রভাবের দিক দিয়ে বেশী নির্ভুল ও শক্তিশালী প্রমাণিত হয়, তাহলে কিয়াসই অগ্রগণ্য হবে। এ অবস্থায় ইস্‌তিহ্‌সান শব্দটির ব্যবহার হয় শুধু অস্পষ্টতার কারণে।

কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সানের মোকাবিলা যুক্তির শক্তির দিক দিয়ে হলে তা চার প্রকারে বিভক্ত হয় :

(এক) কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সান উভয়ই শক্তিশালী হয়;

(দুই) উভয়ই দুর্বল হয়;

(তিন) কিয়াস শক্তিশালী ও ইস্‌তিহ্‌সান দুর্বল হয়;

(চার) ইস্‌তিহ্‌সান শক্তিশালী ও কিয়াস দুর্বল হয়।

এ অবস্থায় যার মধ্যে শক্তি পাওয়া যাবে সেটিই প্রাধান্য লাভ করবে। কাজেই নিয়ম অনুযায়ী কেবলমাত্র চতুর্থ প্রকারের ইস্‌তিহ্‌সানকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে, পাখিদের উচ্ছিষ্ট। একথা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ফিক্‌হের কিতাবে সাধারণত ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর এ কথাটি দেখা যায় :

انا أخذنا بالاستحسان وتركنا القياس

"আমরা কিয়াস ত্যাগ করে ইস্‌তিহ্‌সান গ্রহণ করেছি।"

এথেকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই চতুর্থ আকৃতিটিই ধরা হয়। অর্থাৎ ইস্‌তিহ্‌সানের প্রভাব শক্তিশালী এবং কিয়াসের প্রভাব দুর্বল হবার কারণে কিয়াস ত্যাগ করে ইস্‌তিহ্‌সানকে কার্যকর করা হয়। অবশিষ্ট উল্লিখিত তিনটি আকৃতির মধ্যে প্রথম ও

www.pathagar.com

তৃতীয়টিতে প্রাধান্যের কারণটিতে হয়তো দুর্বলতার কারণে কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সান কোনোটিই বিবেচ্য হবে না আবার হয়তো চিহ্ন ও আলামতের কারণে কোনো একটির প্রাধান্য লাভের পরিবেশ সৃষ্টি করে নেয়া হবে।

কিয়াস ও ইস্‌তিহ্‌সানের মোকাবেলা যখন যুক্তির নির্ভুলতার দিক দিয়ে হয় তখন তাও চার প্রকারে বিভক্ত হয় :

(এক) ইস্‌তিহ্‌সান ও কিয়াস উভয়ের ভিতর-বাহির নির্ভুল হবে;
(দুই) উভয়ের ভিতর-বাহির ভুল হবে;
(তিন) কিয়াসের বাহিরটা ভুল এবং ইস্‌তিহ্‌সানের ভিতরটা নির্ভুল হবে;
(চার) ইস্‌তিহ্‌সানের ভিতরটা ভুল কিয়াসের বাহিরটা নির্ভুল হবে।

চার প্রকারের কিয়াসকে চার প্রকারের ইস্‌তিহ্‌সানের সাথে গুণ দিলে ষোল প্রকারে পরিণত হয়। কিন্তু যে কিয়াসের ভিতর-বাহির সবই নির্ভুল হয় তা সকল প্রকারের ইস্‌তিহ্‌সানের ওপর (নির্ভুলতার দিক দিয়ে) অগ্রগণ্য হবে। আর যে কিয়াসের ভিতর-বাহির সবই ভুল হয় তা গৃহীত হবে না। অনুরূপভাবে যে ইস্‌তিহ্‌সানের ভিতর-বাহির নির্ভুল হয় তা এমন কিয়াসের ওপর অগ্রগণ্য হবে যার বাহির নির্ভুল। আর যে ইস্‌তিহ্‌সানের ভিতর-বাহির সবই ভুল হয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে। এরপর বৈপরীত্যের মাত্র চারটি অবস্থা বর্তমান থাকে :

এক. ইস্‌তিহ্‌সানের বাহির নির্ভুল ও ভিতর ভুল এবং কিয়াসের বাহির ভুল ও ভিতর নির্ভুল;

দুই. ইস্‌তিহ্‌সানের বাহির ভুল ও ভিতর নির্ভুল এবং কিয়াসের ভিতর ভুল ও বাহির নির্ভুল;

তিন. ইস্‌তিহ্‌সানের বাহির নির্ভুল ও ভিতর ভুল এবং কিয়াসের বাহির নির্ভুল ও ভিতর ভুল;

চার. ইস্‌তিহ্‌সানের ভিতর নির্ভুল ও বাহির ভুল এবং কিয়াসের ভিতর নির্ভুল ও বাহির ভুল।

এখানে কেবলমাত্র দ্বিতীয় অবস্থায় ইস্‌তিহ্‌সান অগ্রাধিকার লাভ করবে এবং বাকি অন্য তিনটি অবস্থায় কিয়াস অগ্রগণ্য হবে।

কিয়াসী ইস্‌তিহ্‌সানের উদাহরণ

১. এক ব্যক্তি একজনের কাছে কোনো জিনিস আমানত রেখে কোথাও চলে গেলো। অন্য এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি তার উকিল[৩৬], আমাকে আমানত ফেরত দাও। আমীন (যার কাছে আমানত আছে)

---

৩৬. وكيل = প্রতিনিধি।

www.pathagar.com

বিশ্বাস করলো, সত্যিই সে প্রথম ব্যক্তির উকিল। এ অবস্থায় কিয়াসের দাবী হচ্ছে, সে ঐ আমানত উকিলের হাতে সোপর্দ করবে। যেমন ঋণের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি যখন নিজেকে ঋণ আদায়ের উকিল হিসেবে পেশ করে এবং ঋণগ্রহীতা তার দাবীর সত্যতা মেনে নেয় তখন ঋণের প্রাপ্য তার হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়। কিন্তু ইস্‌তিহ্‌সান এই ঋণের প্রাপ্য উকিলের হাতে সোপর্দ না করার দাবী করে। এই দু'টি অবস্থার মধ্য অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে : যে ব্যক্তি আমানতের মালিক তার অধিকার যে জিনিসটি আমানত রেখেছিল ঠিক সে জিনিসটির সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে যে জিনিসটি আমানত রেখেছিল, হুবহু তাই ফেরত দিতে হয়। তার পরিবর্তে অন্য কোনো জিনিস দিলে এমন একটি জিনিস ফেরত দেয়া হয় যার সাথে আমানতকায়ার অধিকারের সম্পর্ক ছিল না।

বিপরীতপক্ষে, ঋণ সম্পর্কে বলা যায়, ঋণদাতার অধিকার হুবহু সেই অর্থের বা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত নয় যা ঋণ বাবদ দেয়া হয়েছে। বরং ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের দায়িত্বই তার অধিকারের ক্ষেত্র। কাজেই যে অর্থের বা বস্তুর মাধ্যমেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করবে ঋণদাতার অধিকার তার সাথেই সম্পর্কিত হয়ে যাবে এবং ঋণ আদায় সঠিক হবে।

মনে করুন, উল্লিখিত অবস্থায় ঋণদাতা এসে যদি বলে, “আমি ঐ ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করিনি, কাজেই আমার সম্পদ পূর্ববৎ তোমার কাছে আছে।” তাহলে এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ সে নিজেই উকিলের কথার সত্যতা মেনে নিয়েছিল এবং ঋণ ফেরত দিয়েছিল। ঋণের ক্ষেত্রে তো ক্ষতিপূরণ বা অর্থদণ্ডে কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে। কিন্তু আমানতের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিলে তার অধিকার ক্ষতিপূরণের সাথে অর্থাৎ বদলে যা আদায় করা হচ্ছে তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যাবে, অথচ তার অধিকারটি যথার্থ আমানতের সাথে সম্পর্কিত ছিল, তার বদলের সাথে নয়। এই জটিলতা এড়াবার জন্য কিয়াস পরিহার করে ইস্‌তিহ্‌সানের আশ্রয় নিতে হবে এবং হুকুম হবে-আমানত উকিলের হাতে সোপর্দ করা যাবে না।

২. ঋণদাতার কাছে ঋণের জামানত (ضمانة) বাবদ কোন জিনিস রাখা আছে। ধরুন, ঋণদাতা ঋণের অর্থ মাফ করে দিয়েছে কিন্তু জামানতের জিনিস এখনো ফেরত দেয়নি এমন অবস্থায় তা তার কাছে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কিয়াসের দাবী হচ্ছে, ঋণদাতা তার ক্ষতি পূরণ দেবে। তাই যদি হয় তা হলে ঋণগ্রহীতা অত্যধিক লাভবান হচ্ছে, ঋণ শোধ করতে হলো না অথচ জামানতের ক্ষতিপূরণ পাওয়া

www.pathagar.com

গেল। আর বেচারা ঋণদাতা ঋণ বাবদ একটি পয়সাও নিলো না, উল্টো ক্ষতিপূরণ চাপলো তার উপর।

এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঋণগ্রহীতা তার ঋণবাবদ আদায়কৃত অর্থ ফেরত নিয়ে নেবে এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া বন্ধকী জিনিস মূল ঋণের প্রতিবদল হয়ে যাবে (যখন তা সমান সমান হবে)। কিন্তু মাফ করে দেবার অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ এ অবস্থায় ঋণদাতাকে দ্বিবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কারণ সে ঋণও মাফ করে দেয় আবার ক্ষতিপূরণও তার ঘাড়ে চাপে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা দ্বিবিধ লাভের ভাগী হয়। তার ঋণও মাফ হয়ে যায় আবার ক্ষতিপূরণও পায়। বিপরীতপক্ষে ঋণ আদায় করে দেবার অবস্থায় যদি ক্ষতিপূরণ না দেয়ানো হয় তাহলে ঋণগ্রহীতা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ সে ঋণও আদায় করে দেয় আবার বন্ধকী জিনিসও হাত ছাড়া হয়। এ অবস্থায় ঋণদাতা লাভবান হয়। কারণ সে নিজের ঋণ আদায় করে নিয়েছে এবং যে জিনিসটি বিনষ্ট হয়েছে তা তার নিজের নয় অন্যের।

এই ক্ষতি থেকে ঋণদাতা, যে ঋণ মাফ করে দিয়েছে তাকে রক্ষা করার জন্য ফকীহগণ ইস্তিহ্সানের আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ তাকে দেওয়া জামানতের মালকে আমানত গণ্য করেছেন। সংরক্ষণ ব্যবস্থায় কোনো প্রকার ত্রুটি ছাড়াই যদি এই জামানতের জিনিস নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

সারকথা হচ্ছে, ফকীহগণ সুস্পষ্ট কিয়াসের ন্যায় অস্পষ্ট কিয়াস (ইস্তিহ্সান) থেকেও মাসায়েল নির্ধারণ করে থাকেন এবং একে কিয়াসেরই একটি শ্রেণী বলে অভিহিত করেন। সুস্পষ্ট কিয়াসের ক্ষেত্রে যেমন একই 'ইল্লাতের কারণে এক হুকুম অন্যের ওপর লাগানো হয়, ঠিক তেমনি ইস্তিহ্সানে যে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও সুন্নাতের বিষয় 'ইল্লাতে পরিণত হয় সেখানেও একই 'ইল্লাতের ক্ষেত্রে একের হুকুম অন্যের জন্যও প্রমাণ করা হয়।

ইস্তিহ্সানের বিরোধিতা

ইমাম শাফেঈ রহ. ইস্তিহ্সানের বিরোধিতা করেন এবং বলেন :

من استحسن فقد شرع اى وضع شرعا جديدا

"যে ব্যক্তি ইসতিহ্সানের সাহায্য গ্রহণ করে সে নতুন শরীয়ত তৈরী করে"[৩৭]

অথচ হানাফী ফকীহগণ ইস্তিহ্সানকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে ফিক্হের বিরাট খেদমত করেছেন। ইস্তিহ্সানভিত্তিক হানাফী ফকীহদের বিধান গুলোতে তাদের গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম অনুধাবন ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাম্বলীগণও ইস্তিহ্সানকে শরীয়ত বিধানের অন্যতম উৎস রূপে ব্যবহার

৩৭. মিনহাজুল উসূল, আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর-এর ফুটনোট, পৃ. ১৭২

www.pathagar.com

করেন। ইমাম মালিক রহ. এবং মালিকী ফকীহগণ ইস্‌তিহ্‌সানের ব্যবহার করেছেন সামান্য মতপার্থক্য সহকারে।

একদিকে রয়েছে ইমাম শাফেয়ীর রহ. এ উক্তি কিন্তু অন্যদিকে উপরে উল্লিখিত ইস্‌তিহ্‌সানের তাৎপর্যের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান নির্ণয় করার দৃষ্টান্তও তাঁর ওখানে পাওয়া যায়। এথেকে একথা প্রমাণ হয়, মূলত সমস্যা ও জটিলতা দূর করার জন্য চাহিদা ও সুবিধা অনুযায়ী কাজ করা এমন সব অপরিহার্য বিষয় যা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। বস্তুত এছাড়া বাস্তব জীবন পরিচালনা করাও সম্ভবপর নয়। এরপরও ইমাম শাফেয়ী রহ. একথা কেন বলেছেন তা অনুধাবন করা কঠিন। সম্ভবত 'ইস্‌তিহ্‌সান' শব্দটির মধ্যে মানবিক ঝোঁক প্রবণতা ও ইচ্ছাশক্তির আমেজ রয়েছে, তাই কোনো কোনো মনীষী এই শব্দটিকে স্থায়ী নীতির পর্যায়ভুক্ত করা পছন্দ করেননি। এছাড়া তাঁর রচিত কিতাবগুলোতেও আর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এ কারণেই শাফেয়ী বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন :

أن الحق ما قاله ابن الحاجب، وأشار إليه الآمدي أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه

"ইবনে হাজেব যে কথাটি বলেছেন সেটিই যথার্থ সত্য কথা। আমেদীও সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ দ্বিমত সম্বলিত ইস্‌তিহ্‌সানের অস্তিত্ব নেই।"[৩৮]

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ.-ও ইস্‌তিহ্‌সানের বিরোধিতা করেছেন। তিনি ইস্‌তিহ্‌সানকে "তাহরীফ ফিদ-দীন"[৩৯] বলে আখ্যায়িত করেছেন। সম্ভবত উপর্যুক্ত দুই মনীষী অপব্যবহারের আশঙ্কায় বিরোধিতা করেছেন। শাহ সাহেবের নিম্নোক্ত বাক্য তার মনে এরূপ আশঙ্কার অর্থাৎ বেপরোয়া ইস্‌তিহ্‌সান প্রয়োগের আশঙ্কার ইঙ্গিত মিলে :

فيختلس بعض ما ذكرنا من أسرار التشريع ، فيشرع للناس حسبما عقل من المصلحة

"আমরা শরীয়তের যে নিগূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করেছি (কোনো লোক) তার মধ্য থেকে কোনোটিকে (অসৎ উদ্দেশ্যে) লুফে নেবে এবং তার বুদ্ধি অনুযায়ী কোনো মাস্‌লাহাত দাঁড় করিয়ে লোকদের জন্য বিধান দান করবে (তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করবে)।"[৪০]

আসলে ইস্‌তিহ্‌সানকে বাদ দিলে ইসলামী জীবনের নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়বে, ইসলামী শরীয়তে আড়ষ্টতা এসে যাবে।

---

৩৮. মিনহাজুল উসূল, ফুটনোট, আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, পৃ. ১৭২

৩৯. تحريف في الدين = দীনের বিকৃতি।

৪০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খ. ১, পৃ. ১২০

www.pathagar.com

ইস্‌তিস্‌লাহ্‌ বা মাসালিহে মুরসালা : ফিক্‌হের ষষ্ঠ উৎস

ইস্‌তিস্‌লাহ্‌-এর সংজ্ঞা (বিবিধ) (استصلاح– مصالح مرسلة)

ফকীহ্‌গণের পরিভাষায়, নিছক প্রয়োজন ও সুবিধার ভিত্তিতে আহ্‌কাম উদ্ভাবন করার নাম ইস্‌তিস্‌লাহ্‌ বা মাসালিহে মুরসালা। ফকীহ্‌গণের ভাষায় তা হচ্ছে :

بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة

"বিবিধ মাস্‌লাহাত-এর চাহিদার ওপর ফিক্‌হী আহ্‌কামের ভিত্তি স্থাপন।"

ফকীহ্‌গণের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে মাসালিহে মুরসালা-এর ধারণা সুস্পষ্ট হয় :

> المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد لها أصل شرعي من نص أو إجماع، لا بالاعتبار ولا بالإلغاء
>
> "মাসালিহে-মুরসালা বলতে বোঝায় এমন সব ব্যাপার যার বিবেচনার পক্ষে শরীয়তের কোনো 'আস্‌ল' (মৌলনীতি) সাক্ষ্য দেয় না এবং যাকে নাকচ করার পক্ষেও সাক্ষ্য দেয় না, অথচ সুস্থবুদ্ধি ব্যাপারগুলোকে গ্রহণ করে।"[১]

ফকীহ্‌গণের অন্য একটি বক্তব্য নিম্নরূপ :

> المصالح المرسلة وهى التى لم يشهد لها اصل شرعى من نص او اجماع لا بالاعتبار ولا بالالغاء
>
> "মাসালিহে-মুরসালা এমনসব ব্যাপার যার বিবেচনার পক্ষে শরীয়তের কোন মৌলনীতি, তা নস (কুরআন বা হাদীসের কোন স্পষ্ট দলীল) হোক কিংবা ইজমা' যেমন সাক্ষ্য দেয় না; নাকচ করে দেয়ার পক্ষেও সায় দেয় না।"[২]

প্রয়োজন ও কল্যাণের ভিত্তিতে ইস্‌তিহ্‌সানে যেভাবে হুকুম উদ্ভাবন করার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে ইস্‌তিস্‌লাহ্‌-এ তার পরিসর আরো ব্যাপক। অন্যকথায়, ইস্‌তিহ্‌সান অপেক্ষা ইস্‌তিস্‌লাহের ক্ষেত্র ব্যাপকতর। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে আবার ইস্‌তিহ্‌সান ব্যাপকতার অধিকারী। কারণ তার মধ্যে রয়েছে কিয়াসে খাফী অর্থাৎ অস্পষ্ট কিয়াসের দৃষ্টিকোণ। আর এদিক দিয়ে ইস্‌তিস্‌লাহ্‌ বিশেষ ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত। কারণ তার মধ্যে কেবল প্রয়োজন ও সুবিধার দৃষ্টিকোণ সক্রিয় থাকে।

---

১. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ১, পৃ. ৩৯, টিকা দ্র.

২. মিনহাজুল উসূল

www.pathagar.com

মাসালিহে মুরসালার শর্তাবলী

ফকীহগণ মাসালিহে মুরসালাহকে কাজে লাগাবার জন্য অর্থাৎ ইস্‌তিস্‌লাহের ভিত্তিতে বিধান দানের জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী নির্ধারণ করেছেন :

১. শরীয়তে যেসব মাসালিহের বিবেচনার ব্যবস্থা রয়েছে, ইস্‌তিস্‌লাহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য মাসালিহগুলো সামঞ্জস্যশীল হতে হবে, অর্থাৎ কুল্লিয়াতে খামস-এর প্রয়োজনগুলোর মধ্য থেকে কোনোটির সাথে তাদের সাদৃশ্য থাকতে হবে।

২. যে মাস্‌লাহাত-এর বিবেচনায় ইস্‌তিস্‌লাহ নীতির ভিত্তিতে বিধান দেয়া হচ্ছে তা অর্জনের নিশ্চয়তা (قطعية) থাকতে হয়, অনিশ্চিত কল্যাণের সম্ভাবনা দৃষ্টে ইস্‌তিস্‌লাহ চলবে না।

৩. এই মাসালিহ-কে হতে হবে দেশ ও জাতির ব্যাপক বা সামগ্রিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত।

নিম্নোক্ত বাক্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় :

> كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه
>
> "শরীয়তের কোন নীতি, যার সাক্ষ্য কোন নস-এ পাওয়া যায় না, অথচ তা শরীয়তে প্রবর্তিত বিধানগুলোর সাথে খাপ খায় বা অনুকূল হয়, যে নীতির মর্মকথা শরীয়তের দলীল-প্রমাণাদি থেকে গৃহীত হয়, সে নীতির ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবন (استصلاح) চলবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ জায়েয।"[৩]

একটি উদাহরণ

যেমন ধরুন, ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধে শত্রুপক্ষ মুসলিম বন্দীদেরকে অগ্রদল (Vanguard) হিসেবে সামনে দাঁড় করিয়ে দিল এবং একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এই মুসলিম বন্দীদের ওপর আক্রমণ না চালালে শত্রুপক্ষকে হটানো অসম্ভব হবে, ফলে শত্রুপক্ষ বিজয়ী হবে, মুসলিম বাহিনীর সমূহ বিপর্যয় সুনিশ্চিত হবে। মুসলিমের রক্তপাত হারাম হওয়া সত্ত্বেও এই সংকটাবস্থায় মুসলিম বন্দীদেরকে কতল করা অপরিহার্য হবে। যেহেতু সাধারণ মাস্‌লাহাত এবং দীন ও মিল্লাতের হেফাজতের সাথে এর সম্পর্ক, তাই এক্ষেত্রে মুসলিম হত্যাকে বৈধ গণ্য করা হয়েছে।

আর একটি উদাহরণ অবশ্য সবার নয়-কোনো কোনো ফকীহের মতে কুরআন ও হাদীসকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করাও হয়েছে ইস্‌তিস্‌লাহ নীতিতে (খোদ রসূলুল্লাহ

---

৩. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ১, পৃ. ৩৯

www.pathagar.com

স. তা করেননি বা স্পষ্ট বাক্যে আদেশ দেননি)। সর্বজনীন কল্যাণ (মাস্‌লাহাত)-এর সুনিশ্চিত সম্ভাবনার ধারণা থেকে এ কাজটি করা হয়েছে।

ফলকথা, মাসালিহে মুরসালার ভিত্তিতে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান সহজ হয়। কিন্তু এই মাস্‌লাহাতগুলো অনুধাবন করা এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য যথারীতি 'ইল্লাতের সন্ধান করা গবেষণাসাপেক্ষ। এপথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এর অনেকটা বিবরণ আগের আলোচনায় এসে গেছে। মাসালিহে মুরসালাকে অনুধাবন করার সাথে 'ইল্লাতের যে অংশটুকুর সম্পর্ক সেটির বর্ণনা নিচে দেয়া হচ্ছে।

মাসাহিলে মুরসালার সাথে সম্পর্কিত 'ইল্লাতের বিবরণ

ফকীহগণের মতে উপযোগী 'ইল্লাত চার প্রকারের :

১. প্রভাবশালী
২. মালায়েম
৩. গারীব ও
৪. মুরসাল

এক. মূল হুকুমে যে 'ইল্লাতের প্রভাব প্রমাণিত হয় তাকেই বলা হয় প্রভাবশালী 'ইল্লাত। অর্থাৎ যথার্থ 'ইল্লাত সংশ্লিষ্ট হুকুমে যথার্থ 'ইল্লাতের ওপর নির্ভর করা হয়। যেমন বিড়ালের উচ্ছিষ্টের ওপর তার বারবার গৃহাভ্যন্তরে চলাফেরার প্রভাব স্বীকৃত হয়।

দুই. উদ্ধৃত 'ইল্লাতসমূহের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যে 'ইল্লাত বানানো হয় তাকে মালায়েম 'ইল্লাত বলে। এর কয়েকটি রূপ নিচে পেশ করা হলো :

(ক) যখন হুকুমের শ্রেণীর মধ্যে 'ইল্লাত নির্ভরতা প্রমাণিত হয়। যেমন, বিবাহের হুকুমের ক্ষেত্রে কম বয়সের প্রতি নির্ভরতা সম্পদের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়।

(খ) 'ইল্লাতের শ্রেণীর প্রতি নির্ভরতা যথার্থ হুকুমের মধ্যে প্রমাণিত হয়। যেমন, সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়াটা পাগলামীর শ্রেণীভুক্ত। এরি ভিত্তিতে পাগলের জন্য নামায মাফ হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়।

(গ) 'ইল্লাতের শ্রেণীর প্রতি নির্ভরতা হুকুমের শ্রেণীর মধ্যে প্রমাণিত হয়। যেমন, সফরের কষ্ট মেয়েদের 'ওযর' এর দিনগুলোর শ্রেণীভুক্ত। মুসাফিরের নামায দু'রাকাত কম হয়ে যাওয়া যেহেতু এর ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং সম্পূর্ণ নামায মাফ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এই শ্রেণীভুক্ত, তাই এক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করা হবে।

www.pathagar.com

এই ধরনের 'ইল্লাতের ক্ষেত্রে 'ইল্লাত হুকুম থেকে দূরে অবস্থান করে না। বরং কাছে অবস্থান করে। তার সাথে হুকুমের সম্বন্ধ সঠিক হয়। কিন্তু কিতাব, সুন্নাত বা ইজমা' থেকে সরাসরি নির্ভরতা প্রমাণ হয় না। যেহেতু এর সাথে সামঞ্জস্যশীল অন্যান্য 'ইল্লাতের জন্য কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা' হুকুম সংযোজিত থাকে এবং শরীয়ত তার ওপর নির্ভরও করে তাই একে মালায়েম (সামঞ্জস্যশীল) বলে।

তিন. এমন ধরনের 'ইল্লাতকে গারীব বলা হয়, যার মালায়েমের উপরে উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতির মধ্য থেকে কোনোটির সাথে নির্ভরতা প্রমাণিত হয় না। বরং শরীয়ত প্রণেতা থেকে শুধুমাত্র যথার্থ 'ইল্লাতের নির্ভরতা যথার্থ হুকুমের মধ্যে বর্তমান থাকে। যথার্থ 'ইল্লাতের নির্ভরতা হুকুমের শ্রেণীর মধ্যে প্রমাণিত হলে চলবে না। আবার শ্রেণীর নির্ভরতা যথার্থ হুকুম ও হুকুমের শ্রেণীর মধ্যে প্রমাণিত হলেও চলবে না। গারীবের উদাহরণ হচ্ছে হত্যা (হারাম কাজ ভ্রষ্ট উদ্দেশ্যে)। কারণ এটি হত্যাকারীর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবার 'ইল্লাত। কিন্তু অন্য কোনো দিক দিয়ে এর আর কোনো নির্ভরতা প্রমাণিত নয়। কাজেই এর ভিত্তিতেই যে স্ত্রীকে তার স্বামী মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে থাকার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তালাক দেয় এবং সে ইদ্দত পালন করছিল এমন সময় ঐ স্বামী মারা যায়, এক্ষেত্রে হত্যাকারীর ওপর কিয়াস করে ঐ স্ত্রীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত নয় বলে গণ্য করা হবে।

এই ধরনের 'ইল্লাতের মধ্যে সাধারণত গুণবিহীন ও হুকুমবিহীন 'ইল্লাত হয়। এই ধরনের 'ইল্লাত আবার কোনো কোনো ফকীহের মতে জায়েয নয়। এ কারণে কোনো কোনো ফকীহ যথার্থ 'ইল্লাতের প্রতি নির্ভরতাকে অস্তিত্ববিহীন গণ্য করে গারীবের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন নিম্নোক্তভাবে :

মালায়েমের উল্লিখিত তিনটি পদ্ধতির মধ্য থেকে কোনো একটি পদ্ধতির সাথে যে 'ইল্লাতের নির্ভরতা প্রমাণিত হয় তাকে গারীব বলে, যদিও প্রভাব ছাড়াই মূলের সাক্ষ্য বর্তমান থাকে।

কিন্তু গবেষক ফকীহগণের মতে এই সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। কারণ গণবিহীনতাকে হুকুমবিহীনতার 'ইল্লাত হবার দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে কয়েকবার উল্লেখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

চার. প্রভাবের দৃষ্টিতে বা সামঞ্জস্যশীলতার ওপর হুকুমের বিন্যাসের দৃষ্টিতে (যেমন উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের 'ইল্লাতের মধ্যে হয়ে থাকে) কুরআন, সুন্নাহ্ বা ইজমা' থেকে কোনোভাবেই যে 'ইল্লাতের নির্ভরতা প্রমাণিত হয় না এবং তাকে অর্থহীন ও বাতিল গণ্য করাও প্রমাণিত হয় না, তাকেই "মুরসাল" বলা হয়। আর অর্থহীন গণ্য করার উদাহরণ নিম্নরূপ :

যেমন, রমযানের রোযার কাফ্‌ফারা হচ্ছে গোলাম আযাদ করা এবং লাগাতার ৬০ দিন রোযা রাখা উভয়টিই। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, গোলাম আযাদ করার তুলনায় রোযার মধ্যে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণের বিষয় অনেক বেশী আছে। এ সত্ত্বেও শরীয়ত প্রণেতা গোলাম আযাদ করাকে রোযা রাখার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়, যে ব্যক্তির গোলাম আযাদ করার ক্ষমতা আছে তার জন্য রোযার এই গুণাবলী (ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ) অর্থহীন। মোটকথা শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে যেসব গুণকে (অর্থাৎ মাসালিহ, যা 'ইল্লাতে পরিণত হয়) অর্থহীন গণ্য করার প্রমাণ নেই এবং যেগুলোর ওপর নির্ভর করারও কোনো প্রমাণ নেই সেগুলোকেই মুরসাল বলা হয়।

ইসতিসলাহ্-এর ব্যাপারে ফকীহ্ ইমামগণের অবস্থান

ইমাম মালিক রহ.-এর প্রতি ইস্‌তিস্‌লাহ্-এর আরোপ

ফিক্‌হ ও উসূলবিদগণের মধ্যে ইমাম মালিক রহ. অত্যন্ত ব্যাপকভাবে মাসালিহে মুরসালার ভিত্তিতে ইস্‌তিস্‌লাহ নীতি ব্যবহার করেছেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি উপরোল্লিখিত শর্তাদি মেনে চলারও প্রয়োজনবোধ করেননি। এ কারণে সাধারণত তাকেই ইস্‌তিস্‌লাহ নীতির উদ্ভাবক বলা হয়। যদিও অধিকাংশ ফকীহ্ এই নীতির যথার্থতা স্বীকার করেন বা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

ইস্‌তিস্‌লাহের ব্যাপারে ইমাম মালিক রহ.-এর যুক্তি বেশী শক্তিশালী। তিনি বলেন :

১. শরীয়ত প্রণেতা সমগ্র হুকুমের ক্ষেত্রে সাকুল্যে মাসালিহের বিবেচনা করেছেন। মানবের পক্ষে সার্বিক কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ রোধের উদ্দেশ্যে-মাস্‌লাহাতের বিবেচনা ব্যতিরেকে শরীয়তের কোনো হুকুম প্রবর্তিত হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় মাস্‌লাহাত-এর বিচার-বিবেচনা একটি সার্বিক নীতি।

২. প্রাথমিক অবস্থায় বিধান উদ্ভাবন করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাঁরা সবক্ষেত্রে মাসালিহের বিবেচনা করতেন, বেশী

www.pathagar.com

বিতর্ক-আলোচনায় লিপ্ত হতেন না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, কুরআন মাজীদ লিপিবদ্ধকরণ, খিলাফতের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কর্মের জন্য বিভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি, কারাগার স্থাপন, জুমআর নামাযের জন্য নতুন আযান (বর্তমানে যেটি প্রথম আযান)-এর প্রবর্তন এবং মসজিদে নববীতে স্থান সংকুলানের জন্য সন্নিহিত ভূমির ওয়াকফ-এর বিধান ইত্যাদি তাঁরা করেছিলেন নিছক মাস্‌লাহাতের বিবেচনায়। এ ব্যাপারগুলোর কোনো দৃষ্টান্ত বা নযীর তাদের সামনে ছিল না, কোন নসও ছিলো না। সুতরাং বলা যায়, মাস্‌লাহাতের বিবেচনায় বিধান উদ্ভাবনের ব্যাপারে সাহাবা রা-এর ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।[৪] এ কথা অনস্বীকার্য যে, সাহাবাগণ রা. রসূলুল্লাহ্ স.-এর সান্নিধ্য লাভ এবং সরাসরি তাঁরই কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে তাঁরা ছিলেন আহকামে শরীয়তের গুঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।

অন্য ইমামগণের যুক্তি

ইমাম মালিকের রহ. এই বক্তব্য যেসব ফকীহ্ গ্রহণ করেননি তাদের প্রত্যেকেই এর প্রত্যেকটির জবাব দিয়েছেন। তাদের জবাবগুলো তাদের কিতাবসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। সেগুলোও যথাস্থানে অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও চরম সতর্কতার পরিচয় প্রদান করে। যেমন প্রথম অবস্থায় উল্লিখিত যুক্তির ভিত্তিতে সাধারণ মাস্‌লাহাতের ওপর নির্ভরতাকে বৈধ গণ্য করা হলে এর ওপর নির্ভর করে অর্থহীন গণ্য করার রূপটিও সামনে থাকতে হবে। কারণ নির্ভরশীল মাস্‌লাহাতের ওপর কিয়াস করে যেভাবে নির্ভর করা যেতে পারে ঠিক তেমনি তাকে অর্থহীনও গণ্য করা যেতে পারে (যেমন অন্যেরা অর্থহীন গণ্য করেন)। একথা স্পষ্ট, একই বস্তুর উভয় দিকে গ্রাহ্য হওয়া অবাস্তব ও অসম্ভব। আর সাহাবাগণের ব্যাপারে বলা যায়, তাঁরা সরাসরি ও পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়ত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং শরীয়তের বিধানের নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাপারে পারদর্শী ছিলেন। সম্ভবত তাঁরা প্রকরণ ও নিকট শ্রেণী ইত্যাদির ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতার নির্ভরতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং মাস্‌লাহাতকে তারা অন্তরভুক্ত গণ্য করে বিধান উদ্ভাবন করেছিলেন।

মোটকথা, প্রয়োজন ও মাস্‌লাহাতের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে ব্যাপকতা ও উদারতার নীতি অবলম্বন করার ব্যাপারটি অস্বীকার করা যেতে পারে না। যেসব ফকীহ্ এ নীতি মানেন না তাঁরাও কোনো না কোনো পর্যায়ে সাধারণ মাস্‌লাহাতকে স্বীকার করুন বা নাই করুন তাঁরাও মাস্‌লাহাত (তথা সুবিধা) অর্জন ও ক্ষতিকারক দূর করার পথ অবলম্বন করেন।

---

৪. মিনহাজুল উসূল, ফুটনোট, আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর, খ. ৩, পৃ. ১৩৯

www.pathagar.com

ফকীহগণের কার্যোদ্ধারের কৌশল

কোনো কোনো ফকীহ্ ইমাম মালিকের রহ. উদারনীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। যেমন ইমাম গাযালী রহ. ইস্‌তিহ্‌সান ও ইস্‌তিস্‌লাহ্ উভয়কে কাল্পনিক যুক্তি আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মাস্‌লাহাত ও প্রয়োজনের সামনে সবাই অস্ত্র সম্বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং কোনো না কোনো দূরবর্তী ব্যাখ্যার মাধ্যমে নির্ধারিত নিয়মের আওতাধীনে ইসলামী ফিক্‌হের কার্যক্রমকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন। যেমন ইমাম আবু হানীফার রহ. ইস্‌তিহ্‌সানকে এক ধরনের কিয়াস গণ্য করা হয়। এভাবে ইমাম মালিকের রহ. ইস্‌তিস্‌লাহ্‌কেও নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে এক ধরনের কিয়াসে পরিণত করা যেতে পারে। যেমন দুই প্রকার কিয়াসের উল্লেখ করা যায় :

১. বিশেষ কিয়াস ও
২. সাধারণ কিয়াস

এক. বিশেষ কিয়াস : 'ইল্লাতের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে উদ্ভূত সমস্যাবলীর হুকুম প্রমাণ করা।

দুই. সাধারণ কিয়াস : নির্বিশেষ মাস্‌লাহাতকে শরীয়ত প্রণেতার নির্ধারিত মাস্‌লাহাতসমূহের ওপর কিয়াস করে কেবলমাত্র মাস্‌লাহাতকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে হুকুম প্রমাণ করা।

ইমাম শাফেয়ীও রহ. যুক্তির জোরে কিয়াসকে আর একভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. **কিয়াসে জলী** : যেখানে পার্থক্যকারী গুণের অর্থহীন হওয়া জানা যায়। যেমন, কোনো হুকুম বিশেষ করে পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত হলে তার মধ্যে একথা প্রকাশ হওয়া যে, এক্ষেত্রে হুকুমের মধ্যে বিশেষত্ব দান উদ্দেশ্য নয় বরং নারী ও পুরুষ সবাই সমান।
২. **কিয়াসে খাফী** : যেখানে পার্থক্যকারীগণের অর্থহীন হওয়া জানা যায় না।

ইমাম আহমাদ রহ. প্রয়োজনের সময় যথাসম্ভব ইস্‌তিহ্‌সানের সাহায্য নেবার চেষ্টা করেছেন এবং তারপর ইস্‌তিস্‌লাহের সাহায্যে কার্যোদ্ধার করেছেন। বরং কোনো ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য থেকে প্রমাণ হয় ইমাম আহমদ রহ. ইমাম মালিকের রহ. চাইতেও বেশী ব্যাপকতা ও উদারতার আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকি তিনি মাসালিহে মুরসালাকে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র সাধারণ হুকুমের স্থান-কালের প্রেক্ষিতে বিশেষত্ব দানকারী গণ্য করেছেন। মোটকথা যাঁরা ইস্‌তিহ্‌সান ও ইস্‌তিস্‌লাক উৎস হিসেবে স্বীকার করেন না তাঁরা কিয়াসের আওতাধীনে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান করে থাকেন। এতে অবশ্য কিছুটা সংকীর্ণতা দেখা দেয়। কিন্তু কাজ থেমে থাকে না।

www.pathagar.com

মাসালিহে মুরসালাহ্‌ ব্যবহারের স্থান

সাধারণত সমাজ সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সাথে সম্পর্কিত বিভাগে বেশী করে মাসালিহে মুরসালাহ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। যেমন, আধুনিক চাহিদা অনুযায়ী আইন রচনা করা, স্থান-কালের প্রেক্ষিতে সেগুলো প্রবর্তন করার জন্য বিভিন্ন কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং শাস্তি নির্ধারণ করা ইত্যাদি। কখনো কখনো মাসালিহে মুরসালার প্রেক্ষিতে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাধারণ হুকুম বিরোধী হুকুম দেবারও অবকাশ থাকে। যেমন, পূর্বোল্লিখিত কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে ইসলামী মিল্লাতের হেফাজত ও স্থায়িত্বের স্বার্থে মুসলিমের রক্ত ঝরানো জায়েয করা হয়েছিল। কারণ এ ছাড়া শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করা ও তাদের ওপর বিজয় লাভ করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

ইস্‌তিদ্‌লাল : ফিক্‌হের সপ্তম উৎস

ইস্‌তিদ্‌লাল-এর সংজ্ঞা (استدلال)

দলীল (دليل) অনুসন্ধান করা বা তালাশ করা বা দলীল পেশ করা বা দলীলের সাহায্যে কোন কিছু প্রমাণ করা ইত্যাদি হচ্ছে ইস্‌তিদ্‌লাল এর শব্দগত অর্থ। ইসলামী ফিক্‌হের সপ্তম উৎস হচ্ছে এই ইস্‌তিদ্‌লাল। অনেক অবস্থায় একে ইস্‌তিস্‌লাহের চাইতেও বেশী ব্যাপক মনে করা হয়। কিন্তু ইজতিহাদ ও সমস্যার সমাধান নির্ণয়ের কোনো বিশেষ পদ্ধতির সাথে এর সম্পর্ক সীমাবদ্ধ নয়। বরং ফকীহগণ ইজতিহাদ করার জন্য যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তার প্রায় সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত।

ইস্‌তিদ্‌লালের কয়েকটি রূপ

ফকীহগণ ইস্‌তিদ্‌লালের নিম্নোক্ত কতিপয় রূপ বর্ণনা করেছেন :

এক : কল্যাণকর বস্তু মুবাহ এবং ক্ষতিকর বস্তু মূলত হারাম। এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হয় :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

"(হে রসূল!) বলে দাও, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব ভূষণ ও জীবিকা সৃষ্টি করেছেন সেগুলো কে হারাম করেছে ?"[১]

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"রসূল তাদের (উম্মতের) জন্য সব পবিত্র জিনিসকে হালাল করেন এবং সব অপবিত্র জিনিস হারাম করেন।"[২]

অবশ্য এই নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হবে যে ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' কোন বস্তুর বৈধতা বা অবৈধতা সম্বন্ধে ফায়সালা দান করার ব্যাপারে নিরব থাকে।

দুই : দু'টি হুকুমের মধ্যে সম্পর্ক বহাল থাকা (التلازم بين الحكمين)

কোনো বিশেষ 'ইল্লাত ছাড়াই একটি হুকুমকে অন্য হুকুমের সাথে সম্পর্কিত করা। এর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

---

১. সূরা আল-আ'রাফ : ৩২

২. সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৭

www.pathagar.com

ক. যে ব্যক্তি তালাক (طلاق) দিবার অধিকার প্রাপ্ত সে ঈলা (ایلاء) (কসম করে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদে স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করা) করবারও অধিকারী। তালাক এবং ঈলা উভয় কর্মের পরিণাম স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ অথবা সম্পর্ক পুনঃস্থাপন, এ দিক থেকে এ দু'টো ইতিবাচক হুকুমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

খ. নিয়ত ছাড়া তায়াম্মুম শুদ্ধ নয়। কাজেই অযুও নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। এ দু'টো নেতিবাচক হুকুমের মধ্যে تلازم বা বরাবরের সম্পর্ক হচ্ছে, দু'টোই আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য করা হয় এবং কতিপয় অবস্থায় তায়াম্মুম অযুর স্থলাভিষিক্ত হয়।

গ. ইতিবাচক প্রথম বাক্যটির সাথে নেতিবাচক দ্বিতীয় বাক্যটির تلازم অর্থাৎ বরাবরের সম্পর্ক, যথা : যে বিষয়টি জায়েয তা নিষিদ্ধ ও হারাম হতে পারে না।

ঘ. প্রথমটি নেতিবাচক ও দ্বিতীয়টি ইতিবাচক বাক্যের মধ্যে হবে। যেমন, এ পদ্ধতিটি : যা জায়েয নয় তা নিষিদ্ধ। ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম শাফেয়ী রহ. উল্লিখিত যুক্তি প্রয়োগ পদ্ধতিকে যথেষ্ট কাজে লাগিয়েছেন।

তিন : ইস্‌তিস্‌হাবে-হাল (استصحاب حال)
ফকীহদের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে নিম্নরূপ :

প্রথমটির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত মনে করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যাবে না (অতীতে একই হুকুম বর্তমান ছিল বলেই বর্তমানের ওপর হুকুম দেয়া হবে) এবং তার বিরুদ্ধে প্রমাণিতও নয়। ফকীহগণের পরিভাষায় একেই বলে ইস্‌তিস্‌হাবে-হাল। এর সংজ্ঞা হচ্ছে :

ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل

"অতীতে যা প্রমাণিত হয়েছিল, (বর্তমানে ও) ভবিষ্যতে তাকে স্থিত রাখাই নীতি।"[৩]

অন্য একটি সংজ্ঞা হচ্ছে

اَلْحُكْمُ بِبَقَاءِ أَمْرٍ مُحَقَّقٍ لَمْ يُظَنَّ عَدَمُهُ

"বাস্তবে প্রমাণিত (محقق) ও স্বীকৃত ব্যাপারের স্থিতির হুকুম দেয়া যতদিন পর্যন্ত তার অনস্তিত্বের (عدم) ধারণা না পাওয়া যায়।"[৪]

৩. হুসূলুল মামূল মিন ইলমিল উসূল, পৃ. ৯৬
৪. আল-আশবাহ ওয়ান-নাযাইর

www.pathagar.com

যেমন ইমাম শাফি'ঈ রহ. বলেন, মূত্রনালী ও মলদ্বার ছাড়া অন্য কোথাও দিয়ে যদি কিছু বের হয় তাতে অযু ভাঙে না ঐ দুই দ্বার দিয়ে যতক্ষণ আবার কিছু বের হয়ে অযুর অস্তিত্ব লোপ না করবে ততক্ষণ অযু থাকবে যেমন এর পূর্বে ছিল (অবশ্য অন্য কোন কারণে অযু নষ্ট হবার কথা স্বতন্ত্র)।

উপর্যুক্ত যুক্তি প্রদান পদ্ধতি এমন প্রতিটি হুকুমের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, যা প্রথম থেকেই যুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত এবং এখন তার বিলুপ্তি সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ইমাম শাফে'ঈর রহ. মতে এটি একটি অপরিহার্য যুক্তি। আর ইমাম আবু হানীফার রহ. মতে, এটি সংরক্ষণকারী যুক্তি। অর্থাৎ যেসব অধিকার বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে এর সাহায্যে সেগুলোর সংরক্ষণ হতে পারে কিন্তু নতুন অধিকারসমূহ প্রমাণিত হতে পারে না। এই মতবিরোধের প্রভাব নিম্নোক্ত আকারে প্রকাশিত হয়। ধরা যাক, এক ব্যক্তি উধাও হয়ে গেছে এবং তার কোনো খবরই নেই। ইমাম শাফে'ঈ রহ. তার মৃত্যুর ব্যাপারটি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তার সমস্ত শার'ঈ দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে জীবিতরূপ গণ্য করেন। এ কারণে তার বিষয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা জায়েয হবে না। উপরন্তু সে যার উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন কোনো ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, তার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে না ঠিকই কিন্তু অপরের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার অধিকার জন্মাবে না, কারণ তাঁর মতে তাকে জীবিত বলে গণ্য করবার যুক্তি তার বর্তমান অধিকারসমূহের সংরক্ষণের সীমা পর্যন্ত কার্যকর হবে, কিন্তু নতুন অধিকার সৃষ্টির ব্যাপারে কার্যকর হবে না। ফকীহ্‌দের পরিভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় হুজ্জাতুন দাফিয়া (حجة دافعة) অর্থাৎ সংরক্ষণমূলক যুক্তি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে হুজ্জাতুল মুজিবা (حجة موجبة)অর্থাৎ (নতুন অধিকার) সৃষ্টিমূলক যুক্তি।

চার : ইস্‌তিদ্‌লালের পদ্ধতি

استقراء ইস্‌তিকরা[৫]-এর ভিত্তিতে দলীলের অনুসন্ধান করা হয়। استقراء দুই প্রকার :

(ক) ইস্‌তিক্‌রায়ে তাম্ (استقراء تام) অর্থাৎ পূর্ণ ইস্‌তিক্‌রা যথা "পানি নিম্নগামী"। এই কুল্লী[৬] হুকুমটিতে উপনীত হবার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার

---

৫. استقراء = Inductive method.

৬. كلى = ব্যাপক।

www.pathagar.com

পানির পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পানির প্রত্যেকটি বিন্দু[৭] সাক্ষ্য দিয়েছে যে পানির ধর্ম নিম্নগামী হওয়া। তদ্রূপ ফকীহগণ শরীয়তের বিধান উদ্ভাবনের ব্যাপারে দলীল অনুসন্ধানের ব্যাপারে ইস্‌তিক্‌রা-তাম্ এর পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

(খ) ইস্‌তিক্‌রায়ে নাকিস (استقراء ناقص) অর্থাৎ অসম্পূর্ণ ইস্‌তিক্‌রা; যেমন, ইমাম শাফে'ঈ রহ. বলেন, বিতরের (وتر) নামায ওয়াজিব নয়, কারণ সওয়ারী জন্তুর পিঠে চড়ে বিতর নামায পড়া যেতে পারে। আর সওয়ার অবস্থায় যেসব নামায আদায় হয়ে যায় সেগুলো ওয়াজিব হবে না। হানাফিদের কেউ কেউও এটা স্বীকার করেছেন।

১. বিভিন্ন উক্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট'র পক্ষে উচ্চারিত উক্তিটি গ্রহণ করা। এটি এমন অবস্থায় গৃহীত হবে যখন লঘুতম হুকুমটি গ্রহণ করা হবে। যখন অন্য কোনো স্পষ্ট দলীল না পাওয়া যায়-এটিও ইস্‌তিদ্‌লালের একটি পন্থা। মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক আহ্‌ল-ই-কিতাব (ইহুদী ও খ্রিস্টান)-এর হত্যার শোণিত পণ (دية)-এর পরিমাণ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ'র মতে তা হবে মুসলিমের শোণিত পণের এক-তৃতীয়াংশ। ইমাম মালিক রহ.-এর মতে অর্ধাংশ, ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, আহ্‌লে-কিতাবের দীয়াত মুসলিমের দীয়াতের সমান। এই তিন মতের মধ্যে ইমাম শাফে'ঈ রহ. লঘুতম তথা এক-তৃতীয়াংশ দীয়াতের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

২. কোনো কোনো ফকীহ অপূর্ণাঙ্গ তথা দুর্বল 'ইল্লাতের ভিত্তিতে বিধান দিয়েছেন। যেমন ইমাম শাফে'ঈ রহ. জননেন্দ্রিয়ে হাত লাগলে অযু নষ্ট হবে বলে মত দিয়েছেন, কারণ পেশাবের পর জননেন্দ্রিয়ে হাত দিয়ে ইস্‌তিন্‌জা[৮] করার পর অযু করতে হয়। তিনি 'হাত লাগা'-কে "ইল্লাত ধরে প্রথম অবস্থায় কিয়াস করেছেন দ্বিতীয় অবস্থার ওপর। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে জননেন্দ্রিয়ে হাত লাগলে অযু ভেঙ্গে যাবে না।

৩. দু'টো সদৃশ অবস্থায় হুকুমের বৈপরীত্য দেখা গেলে ইস্‌তিদ্‌লালের পদ্ধতি কী হবে? ধরুন, আমি বললাম :

قرأت الكتاب من اوله الى اخره

---

৭. جزئيات = অংশসমূহ।

৮. استنجاء = পেশাব পায়খানার পর পবিত্রতা সাধন।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমি কিতাবটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। إلى (পর্যন্ত) শব্দের তাৎপর্য হবে কিতাবের শেষ অংশও আমার কিরাআত[৯]-এর মধ্যে শামিল ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র এই আদেশ :

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"তারপর তোমরা রাত পর্যন্ত সাওম পূর্ণ করো"[১০]-এতে রাত সাওমের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দু'টি বিপরীত হুকুমের কোনটির সাথে তুল্য হবে আল্লাহর নিম্নোক্ত হুকুমটি :

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"(তোমরা যখন নামাযের জন্য উদ্যত হও তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নাও) এবং তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো।"[১১]

প্রশ্ন হলো কনুই (مرافق) ধোয়া (غسل)-র মধ্যে শামিল হবে কি না? إِلَى اللَّيْلِ-এর সাথে তুলনা করলে إِلَى الْمَرَافِقِ বলতে কনুই শামিল হয় না। যদি বলেন হয়, তা হবে সন্দেহের ভিত্তিতে, অথচ সন্দেহের ভিত্তিতে শরীয়তের কোন হুকুম প্রমাণিত হয় না। তাই কনুই ধোয়া-র মধ্যে শামিল হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. এই প্রমাণ (ইস্তিদ্লাল) পদ্ধতিটি মানেন না। তাঁর মতে কনুই ধোয়া একান্ত জরুরী, নচেৎ অযু হবে না।

৪. যে 'ইল্লাতের 'ইল্লাত হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে তার সাহায্যে প্রমাণ উপস্থাপন করা। যেমন, ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, কিতাবতে হালাহ (যাতে গোলামকে কিতাবতের প্রতিদান সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করতে হয়) নাজায়েয। কারণ এই গোলামকে কাফ্ফারা হিসেবে আযাদ করা জায়েয। এটা ঠিক এমন অবস্থায় পরিণত হবে যেমন শরাবের ভিত্তিতে কিতাবত জায়েয নয়। তাই কাফ্ফারায় তাকে আযাদ করা যেতে পারে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন : শরাবের ভিত্তিতে কিতাবত শরাবের কারণেই নাজায়েয। কাফ্ফারায় আযাদ করার পথে কোনো বাধাও নেই। এক্ষেত্রে কিতাবতের প্রতিদান সঙ্গে সঙ্গেই দেয়া স্থিরীকৃত হোক বা পরে তাতে কিছু আসে যায় না।[১২]

---

৯. قراءة = পড়া।

১০. সূরা আল-বাকারা : ১৮৭

১১. সূরা আল-মায়িদা : ৬

১২. নূরুল আন্ওয়ার, কিয়াস অধ্যায়।

www.pathagar.com

তা'দীল (تعديل) পদ্ধতিতে ইস্‌তিদ্‌লাল

তা'দীল মানে সমতা স্থাপন করা। এর পূর্বে আলোচিত হয়েছে, অবস্থা ও কালের পরির্বতনের সাথে কোনো কোনো বিধানের পরিবর্তন ঘটে যদি পূর্ব বিধানটি কালের প্রেক্ষিতে দেয়া হয়ে থাকে।

কিয়াসের পর্যায়ে ফকীহ্‌গণ দু'টি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন; একটি হচ্ছে তাআদুল (تعادل), অপরটি তার্‌জীহ্ (ترجيح)। যুক্তি-প্রমাণের মধ্যে সংঘাতের (تعارض) ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেক্ষেত্রে দুই দলীল দুই বিপরীত হুকুম নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে যদি দলীলদ্বয়ের গুরুত্ব এবং শক্তি সমান (تعادل) হয় তখন গবেষণার সাহায্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার (ترجيح) দিয়ে সংঘাত দূর করতে হয়। কুরআন মাজীদে বৈপরিত্য (تعارض) বা দু'টো বিপরীত হুকুমের গুরুত্ব সমান হওয়া (تعادل)-এমন কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবুও যদি ধরা যায় এ রকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে তবে তার সমাধান দুষ্কর নয়। বিপরীতার্থক দু'টো আয়াতের অবতরণকাল, শান-এ নুযূল, হাদীসে তাদের ব্যাখ্যা ইত্যাদির সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দু'টো হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে তার সমাধানও হয়ে যায় দিরায়াত (دراية)-এর মাধ্যমে। অর্থাৎ হাদীসের পাঠ (متن) এবং সনদ[১৩] পরীক্ষা করে হাদীসদ্বয়ের তুলনামূলক শক্তি নির্ধারণ করার মাধ্যমে। এমনি, দু'টো ইজমা' ভিত্তিক বিধানের বৈপরীত্য দূর করা যায় কাল পাত্র অবস্থা ইত্যাদির প্রণিধানের মাধ্যমে। আসলে সত্যিকারের বৈপরীত্য দেখা দেয় কিয়াসী ফায়সালার মধ্যে যখন একটিকে অপরটির ওপর ترجيح বা প্রাধান্য দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। এরূপ বৈপরীত্যের ক্ষেত্রে যে নীতি ফকীহ্‌গণ অবলম্বন করেন তার কিছু উদাহরণ দেয়া গেল :

১. কিয়াস এবং ইস্‌তিহ্‌সান-এর মধ্যে তাআরুয (تعارض) বিরোধ হলে ইস্‌তিহ্‌সানকে শ্রেয় গণ্য করা হবে। কারণ اثر অর্থাৎ পরিণামের বিবেচনায় ইস্‌তিহ্‌সান ভিত্তিক হুকুমটি অধিকতর শক্তিশালী হবে। ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. قوت ثبات অধিকতর শক্তি-এর বিবেচনায় এক হুকুমকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। উদাহরণ : রমযানুল মোবারকের দিনগুলোতে কেউ নিয়ত করার বেলায় বললো, "আমি আগামী কালের সাওমের নিয়ত করলাম"। কিন্তু নির্দিষ্ট করে রমযানের সাওমের কথা উল্লেখ করলো না। ইমাম শাফে'ঈ রহ.-এর মতে "রমযানের

---

১৩. سند = বর্ণনাকারী পরম্পরা।

সাওমের" কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তার কিয়াসের ভিত্তি হচ্ছে فرضية অর্থাৎ রমযানের সাওম ফরয[১৪] হওয়া। তিনি কিয়াস করছেন এইভাবে : যেহেতু রমযানের ফরয সাওম কাযা (قضاء) করবার ক্ষেত্রে নিয়তে নির্দিষ্ট করে রমযানের কথা বলতে হবে, সুতরাং রমযানের মাসে আদায়ের اداء বেলায়ও তা নির্দিষ্টভাবে বলতে হবে। বিপরীত মত হচ্ছে, নিয়তে রমযানের উল্লেখ না করলেও রমযানে আদায়কৃত সাওম শুদ্ধ হবে, কারণ আল্লাহ খোদ ফরয বোঝার জন্য রমযানুল মোবারককে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই মতে এই মাসের আগমনই সাওম ফরয হওয়ার 'ইল্লাত। এই সাওমের সাথে فرضية-এর যা সম্পর্ক তার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হচ্ছে রমযান মাসের। সুতরাং এই 'ইল্লাতের অধিকতর শক্তি قوت) (ثبات এর বিবেচনায় দ্বিতীয় রায় বা কিয়াসকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

৩. مقيس عليه (যার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কিয়াস করা হয়)-এর সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হবে। যথা অযু করার বেলায় মাথা মাসেহ (مسح) একবার করলে চলে, তিনবার মাসেহ করা সুন্নাত নয়। যেমন, ১.তায়াম্মুমে ২. ক্ষতস্থানের উপর বাঁধা পট্টিতে এবং ৩. চামড়ার তৈরী মোজার উপর তিনবার মাসেহ সুন্নাত নয়। তিনটি নযীরের ভিত্তিতে বিধান দেয়া গেল অযুতে মাথা একবার মাসেহ করলে চলবে- তিনবার সুন্নাত নয়। ইমাম শাফে'ঈ র. বলেন, তিনবার মাসেহ করা সুন্নাত। তিনি একে গোসল (ধোয়া)-র ওপর কিয়াস করেন এবং বলেন, প্রত্যঙ্গগুলো যেমন তিনবার ধোয়া সুন্নাত তেমনি মাসেহও তিনবার করা সুন্নাত। অথচ তাঁর মাকীস আলাইহি (مقيس عليه) নযীর বা সদৃশ শুধু একটি তথা غسل।

৪. 'ইল্লাতের উপস্থিতিতে হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে, অনুপস্থিতিতে হবে না- এমন কিয়াস পরিত্যক্ত হবে। উদাহরণ : ইমাম শাফে'ঈ রহ.-এর মতে যেহেতু অযুর চারটি ফরযের মধ্যে মাথা মাসেহ অন্যতম ফরয (ركن), সুতরাং এতে তাকরার (تكرار) অর্থাৎ একাধিক মাসেহ সুন্নাত। তিনি ركن হওয়াকে 'ইল্লাত রূপে গণ্য করে তাকরার-এর বিধান দিলেন। কিন্তু এর বিকল্প কিয়াসও কি শুদ্ধ হবে? যেমন নাক পরিষ্কার করা, কুলি করা- এই দু'টি রুকন নয়, তাহলে এ দুই কর্মে তাকরার সুন্নাত

১৪. فرض = অবশ্য করণীয়।

www.pathagar.com

হবে না? অর্থাৎ ইল্লাত-এর অনুপস্থিতিতে হুকম ও অনুপস্থিত (عدم علة عدم حكم) থাকবে? একবার নাক পরিষ্কার করলে বা একটি মাত্র কুলি করলে চলবে? না, চলবে না-কারণ এ কিয়াসটি একটি ভ্রান্তনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫. তারজীহ্-এর বেলায় সত্তা (ذات) প্রাধান্য লাভ করবে গুণ (وصف)-এর ওপর। উদাহরণ : এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির ছাগল ছিনিয়ে নিয়ে জবাই করে রান্না করে ফেললো। এ অবস্থায় ছাগলের সত্তা (ذات) লোপ পেল এবং তার ওপর মালিকের অধিকার রহিত হয়ে গেল। সুতরাং ছাগলের মালিককে ছিনতাইকারীর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু রান্না করা গোশত [যা ছিনতাইকারীর অপকর্মের মাধ্যমে অস্তিত্বমান ছাগল (ذات) টির একটি وصف (বিশেষ অবস্থা) পরিণত হয়েছে] ছিনতাইকারীর কাছে থেকে যাবে। ইমাম শাফে'ঈ-র মতে যেহেতু অস্তিত্বমান ছাগলটির পরিবর্তিত রূপ তার ذات (সত্তা)-এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং এই ذات-এর সাথে মালিকের মালিকানার সম্পর্ক স্থিত হয়, সুতরাং মালিক রান্না করা গোশত এবং ক্ষতিপূরণ–দুই-ই পাবে। তিনি মনে করেন, ছাগলটির সাথে মালিকের মালিকানা অবিচ্ছেদ্য-সর্বাবস্থায় তা স্থিত থাকবে। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ছিনতাইকারীকে-এ মত উভয় পক্ষের, তবে রান্না করা গোশতের মালিকানা সম্পর্কে কোন্ মতটি তারজীহযোগ্য বিবেচিত হবে?

উত্তর : যে মতটি ذات-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; وصف এর ভিত্তিতে নয়-তাই তারজীহ্ বা অগ্রাধিকার পাবে। ذات অবলুপ্ত বলে তদস্থলে ক্ষতিপূরণই বিধেয়।

এভাবে ছিনতাইকারীর কাজ মূল সত্তার পর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে মালিকের অধিকারের প্রশ্ন। এখন এই মালিক যেহেতু ইতোপূর্বে মালিক ছিল শুধু এ কারণেই ছাগলের ওপর তার অধিকার কায়েম রয়েছে। যেহেতু ছাগলের নাম বদলে গেছে, তার মাধ্যমে অর্জিত ফায়দা বদলে গেছে, তাই যেন তার প্রকৃত তাৎপর্যও বদলে গেছে এবং ছাগলের সত্তাটি তার গুণের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। ইমাম শাফে'ঈ এই অগ্রাধিকার স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সর্বাবস্থায় মালিকের অধিকার ছাগলের সাথে কায়েম থাকবে।

৬. **সাদৃশ্যের প্রাধান্য সহকারে অগ্রাধিকার** : একটির সাথে সাদৃশ্যের কয়েকটি কারণ রয়েছে এবং অন্যটির সাথে সাদৃশ্যের রয়েছে একটি

www.pathagar.com

কারণ। বিধানের ক্ষেত্রে এই কয়েকটি কারণওয়ালা সাদৃশ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যেমন ভাই বাবা ও ছেলের সাথে তার এই দিকদিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে যে, সে তাদের মতো একই পর্যায়ের মাহ্‌রাম। কিন্তু চাচার ছেলের সাথে একাধিক বিধানে তার সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ১. যাকাত যেমন চাচার ছেলেকে দেয়া জায়েয তেমনি ভাইকে দেয়াও, ২. কোনো ব্যক্তির পুত্রবধুর তালাক হয়ে যাবার পর যেমন তার বিয়ে চাচাত ভাইয়ের সাথে জায়েয তেমনি নিজের ভাইয়ের সাথেও, ৩. চাচাত ভাইয়ের জন্য যেমন সাক্ষ্য দেয়া গ্রহণীয় তেমনি নিজের ভাইয়ের জন্যও। এসব কারণে ইমাম শাফেঈ'র রহ. মতে ভাইকে চাচাত ভাইয়ের সাথে শামিল করা অধিকতর ভালো ও সঙ্গত। তাই এক ভাই যখন নিজের ভাইয়ের (গোলামীর অবস্থায়) মালিক হয় তখন তার আযাদ না হওয়া উচিত যেমন চাচাত ভাই যদি মালিক হয় তাহলে আযাদ করে দেবার হুকুম দেয়া হবে না। এ অবস্থায় যদি বাবা ও ছেলের সাথে সাদৃশ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় তাহলে তার আযাদীর হুকুম দেয়া হবে। কারণ এরা দু'জন যখন মালিক হয় তখন আযাদীর হুকুম দেয়া হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. অগ্রাধিকারের এই কারণটি স্বীকার করেন না বরং তিনি একে ফাসেদ (নষ্ট) অগ্রাধিকারের মধ্যে গণ্য করেন।

৭. **ব্যাপকতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার** : যেখানে কয়েকটি গুণ 'ইল্লাত হতে পারে সেখানে এমন ধরনের গুণকে 'ইল্লাতে পরিণত করার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে যার মধ্যে বেশী ব্যাপকতা পাওয়া যায়। যেমন সুদের 'ইল্লাত ইমাম শাফেঈর রহ. মতে খাদ্যবস্তু হওয়া। তিনি বলেন, খাদ্যবস্তু বেশী ব্যাপকতার অধিকারী। কমবেশী প্রায় সব জিনিসের মধ্যে এর অংশ রয়েছে। অন্যদিকে পরিমাণ ও সামগ্রীর (ইমাম আবু হানীফার মতে এটি সুদের 'ইল্লাত) 'ইল্লাত হওয়ার ব্যাপারে তার বক্তব্য হচ্ছে, এটি শুধুমাত্র ওজনের পরিমাণের মধ্যে থাকে, ওজনের পরিমাণের কম বস্তুর মধ্যে থাকে না।

৮. **স্বল্প গুণাবলীর ভিত্তিতে অগ্রাধিকার** : একাধিক গুণাবলীর 'ইল্লাতে পরিণত হবার অবস্থায় এমন একটি গুণকে 'ইল্লাতে পরিণত করা হবে যার গুণ হবে কম এবং এ কারণে তা সহজে আয়ত্বাধীন হবে। সুদের 'ইল্লাত বানাবার ব্যাপারে খাদ্যবস্তু বা সামগ্রী হওয়াকে অগ্রাধিকার দেবার কারণ হবে এই যে, তা পরিমাণের মোকাবিলার কম গুণসম্পন্ন ও সহজে আয়ত্বাধীন হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. অগ্রাধিকারের এই

www.pathagar.com

দু'টি কারণকেই স্বীকার করেন না। তিনি এগুলোকে ফাসেদ (নষ্ট) অগ্রাধিকারের মধ্যে গণ্য করেন।

দুই কিয়াসের মধ্যে তাআরুয (تعارض) বা বিরোধ দেখা দিলে কোন্ নীতিতে একটিকে শ্রেয় এবং অপরটিকে বর্জনযোগ্য গণ্য করতে হবে- এ সম্বন্ধে ফকীহ্‌গণ যে সব মানদণ্ড স্থির করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ উপরে দেয়া হলো। উসূলে-ফিক্‌হের কিতাবে আরো কিছু মানদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে।

অভিমত প্রমাণের কতিপয় পদ্ধতি

নিচে অভিমত প্রমাণের কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হচ্ছে। ফকীহ্‌গণ নিজেদের অভিমত প্রমাণের জন্য এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করেন।

১. 'ইল্লাত প্রমাণ করার জন্য অন্য 'ইল্লাত পেশ করেন এবং এর মাধ্যমে সমর্থন ও শক্তি অর্জন করেন;

২. কোনো 'ইল্লাত থেকে অন্য যে হুকুমটি প্রমাণিত হয় তাকে নযীর হিসেবে পেশ করে ঐ হুকুমটির প্রমাণকে শক্তিশালী করেন এবং 'ইল্লাতকে যথার্থ স্থানোপযোগী গণ্য করেন;

৩. অন্য 'ইল্লাত ও অন্য হুকুমকে নযীর হিসেবে পেশ করে 'ইল্লাত ও হুকুম উভয়ের সমর্থন লাভ করেন;

৪. হুকুম প্রমাণ করার জন্য একটি 'ইল্লাত বাদ দিয়ে অন্য 'ইল্লাত পেশ করেন। এ অবস্থায় প্রথম 'ইল্লাতের প্রমাণ উদ্দেশ্য হয় না বরং হুকুমের প্রমাণ উদ্দেশ্য হয়।

কোনো কোনো ফকীহ্ চতুর্থ রূপটিকে জায়েয গণ্য করেন না। উসূলে ফিক্‌হের প্রচলিত কিতাবগুলো সাধারণত বিতর্ক আলোচনার পদ্ধতিতে লিখিত হয়েছে। তাই কোথাও কোথাও প্রকৃত সত্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এখন পুরাতন বিন্যাসের পরিবর্তন করে নতুন ভাবে তাকে বিন্যস্ত করতে হবে। এই বিন্যাসের ফলে যেন পরিবর্তিত প্রবণতা ও চাহিদা তার মধ্যে স্থান লাভে সমর্থ হয় এবং আধুনিক চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সাথে তা খাপ খেতে পারে।

www.pathagar.com

পূর্ববর্তী শরীয়ত : ফিক্‌হের অষ্টম উৎস

উৎস হিসেবে পূর্ববর্তী শরীয়ত

ইসলামী ফিক্‌হের অষ্টম উৎস হচ্ছে পূর্ববর্তী শরীয়ত। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত যে সমস্ত পথ ও পদ্ধতি অন্যান্য উম্মতের কাছে সংরক্ষিত ছিল বা কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে রসূলুল্লাহ স. তার ওপর আমল করেছিলেন। আসলে আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম মূলত এক ও অভিন্ন। আদর্শ ও মূলনীতির ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই, হবেও না। ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থাতে স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্যের কারণে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী নবীদের শরীয়তে কিছু পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক এবং আল্লাহ্‌র হিকমতের অনুকূল। তবে পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাত অনেক ক্ষেত্রে তাদের নবীর শিক্ষা অবিকৃত রাখতে পারেনি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার রেকর্ডও লুপ্ত হয়েছে। যা অবিকৃত আছে, যার বিবরণ পাওয়া যায় কুরআন মাজীদে, হাদীসে এবং পূর্ববর্তী উম্মতের জীবনে। তা অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট। এই কারণে পূর্ববর্তী শরীয়ত ইসলামী ফিক্‌হের অন্যতম উৎস।

কুরআন হাকীমে এর প্রমাণ

আম্বিয়ায়ে কিরাম আ.-এর নাম ও তাঁদের হিদায়াতের মূল বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে রসূলুল্লাহ স.-কে হুকুম দেয়া হয়েছে :

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"এদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছিলেন, তুমি তাদের হেদায়াতের অনুসরণ করো।"[১]

ফকীহ্‌গণ হেদায়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

والهدى اسم الايمان والشرائع جميعا لان الاهتداء يقع بالكل فيجب عليه اتباع شرعهم

"ঈমান (মূলনীতি) ও শরীয়ত (পথ ও পদ্ধতি) সবই হেদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ হেদায়াত লাভ করার সম্পর্ক সবার সাথে আছে। তাই এই নবীগণের শরীয়ত মেনে চলা সবার জন্য ওয়াজিব"।[২]

---

১. সূরা আল-আন'আম : ৯০

২. কিতাবুত তাহকীক, পৃ. ২০১; আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর

www.pathagar.com

দ্বিতীয় একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই 'দীন'টিই বিধিবদ্ধ করেছেন যার অসিয়ত তিনি নূহকে করেছিলেন এবং যার ওহী (আদেশ) তোমাকেও দিয়েছি এবং যা অনুসরণের অসিয়ত করেছিলেন ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকেও, (বলেছিলাম) তোমরা সেই দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং তার ব্যাপারে নানা দলে বিভক্ত হয়ে যেয়ো না।"[৩]

নিম্নোক্ত আয়াতে ইবরাহীমী মিল্লাতের অনুসরণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

"তারপর আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়ে আদেশ করলাম, তুমি ইবরাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করো স্থির লক্ষ্যে একাগ্র হয়ে।"[৪]

বস্তুত কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী শরীয়তের বহু আহ্‌কামের উল্লেখ রয়েছে।

এরই ভিত্তিতে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন :

وان شرع من قبلنا يلزمنا ما لم بنقض الله بالانكار

"পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর ওপর আমল করা আবশ্যক যদি আল্লাহ নিন্দা প্রকাশে তাকে নাকচ না করেন।"[৫]

পূর্ববর্তী শরীয়ত সম্পর্কে ফকীহগণের মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ

এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাস্‌লাহাত বা কল্যাণ যাতে নিহিত রয়েছে তা এক প্রকার যেমন থাকতে পারে, ভিন্নতরও হতে পারে। কোন নবীর আমলে যা ভালো, পরর্বতী নবীর আমলে তা মন্দ হতে পারে। সুতরাং তাদের শরীয়তে ঐক্য এবং পার্থক্য থাকতে পারে। আসল কথা হচ্ছে বান্দাদের কল্যাণ যা যুগের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। বান্দাদের মাস্‌লাহাতের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের মধ্যে কখনো ঐক্য হয় আবার কখনো হয় অনৈক্য। সম্ভবত পূর্ববর্তী নবীর আমলে কোনো মাস্‌লাহাত ছিল যা পরবর্তী নবীর আমলে বদলে গেছে। অনুরূপভাবে হয়তো মাস্‌লাহাত বদলায়নি কিন্তু তা অর্জন করার পথ ও পদ্ধতি বদলে গেছে।

---

৩. সূরা আশ-শুরা : ১৩

৪. সূরা আন-নাহ্‌ল : ১২৩

৫. কিতাবুত তাহকীক, খ. ৩, পৃ. ২০১

www.pathagar.com

এ কারণে অবস্থা ও কালের চাহিদার প্রেক্ষিতের ওপর এই ফায়দা হাসিল করার কাজটি নির্ভরশীল ছিল এবং অবস্থা ও প্রয়োজন এটাই অনুমোদন করতো। যেহেতু রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়ত থেকে ফায়দা হাসিল করা হয়েছিল এবং তিনি এর আইনগত মর্যাদা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তাই এটি সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং এই উৎসটি সুন্নাতেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করা হবে। তবে ফিক্‌হশাস্ত্র প্রণয়নকালে মুসলিম ফকীহগণের ইহুদি, নাসারা ইত্যাদি জাতির আইন থেকে যথারীতি ফায়দা হাসিল করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ইসলামী ফিক্‌হ কি অন্যান্য ধর্মীয় আইন থেকে গৃহীত?

তবে কিছু কিছু সাদৃশ্য এমন পর্যায়ের পাওয়া যায়, যা থেকে সন্দেহ জাগে, সম্ভবত ফকীহগণ আল্লাহ্‌র হিকমত ও মূলনীতির আওতাধীনে কোথাও কোথাও আংশিক ফায়দা হাসিল করেছেন। কিন্তু এই ধরনের একেবারেই হালকা সাদৃশ্য নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই এ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে তিনটি ধর্মের আইন শাস্ত্রের প্রভাব প্রবণতার কথা আলোচনা করা যেতে পারে।

১. পার্সী ধর্ম
২. খ্রীস্ট ধর্ম
৩. ইহুদি ধর্ম

১) পার্সী আইনশাস্ত্র ও ইসলামী ফিক্‌হের মধ্যে কোনো প্রকার সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য এখনো প্রমাণিত হয়নি। দু'চারটি কথা উভয়ের মধ্যে একই রকম (যেমন নামায, মিসওয়াক ইত্যাদি) পাওয়া যাওয়া কোনো প্রভাবের প্রমাণ হতে পারে না। বরং গবেষকদের মতে, ইসলামী ফিক্‌হ প্রণয়নের যুগে পার্সীদের ধর্মীয় আইনের কোনো শৃংখলাবদ্ধ ও বিন্যস্ত রূপই ছিল না।

২) খ্রীস্ট ধর্মে দীন ও দুনিয়ার পৃথক অবস্থানের কারণে ইসলামের সাথে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। খ্রীস্টধর্মে ধর্মীয় বিধান ও আইনের পরিমাণ অতি অল্প ও সীমিত। জীবনের অতি সাধারণ অংশেও তার বিচরণ নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে পোপের ঘোষিত বিধানের ভিত্তিতে তা রচিত। বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে তার সাথে সাদৃশ্য ইসলামী ফিক্‌হের প্রভাব গ্রহণের কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে সিরিয়াসহ কিছু দেশে (যেখানে খ্রীস্টীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল) গীর্জার আইন যে ইসলামী ফিক্‌হের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, একথার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

www.pathagar.com

৩) ইহুদি ধর্মের বিভিন্ন বিধানের সাথে ইসলামী ফিক্‌হের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়ে থাকে। যেমন তালমূদে[৬] (ইহুদি ফিক্‌হ) খ্রীস্ট ধর্মের মতো ইবাদত ও আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। বরং ধর্মীয় আইন উভয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ওহী এ সবের উৎস। তাছাড়া ইসলামী ফিক্‌হের ন্যায় বিভিন্ন বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রবণতাও সেখানে রয়েছে। নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকাও স্বীকৃত। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়। যেমন, তালমূদের কতিপয় বিধান ফিক্‌হের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. যদি কোনো ব্যক্তি পথ চলার সময় রুটি ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর টুকরো পথে পড়ে থাকতে দেখে তাহলে তা যেন পায়ের তলায় পিষ্ট না করে একদিকে সরিয়ে দেয়। (খ. ২, পৃ. ১৬০)
২. কাফ্‌ফারার দিনের রোযা রাখার জন্য শিশুদের যেন বাধ্য না করা হয়। বরং নির্দিষ্ট বয়স থেকে দু-এক বছর আগে থেকে তাদেরকে এতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।
৩. এভাবে তালমূদের বিভিন্ন স্থানে অর্ধস্বাধীন ও দাসদের কথা পাওয়া যায়।
৪. তালমূদে (খ. ৯, পৃ. ৫৪) অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে তালাকের কথা বলা হয়েছে।
৫. লোকতা (কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস) সম্পর্কে বিধান (খ. ১, পৃ. ৮৫) রয়েছে।
৬. যারা সুদের ভিত্তিতে টাকা ঋণ দেয়, পাশা খেলে এবং বাজী রেখে কবুতর উড়ায় তাদের বিচারক হবার ও সাক্ষ্য দেবার যোগ্যতা শেষ হয়ে যায়। (খ. ১, পৃ. ৫৫)
৭. মেয়েদের অধিকার ও খোরপোষের বিধান বিস্তারিতভাবে ৮ম খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।

---

৬. তালমূদ বলতে "মুসান্না" ও তার ব্যাখ্যা গুমারাহ এর সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। তাওরাত বা মূসা আ-এর শিক্ষাবলীর যে বর্ণনা বিগত খ্রীস্টীয় ২য় শতকের শেষের দিকে ইহুদিদের মধ্যে পাওয়া যেতো তার সমষ্টিকে মুসান্না বলা হয়। এতে রয়েছে পাঁচটি অধ্যায় :
১.সারাইম : নামায ও ইবাদত এবং কৃষি ও অর্থ ব্যবস্থা (যাকাত)।
২.অঙ্গীকারকৃত শনিবার : ঈদের দিনগুলো, রোযার বিধানসমূহ (নাশীম দাম্পত্য আইন)।
৩.কলসীম : কুরবানী ও পানাহারের বিধান।
৪.তাহারাত : পাক ও নাপাকের বিধান।
৫.তাসকীন : দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন।
৬.'তালমূদে জেরুজালেম' প্রায় খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে লিখিত হয়।
৭.তালমূদে বাবেল, এর চেয়েও বৃহদাকার এবং খৃস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে লেখা হয়।

www.pathagar.com

ওহীর মাধ্যমে প্রবর্তিত শরীয়তসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যাদিষ্ট শরীয়তগুলো একই গাছের শাখা প্রশাখার সাথে তুলনীয়, একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত। এগুলোর পত্তনকারী সয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং প্রবর্তনকারীরা হচ্ছেন তাঁরই মনোনীত পূত চরিত্র নবীগণ আ.। সুতরাং শরীয়তে ইসলামের সাথে পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের কিছু আহকামের প্রকৃতিগত মিল থাকবেই। কালের প্রবাহে পূর্ববর্তী শরীয়তাদি বিলুপ্ত এবং যা বিদ্যমান নানা বিকৃতি তাকে আচ্ছন্ন করেছে। সুতরাং তার নির্বিচার অনুকরণ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য, ইসলাম মূলত এক, মানব জন্মের শুরু থেকে ইসলামই আল্লাহ্র মনোনীত দীন। সুতরাং ইসলাম পূর্ব বা ইসলামোত্তর কথা দু'টো আসলে Common mistake-এর রূপ নিয়েছে। সব নবী-রসূলই ইসলাম প্রচার করেছিলেন- মুহাম্মদ স. ইসলামের আদি প্রচারক নন। তবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা (شريعة) বিভিন্ন নবী বিভিন্ন সময়ে যা প্রবর্তন করেছিলেন তাতে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক এবং বাস্তবে ছিলও।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"আমি তোমাদের প্রতিটি (সম্প্রদায়ের) জন্য শরীয়ত ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছি।"[৭]

ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু অনুকরণের ব্যাপারে ইসলামী নীতি

উমর রা. একবার ইহুদীদের কিছু রীতি বা কর্মধারা অনুকরণ করতে চাইলে রসূলুল্লাহ স. বলেন :

أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود و النصارى ؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية و لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي

"তোমরা কি হতভম্ব, বিভ্রান্ত হয়ে গেলে (অর্থাৎ নিজেদের দীন ও কিতাবের ব্যাপারে নিঃসংশয় হতে পারলে না) যেমন ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? আমি তোমাদের কাছে সুশুভ্র নির্মল শরীয়ত নিয়ে এসেছি (যা সবরকম সংশয়, সন্দেহ ও ত্রুটি মুক্ত)। আজ যদি মূসা জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকতো না।"[৮]

---

৭. সূরা আল-মায়িদা : ৪৮

৮. শুআবুল ঈমান, বাব : যিকরু হাদীসি জামঈল কুরআন, হাদীস নং-১৭৬; বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "ফিকহের বিন্যাস ও তার সূচনা" নিবন্ধটি। মূল ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, মাসিক মাআরিফ, মার্চ ও এপ্রিল ১৯৫৮ সংখ্যা।

www.pathagar.com

এর জবাব হাদীসের শব্দের মধ্যে রয়ে গেছে। আসলে রসূলুল্লাহ স. প্রভাব গ্রহণ করার ও প্রভাবিত হবার পরাজিত মনোভাবের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চাচ্ছিলেন। যারা সীমারেখা ও নীতি-নিয়মের পরোয়া না করে সত্য-অসত্য সব কথা থেকে গ্রহণ ও ফায়দা হাসিল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধেই ছিল তার এই বিধি-নিষেধ। যেমন আজকাল অন্ধভাবে ইউরোপের অনুসরণ করা হয়। তাই ইহুদিদের কথার ব্যাপারে উমরের রা. বিস্ময়ের সাথে (আমাদের কাছে ভালো মনে হয়েছে) বলা এবং রসূলুল্লাহ স.-এর তার জবাবে বলা, لقد جئتكم بها بيضاء نقية এই প্রমাণ বহন করে যে, যখন উমরের রা. ন্যায় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও বিপুল মর্যাদাশালী ব্যক্তির (যিনি ইহুদিদেরকে কখনো গুরুত্ব দিতেন না) ইহুদিদের কিছু কথা পছন্দ হয়ে গিয়েছিল তখন অন্যদের জন্য অন্ধ অনুসরণ ও নতজানু মনোভাব সহকারে প্রভাবিত হবার পথে বাধা ছিল কোথায়! তাই রসূলুল্লাহ স. কঠোরভাবে বাধা দিয়ে ছিলেন। কারণ দরজা খোলার পর বন্ধ হওয়া কঠিন ছিল।

একবার উমর রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে তাওরাতের একটি অনুলিপি পড়তে শুরু করলেন। রাগে রসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হতে থাকলো। রসূলুল্লাহ স.-এর চেহারার ওপর উমর রা.-এর দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে তিনি বললেন :

> أَعُوذُ بِاللّٰه مِنْ غَضَبِ اللّٰه وَمِنْ غَضَبِ رَسُوله رَضِينَا بِاللّٰه رَبًّا وَبِالإِسْلَام دِيناً وَبِمُحَمَّد نَبِيًّا
>
> "আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহ্র পানাহ চাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, ইসলাম আমাদের দীন এবং মুহাম্মদ আমাদের নবী- এতেই আমরা সন্তুষ্ট (আমরা ধন্য, আর কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই)।"

উমর রা-এর এই আত্মসমর্পণমূলক উক্তি শ্রবণ করে রসূলুল্লাহ স. বলেন :

> وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِه لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لاتَّبَعَنِي
>
> "সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, যদি মূসা তোমাদের কাছে আবির্ভূত হতেন এবং তোমরা আমাকে ত্যাগ করে তার আনুগত্য করতে তাহলে তোমরা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে। আর যদি তিনি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়াতের সময়ের নাগাল পেতেন তাহলে তিনি আমারই আনুগত্য করতেন।"[৯]

---

৯. সুনানু দারিমী, কিতাব : আল-মুকাদ্দিমা, বাব : মা ইউত্তাকা মিন তাফসীরি হাদীসিন নাবিয়্যি ...., হাদীস নং-৪৩৫

www.pathagar.com

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, রসূলুল্লাহ স. ইহুদীদের সব কিছুর ওপর ঢালাও নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো ব্যাপারে ওহী না পেলে রসূলুল্লাহ স. নিজে আহলে কিতাবের অনুসরণ পছন্দ করতেন। সুতরাং এ নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক হতে পারে না। অন্যপক্ষে ইহুদী যাজকগণ নিজেদের খেয়াল খুশী মত বা কোন স্বার্থের বশে তাওরাতের বহু অনুশাসনকে বিকৃত করে ফেলেছিল। তার প্রমাণ মিলে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট (New Testament)-এর গসপেল (Gospel) চতুষ্টয়ে। ‘ঈসা আ. এই জন্য ইহুদী যাজকগণকে প্রকাশ্যে বহুবার তিরস্কার করে ছিলেন যে কারণে তারা ঈসা আ.-এর প্রাণনাশের পরিকল্পনা করেছিল। রসূলুল্লাহ স.-এর সময় পর্যন্ত এসে তাওরাত তার আসলরূপ হারিয়ে ফেলেছিল। এমতাবস্থায় তাওরাত পাঠ বা তার কোনো অনুশাসন পছন্দ করার অনুমতি দানের ফল বিষময় হতে পারতো। ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগে অন্য ধর্মের নির্বিচার অনুকরণ ইসলামের স্বকীয়তা রক্ষার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারতো। স্বয়ং রসূলুল্লাহ স. ইহুদীদেরকে বলেছিলেন : فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا (আন দেখি তাওরাত, পড়ে আমাকে শোনাও দেখি);[১০] দেখি, অভিজাত ব্যভিচার করলে তাকে এমন লঘুদণ্ড দানের ব্যবস্থা তাওরাতে আছে না কি? দেখা গেল, ব্যভিচারের শাস্তি অভিজাত নির্বিশেষে সমভাবে রজম (رجم) অর্থাৎ প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা তাওরাতেও রয়েছে। তিনি তদনুসারে রায় দিলেন।

রসূলুল্লাহ স. নিজে তওরাতের কোনো উৎক্ষিপ্ত অনুশাসনকে যথার্থ বলে স্বীকার করলেও তাতে কোনো ভয়ের কারণ ছিল না, কারণ তিনি ভুল করলে অগৌনে আল্লাহ তাঁর ভুল সংশোধন করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ স. ছিলেন মাহফূয (محفوظ) অর্থাৎ ভ্রম প্রমাদ থেকে সংরক্ষিত। প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ স. কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলেন, কারণ উম্মতকে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং রাখা। পাছে তারা ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের অনুকরণে কবর পূজায় লিপ্ত হয়-এ আশঙ্কা ছিল নিষেধাজ্ঞার পেছনে। পরে তিনি সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। অবস্থা ও কালের পরিবর্তনে ইসলামী শরীয়তের কোনো ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বটে, তবে তাদের মধ্যে Common element অনেক আছে যা শরীয়তে মুহাম্মদী স.-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

---

১০. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আত-তাফসীর, বাব : তাফসীরু সূরাতি আলে ইমরান, হাদীস নং-৪২৮০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তা'আমুল : ফিক্‌হের নবম উৎস

তা'আমুল (تعامل)

তা'আমুল অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবীগণের রা. 'আমল বা কর্মের অনুসরণ করা। তাঁদের 'আমল হুজ্জাত অর্থাৎ দলীল রূপে স্বীকৃত। ফকীহগণ ফিক্‌হের বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবা রা.-এর কর্মকাণ্ড থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা সাহাবা রা.-এর কর্মকাণ্ডকে সুন্নাত (سنة)-এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন এবং একে শরীয়তের উৎসরূপে ব্যবহার করেছেন। আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে এ থেকে যথেষ্ট উপকারিতা অর্জন করেছেন। তারা একে 'সুন্নাত' এর পর্যায়ে গণ্য করে উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুন্নাত প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

সাহাবা রা.-এর মর্যাদা

সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ স.-এর জীবন থেকে সরাসরি ও হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ স.-এর চিন্তা ও কর্মজীবনকে তারা নিজেদের জীবনে লালিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার থেকে তারা যা কিছু যেভাবে শুনেছিলেন অথবা তাকে যা কিছু যেভাবে করতে দেখেছিলেন হুবহু তাঁকে তারা সেভাবেই নিজেদের জীবনে কার্যকর করেছিলেন। কোথাও সংশয় দেখা দিলে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করে সংশয় নিরসন করতেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সাহাবা আইন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁর পবিত্র বাণীতে তাঁদের ব্যুৎপত্তির সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

এ অবস্থায় নবুওয়তের প্রকৃতি ও মেজাজ সম্পর্কে তাঁদের চাইতে বেশী অভিজ্ঞ ও পারদর্শী আর কে হতে পারে? তাদের রায় ও 'আমলের মোকাবিলায় অন্য কারোর রায় ও 'আমল গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। সামগ্রিকভাবে তাঁদের কথা ও কর্মকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিলে শরীয়তের কোনো মূলনীতির ওপর আঘাত পড়ে না। বরং এটিই নবুওয়তের উদ্দেশ্যের একান্তই অনুকূল। কারণ এমন একটি জামাআত (جماعة) বা গোষ্ঠি গঠন করার দায়িত্বও নবীর ওপর অর্পিত হয়, যে গোষ্ঠিটি নবীর তিরোধানের পর সার্বিকভাবে তাঁর শিক্ষার ধারক, বাহক ও সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কোন নবীই মানবিক প্রয়োজনের সব কিছুর এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সাময়িক বিধান দিয়ে যেতে পারেন না। তবে তাঁর বাণী এবং কর্মের মধ্যে নিহিত থাকে এমন কিছু সাধারণ এবং ব্যাপক নীতি যেগুলোর সাহায্যে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। নবীর তিরোধানের পর তাঁকে অনুসরণকারী গোষ্ঠি সেই নীতিকে তাঁদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রূপায়িত করে নবীর দায়িত্বই পালন করে। তাই তাদের ক্রিয়াকলাপ উম্মতের জন্য মানদণ্ডের রূপলাভ করে। একারণে ফকীহগণ সাহাবীগণের তা'আমুলকে দলীল গণ্য করেছেন।

কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ

ইরশাদ হচ্ছে :

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী (সর্বপ্রথম ঈমান এনেছে) আর যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।"[১]

رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ বাক্যাংশ সাহাবায়ে কেরামের কার্যকলাপকে উৎস গণ্য করার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীলের মর্যাদা রাখে। বিশেষ করে رَضُواْ عَنْهُ আল্লাহ্‌র হিকমতের সাথে তাদের জীবন ধারার একাত্মতা প্রমাণ করে।

নিম্নোক্ত হাদীসগুলোও অনুধাবন যোগ্য :

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ

"আমার আগে আল্লাহ যে নবীকেই পাঠিয়েছেন তাঁর উম্মতের মধ্যে তাঁর জন্য ছিল সাহায্যকারী[২] এবং তার হুকুম মেনে চলতো।"[৩]

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত ও সত্য পথগামী হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা-এ সুন্নাতকে তোমরা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরো অর্থাৎ মজবুতভাবে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো।"[৪]

---

১. সূরা আত-তাওবা : ১০০

২. حوارى = কুরআন মাজীদে ঈসা আ.-এর বারোজন বিশ্বস্ত সাহাবী অর্থে ব্যবহৃত।

৩. সহীহ্ মুসলিম, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : বায়ানু কাওনিন নাহয়ি আনিল মুনকার মিনাল ঈমান, হাদীস নং-১৮৮

www.pathagar.com

অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন :

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

"আমি ও আমার সাহাবা যে পথে আছি (সেটিই সত্য)।"[৫]

বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. একবার বলেন :

أولئك أصحابُ محمد – صلى الله عليه وسلم – ، كانوا أفضلَ هذه الأمة : أبرَّها قلوبًا ، وأعمقَها علمًا ، وأقلَّها تكلُّفًا ، اختارهم الله لصحبة نبيِّه ، ولإقامة دينه ، فاعرِفوا لهم فضلَهم ، واتبعُوهم على أثرهم ، وتمسَّكوا بما استطَعْتم من أخلاقِهم وسيَرِهم ، فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم

"এরা হচ্ছেন মুহাম্মদ স.-এর সাহাবী। এরা ছিলেন এ উম্মতের সেরা-হৃদয়ের নিষ্কলুষতায় এবং জ্ঞানের গভীরতায় সবার উপরে, অহমিকায় সবার নিম্নে। আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্য ও তাঁর দীন কায়েম করার জন্য এদেরকে নির্বাচিত করেছিলেন। তোমরা এদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দাও এবং এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। এদের চরিত্র ও জীবন ধারা যতটা পারো মজবুত করে ধরো। এরাই সত্য-সঠিক হেদায়াতের পথে ছিলেন।"[৬]

সাহাবীগণের রা. জীবন সম্বন্ধে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর এই মন্তব্যের পর আর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না।

ফকীহগণের মত

তা'আমূলের ব্যাপারে ফকীহগণের মতামত নিম্নরূপ :

يجب اجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ولا يجب اجماعا فيما ثبت الخلاف بينهم

"যে কথা সাহাবা রা.-এর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে অতঃপর যা তাঁরা নীরবে মেনে নেন, তা মেনে চলা ওয়াজিব। আর যে ব্যাপারে কিছু মতবিরোধ থাকে তা মেনে চলা ওয়াজিব নয়।"[৭]

সর্বসম্মত মতে এর মানে হচ্ছে, কোন বিরুদ্ধ মত ব্যতীত সাহাবা রা.-এর মধ্যে যে বিষয়টি ব্যাপকভাবে দেখা যাবে তা হবে ইজমা'র মর্যাদাসম্পন্ন। তাই সব যুগের ইজমা' যখন দলীল রূপে গণ্য হয়, সাহাবা রা.-এর ইজমা' অধিকতর

---

৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৭১৪৫

৫. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : ইফতিরাকুল উম্মাহ, হাদীস নং-২৬৪১

৬. জামি'উল উসূল ফী আহাদীসির রসূল, কিতাব : আল-ইতিসামু বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, হাদীস নং-৮০। মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আল-ইতিসাম বিল-কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, হাদীস নং-১৯৩

৭. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ, খ. ২, পৃ. ১৭

www.pathagar.com

যৌক্তিকভাবে হুজ্জাত[৮] হবে। দুই শায়খ[৯]-এর ঐকমত্যকে ফকীহগণ মৌলনীতির মর্যাদা দিয়েছেন এবং তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক বলে মত প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন :

كُلُّ مَا ثَبَتَ فِيهِ اتِّفَاقُ الشَّيْخَيْنِ يَجِبُ الاقْتِدَاءُ بِه

"যে ব্যাপারে দুই শায়খ-এর ঐকমত্য প্রমাণিত হয়েছে তা মেনে চলা ওয়াজিব।"[১০]

এ থেকে প্রমাণ হয়, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব নির্বাচনের ব্যাপারে সংখ্যার তুলনায় গুণগত মর্যাদা বেশী গ্রহণীয় হয়।

---

৮. حجة = দলীল।

৯. দুই শায়খ (شيخين) অর্থে আবূ বকর রা. ও 'উমর রা.।

১০. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের অভিমত : ফিক্‌হের দশম উৎস

ইসলামী ফিক্‌হের দশম উৎস হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিদের অভিমত। উক্তি, ফত্‌ওয়া, সালিশী মীমাংসা, আদালতের সিদ্ধান্ত, সরকারী ও বেসরকারী নির্দেশ ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাহাবা রা.-এর রায়ই শীর্ষস্থানীয়। রসূলুল্লাহ স. তাঁদের সম্পর্কে বলেন :

أصحابي كالنجوم ، فبأيهم اقتديتم اهتديتم

"আমার সাহাবীগণ তারকারাজির মতো। তাদের মধ্য থেকে তোমরা যার-ই অনুসরণ করবে, হেদায়াত লাভ করবে।"[১]

ফকীহগণ উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন :

لأن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب لأنهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي عليه السلام وكونهم في خير القرون

"তাঁদের (সাহাবীদের) অধিকাংশ উক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর দরবারে শোনা। যদি তাঁরা ইজতিহাদ করে থাকেন তাদের রায় সব চাইতে যথার্থ, কারণ তাঁরা কুরআন মাজীদের অবতরণের স্থান-কাল প্রত্যক্ষ করেছেন, ইসলাম গ্রহণে তাঁরা ছিলেন অগ্রণী। তাঁরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্যের বরকত প্রাপ্ত, তাঁদের যুগ (Generation) ছিল খাইরুল কুরূন (সবচেয়ে সেরা যুগ)।"[২]

ফকীহদের আরো একটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হল :

لأنهم شاهدوا احوال التنزيل واسرار الشريعة

"কারণ তাঁরা কুরআন মাজীদ অবতরণের অবস্থাদি ও শরীয়তের গূঢ় তাৎপর্যাদি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।"[৩]

এসব কারণে যদি সাহাবাগণ রা. নিজেদের মতানুযায়ী কোনো কথা বলেন তাও অন্যদের মতের মোকাবিলায় অনেক বেশী মর্যাদার অধিকারী।

ফকীহগণ সাহাবাগণের কাছ থেকে গ্রহণ ও তাঁদের মাধ্যমে মাসায়েল উদ্ভাবন করার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও তাহারাতের দিক দিয়ে তাদেরকে কয়েকটি

---

১. মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাব : আল-মানাকিব, বাব : মানাকিবি কুরায়শ ওয়া যিকরিল কাবায়িল, হাদীস নং-৬০০৯। হাদীসটি বাতিল।

২. শারহুত তালভীহ আলাত-তাওযীহ, খ. ২

৩. নূরুল আনওয়ার, পৃ. ২১৭

www.pathagar.com

ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর সাক্ষ্য ও আইনগত বিষয়সমূহে তাদের বৈশিষ্টের প্রতি নজর রেখেছেন।[৪]

একথা সুস্পষ্ট সব মানুষ সমান নয়। কাজেই সব সাহাবাও সম পর্যায়ের নন। তাই আইনগত ব্যাপারে কাদের রায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে তার ইঙ্গিত রয়েছে ফকীহগণের নিম্নোক্ত বাক্যে :

الذين افنوا أعمارهم في الصحبة وتخلقوا بأخلاقه الشريفة كالخلفاء والأزواج المطهرات والعبادلة وأنس وحذيفة ومن في طبقتهم

"যে সব সাহাবা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহচর্যে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং যারা রসূলুল্লাহ স.-এর পরিচ্ছন্ন চরিত্রের রঙে নিজেদের রঞ্জিত করেছিলেন, যেমন খুলাফায়ে রাশিদীন, রসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণ, চার আবদুল্লাহ (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.,) আনাস রা., হুযাইফা রা. এবং যারা এই শ্রেণীভুক্ত।"[৫]

সাহাবা রা.-এর উক্তি সম্পর্কে ফকীহগণের মত হচ্ছে :

قول الصّحابيّ فيما يمكن فيه الرّأي ملحق بالسّنّة لغير الصّحابيّ

"যার মধ্যে কিয়াস ও রায়ের অবকাশ রয়েছে এমন বিষয়ে সাহাবা রা.-এর উক্তি সাহাবী ছাড়া অন্যদের জন্য সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত হবে।"[৬]

অন্য কথায় যেক্ষেত্রে কিয়াস বা রায়ের অবকাশ নেই, রসূলুল্লাহ স.-এর মুখ থেকে না শুনলে কিছু বলার উপায় নেই, সেক্ষেত্রে তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর তাঁদের যে অভিমতের ক্ষেত্রে কিয়াস চলতে পারে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সেখানে কিয়াস করার অবকাশ রয়েছে। যেহেতু সাহাবাদের উক্তির মধ্যে বিরোধ রয়েছে তাই ইমাম শাফে'ঈ রহ. তাঁদের অনুসৃতি ওয়াজিব বলেন না।[৭]

কোনো বিষয়ে যখন "উমুমুল বালওয়া" (সাধারণ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ)-এর অবস্থা না দেখা দেয় ইমামদের এই মতবিরোধ সেই অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আর যদি তা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভের মতো অবস্থা দেখা দেয় এবং সাহাবাগণের উক্তি তার বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে তা গ্রহণ করা অপরিহার্য হবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে :

৪. এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য উসূলে ফিক্‌হের কিতাবগুলো দেখুন।
৫. শরহে মুসাল্লামুস সুবূত, পৃ. ৪৪১
৬. প্রাগুক্ত
৭. নূরুল আনওয়ার ইত্যাদি।

www.pathagar.com

لا تقبل فيه السنة فلا يقبل ما هو يقبل الشبهة به

"এহেন অবস্থায় সুন্নাত গ্রহণ করা হবে না। কাজেই সুন্নাতের সাদৃশ্যের কারণে যে জিনিসটি গ্রহণ করা হয়েছে তা স্বাভাবিকভাবেই গৃহীত হবে না।"[৮]

তাবে'ঈদের অবস্থান

সাহাবা রা.-এর পরে তাবে'ঈগণের রহ. মর্যাদা। পূর্বে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতাংশ : وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ "যারা আন্তরিকতা সহকারে তাঁদের (সাহাবার) অনুসরণ করেন"[৯] এবং নিম্নোক্ত হাদীস এর প্রমাণ :

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"আমার যুগের উম্মাত (Ganeration) সর্বোত্তম, তারপর পরবর্তীগণ [সাহাবীগণ] সর্বোত্তম, তারপর যারা আসবে তারা [তাবে'ঈগণ] সর্বোত্তম ।"[১০]

একারণে ফকীহগণ তাবে'ঈগণের রহ. উক্তি ও মতামত গ্রহণ করেছেন। যেসব তাবে'ঈর ফতওয়া সাহাবীগণের যুগে খ্যাতিলাভ করে এবং মুসলিম সমাজে স্বীকৃতি পায়, যেমন কাযী শুরাইহ, মাসরূক প্রমুখ তাবে'ঈকে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সাহাবা রা.-এর পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেছেন। অন্যান্য তাবে'ঈর উক্তির মোকাবিলায় ফকীহগণ নিজেদের কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং هم رجال ونحن رجال (আমরা যেমন তাঁরাও তেমন মানুষ) এ ধরনের মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

উল্লেখ্য, এ অধ্যায়ের শিরোনামের স্বীকৃত ব্যক্তিত্বের "অভিমত" বলতে কিয়াস ভিত্তিক অভিমত, ইস্‌তিহ্‌সান, ইস্‌তিস্‌লাহ্ এবং সাময়িক ও জরুরী অবস্থায় প্রদত্ত অভিমত ইত্যাদি সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত বোঝান হয়েছে।

---

৮. শরহে মুসাল্লামুস সুবূত

৯. সূরা আত-তাওবা : ১০০

১০. সহীহুল বুখারী, কিতাব : ফাযায়িলুস সাহাবা, বাব : ফাযায়িলু আসহাবিন নাবিয়্যি স. ...., হাদীস নং-৩৪৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'উরফ ও রেওয়াজ : ফিক্‌হের একাদশ উৎস

ইসলামী ফিক্‌হের একাদশ উৎস হচ্ছে 'উরফ (عرف) ও রেওয়াজ (رواج)
ইসলামী ফিক্‌হের বিকাশে 'উরফ ও রেওয়াজের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আরব ও অনারবের অনেকগুলো প্রচলিত রীতি ও রেওয়াজ, যেগুলো আল্লাহ্‌র হিকমত ও ইসলামের মূলনীতির বিরোধী ছিল না এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সুস্পষ্ট বর্ণনা যেগুলোর ব্যাপারে নীরব ছিল, সেগুলোকে সাহাবা রা. ও তাবে'ঈ রহ. এবং তাঁদের পরে ফকীহগণ অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। ফিক্‌হের পুস্তকাদি রচনার যুগে সেগুলো ফিক্‌হ সাহিত্যের অংশে পরিণত হয়।

উদাহরণ: دية (শোণিতপণ) ছিল একশটি উট। রসূলুল্লাহ স.-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব জনৈকা কাহিনা[১] (মহিলাগণক)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী শোণিতপণের এই শিরক গ্রহণ করেছিলেন।[২] সাহাবা রা. ও তাবেঈনের যুগেও এ রীতি প্রচলিত ছিল।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত ভালো রসম-রেওয়াজগুলোকে আইনের উপকরণ (مادة تشريعة) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩] পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের সাথে এই সব সুষ্ঠু রীতি-রেওয়াজের অন্তত আংশিক সম্পর্ক অবশ্যই ছিল। না থাকে তাতেও ক্ষতি নেই যদি তা কল্যাণ-প্রসূত এবং ক্ষতিরোধক হয়।

'উরফের সংজ্ঞা
উরফ-এর আভিধানিক অর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত রীতি, رواج এর সমার্থক শব্দ। ফকীহগণ 'উরফ ও রেওয়াজের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা পেশ করেছেন :

عادة جمهور قوم في قول أو عمل
"কথা বা কর্মে বিপুল জনগণের (جمهور) অভ্যাস (عادة)-এর নাম 'উরফ।"

'উরফের অপর নাম হচ্ছে "التعامل" যা ফকীহদের ভাষায় :

هو عادة الناس فى المعاملات من البيع والشراء وغيرهما
"কেনাবেচা ও অন্যান্য বিষয়ে লোকদের অভ্যাস অর্থাৎ লোকাচার।"

---

১. كاهنة = মহিলাগণক।

২. ইমাম আবু হানীফার ইসলামী আইন প্রণয়ন (উর্দূ), পৃ. ২৬

৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ১২৩

www.pathagar.com

'উর্‌ফ ও আদতের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি শব্দ হচ্ছে "ইস্‌তি'মাল"[৪]। শব্দটি তার আসল অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে শরীয়তের একটি পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফকীহ্গণের নিম্নোক্ত উক্তিতে এর ইঙ্গিত রয়েছে :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

"লোকদের ইস্‌তি'মাল (ব্যবহারিক রীতি) হুজ্জাত বা প্রমাণ। এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।"

আদত-এর সংজ্ঞা

আদত (অভ্যাস)-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

الْعَادَةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النُّفُوسِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ

"আদত বলতে বোঝায়, পৌনপুনিক ব্যাপারগুলোর মধ্যে যা মানুষের মনে ঠাঁই করে নেয় এবং যা সুস্থ প্রকৃতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য।"[৫]

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে :

العادة الامور المتكررة من غير علاقة عقلية

"আদত এমনসব বিষয়কে বলা হয় যেগুলো কোনো প্রকার যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক ছাড়াই বার বার করা হয়।"

কোনো কোনো ফকীহ্ 'উর্‌ফ ও আদতকে একই অর্থে গ্রহণ করেছেন। যেমন উল্লিখিত বক্তব্যগুলো থেকে বুঝা যায়। আবার কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : 'উরফ হচ্ছে 'আম[৬] এবং 'আদত হচ্ছে খাস[৭]। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রত্যেক 'উর্‌ফ অবশ্যই 'আদত হবে কিন্তু প্রত্যেক 'আদতের পক্ষে 'উরফ হওয়া জরুরী নয়।

'আদতের ব্যাপারে ফকীহ্গণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে তাঁদের উক্তি হচ্ছে :

العادة تجعل حكماً إذا لم يوجد التصريح بخلافه فأما عند وجود التصريح بخلافه يسقط اعتباره

"আদতকে বিধানরূপে গণ্য করা হবে যদি তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকে। আর যদি সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ বক্তব্য থাকে তাহলে 'আদতের বিবেচনা হবে না।"[৮]

---

৪. استعمال = ব্যবহার।

৫. আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের, পৃ. ৬৪

৬. عام = ব্যাপক।

৭. خاص = নির্দিষ্ট।

৮. শারহে সিয়ারে কবীর, খ. ১, পৃ. ১৯৮

www.pathagar.com

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণ

কুরআন হাকীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি এর বুনিয়াদ হতে পারে :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, উরফ অনুযায়ী হুকুম দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলো"[৯]

মুফাস্সিরগণের মতে, সমস্ত যৌক্তিক ও প্রচলিত ভালো কথা ও কর্ম 'উরফ-এর অন্তর্ভুক্ত। মা'রূফ (معروف) এবং 'উরফ একই ধাতু থেকে উদ্ভূত এবং সমার্থক। কুরআন মাজীদে মা'রূফ (معروف) শব্দের ব্যবহার বেশী। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"পার্থিব বিষয়গুলো তোমরাই ভালো জানো।"[১০]

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'উদ রা. বলেন :

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح

"মুসলিমরা যে বিষয়টিকে ভালো মনে করে (অবশ্য ইসলামের বুনিয়াদী নীতির বিরোধী না হলে) আল্লাহ্‌র কাছেও তা ভালো এবং মুসলিমরা যা খারাপ মনে করে আল্লাহ্‌র কাছেও তা খারাপ।"[১১]

কিন্তু বলাবাহুল্য এই সাধারণ নীতিটি এমনসব বিষয়ে প্রযোজ্য হবে যেগুলো ইসলামের বুনিয়াদী নীতির বিরোধী নয় এবং যেগুলো তার বিরোধী হবে সেগুলোর ক্ষেত্রে তাকে মেনে নেয়া হবে না।

ফকীহগণের কাছে 'উরফের মর্যাদা

ফকীহগণ 'উরফ ও রেওয়াজকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। যেমন, তাঁরা বলেন, العادة محكمة অর্থাৎ 'আদত একটি সিদ্ধান্তকারী জিনিস। তাদের মতে :

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"যে ব্যাপারটি 'উরফের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তা নস[১২]-এর মাধ্যমে প্রমাণিত ব্যাপারের মতো।"[১৩]

---

৯. সূরা আল-আ'রাফ : ১৯৯

১০. সহীহ্ মুসলিম, কিতাব : আল-ফাযায়িল, বাব : উজূবু ইসতিছালি মা কালাহু শারআন..., হাদীস নং-৬২৭৭

১১. মাজমূ'আহ রাসায়েল ইবনে আবেদীন, পৃ. ১২০

১২. نص = কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তি।

১৩. শারহে সীয়ারে কবীর, খ. ৫, পৃ. ১১৫

www.pathagar.com

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى

"যা 'উরফের সাহায্যে প্রমাণিত তা শরীয়তের দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত মনে করা হবে।"[১৪]

التعين بالعرف كالتعين بالنص

"উরফের সাহায্যে যা নির্ধারিত হয় তা নসের সাহায্যে নির্ধারিত হবার মর্যাদা সম্পন্ন।"[১৫]

ফকীহগণ অনেক মাসায়েলের ক্ষেত্রে 'উর্‌ফ ও রেওয়াজকেই ভিত্তি বানিয়ে হুকুম জারী করেন। কাজেই তাঁরা বলেন :

يفتى على عرف اهل زمانه وان خالف زمان المتقدمين

"সমকালীন 'উর্‌ফ অনুযায়ী ফত্‌ওয়া দেয়া হবে, তা পূর্ববর্তী লোকদের 'উর্‌ফের বিরোধী হলেও।"[১৬]

'উরফ নির্ভরযোগ্য হবার জন্য তার ওপর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আমল হওয়া জরুরী। বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশের আমলের ক্ষেত্রে মুফতী ও কাযীর 'উরফ বিরোধী ফত্‌ওয়া দেয়া বা ফায়সালা করা জায়েয নয়।

انما تعتبر العادة اذا اطورت وغلبت

"যখন আদত বহুল প্রচলিত হয় ও প্রাধান্য বিস্তার করে তখনই তার বিবেচনা হবে।"[১৭]

ফকীহগণ اطورت শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেন :

ان تكون العادة كلية بمعنى انها لا تتخلف

"আদত হবে ব্যাপক এ অর্থে যে তা কখনও পিছিয়ে পড়বে না অর্থাৎ বরাবর প্রচলিত থাকবে।"[১৮]

আর غلبت শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

ان تكون اكثريته بمعنى انها لا تتخلف

"অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর প্রচলন থাকতে হবে, পিছিয়ে পড়বে না।"[১৯]

'উরফ-এর প্রমাণ

দুই প্রকার 'উরফ

ফকীহগণের বর্ণনা অনুযায়ী 'উরফ দুই প্রকার :

---

১৪. মাজমূআহ রাসায়েলে ইবনে আবেদীন, পৃ. ১১৫

১৫. মা'আরিফ

১৬. রদ্দুল মুহতার

১৭. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়েব, পৃ. ৬৫

১৮. আল 'উরফু ওয়াল আদাত ফী রাইল ফুকাহা, মা'আরিফ থেকে।

১৯. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

১. 'উরফে খাস (خاص) এবং
২. 'উরফে আম (عام)

কোনো বিশেষ এলাকায়, পেশায় বা বিশেষ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত 'উরফ-কে 'উরফে খাস বলে।
আর 'উরফে আম বলা হয় ব্যাপকভাবে প্রচলিত 'উরফ-কে, যা কোনো শ্রেণী বা এলাকা ইত্যাদির সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হয় না।

'উরফের ওপর নির্ভর করার বিস্তারিত রূপ

কিন্তু এই 'উরফকে এমন অবস্থায় নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নেয়া হবে যখন :

১. 'উরফ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র হুকুম বিরোধী হবে না, যাতে 'উরফের ওপর আমল করতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহ ত্যাগ করা অপরিহার্য হয়ে না পড়ে। যদি এমন অবস্থা দেখা দেয় তাহলে 'উরফের ওপর আমল করা হবে না। বরং এক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ওপরই আমল করা হবে। তবে 'উরফ ও রেওয়াজের ওপর যে অবস্থাটি ভিত্তিশীল হবে, সে ধরনের অবস্থায় 'উরফ বদলে গেলে হুকুমও বদলে যাবে। কিন্তু এ অবস্থায় 'উরফ কুরআন ও হাদীসের ফায়সালাকে বদলে দেবার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে না। বরং এ অবস্থায় বলা হবে, পূর্ববর্তী হুকুম 'উরফের ওপর ভিত্তিশীল হবার কারণে ঠিক ততোদিনের জন্য ছিল যতোদিন সংশ্লিষ্ট 'উরফ বিদ্যমান ছিল। যেমন, রসূলুল্লাহ্ স. কোনো কোনো জিনিসকে ওজনদার (ওজন করে বিক্রি করা জিনিস) গণ্য করে তার হুকুম বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সেগুলো পরিমেয় (পরিমাপ করে বিক্রি করা জিনিস) হয়ে গেছে। অথবা তিনি পরিমেয় হবার কারণে তাদের হুকুম বর্ণনা করেছিলেন কিন্তু এখন সেগুলো ওজনদার হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে 'উরফের কারণে সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলোর হুকুমও বদলে যাবে।

২. 'উরফ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সাধারণ হুকুমের বিরোধী হবে না। যদি হুকুমের কোনো একটি অংশের বিরোধিতা পাওয়া যায় তাহলে এহেন অবস্থায় সাধারণ হুকুম থেকে এই বিশেষ অংশকে 'উরফের কারণে আলাদা গণ্য করা হবে। যেমন রসূলুল্লাহ্ স. এমন প্রত্যেকটি জিনিসের কেনা-বেচা নাজায়েয গণ্য করেছেন যা বিক্রেতার কাছে বর্তমান নেই। কিন্তু মুচির সাথে জুতা তৈরী করার জন্য যে চুক্তি করা হয় সেখানে মুচির কাছে জুতা উপস্থিত থাকে না। বরং পরে সে তৈরী করে দেয়। ফকীহ্গণ 'উরফের কারণে এ অবস্থাটিকে জায়েয গণ্য করেছেন।

www.pathagar.com

৩. 'উরফ যদি কিয়াসভিত্তিক হুকুমের বিরোধী হয় তাহলে 'উরফ খাস হোক, আম হোক, এক্ষেত্রে কিয়াস ত্যাগ করে 'উরফের ওপর আমল করা হবে।

৪. যে বিধানগুলোর ভিত্তি নিছক 'উরফের ওপর প্রতিষ্ঠিত 'উরফ বদলে গেলে সেগুলোও বদলে যাবে। কারণ 'উরফের স্থায়িত্বের সাথে তাদের স্থায়িত্বের মেয়াদ জড়িত ছিল।

ইমামগণের বিরোধমূলক মাসায়েলের বৃহদংশে 'উরফের দখল রয়েছে। এক সময়ের 'উরফ এক রকম ছিল পরে তা বদলে গেছে। অথবা এক এলাকার 'উরফ এক ধরনের ছিল অন্য এলাকার 'উরফ ছিল অন্য ধরনের। এসব অবস্থায় বিধানের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য। অন্যথায় ফিক্‌হকে ইসলামের বুনিয়াদী নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

মানুষের গড়া আইনে 'উরফের অবস্থান

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি 'উরফ ও রেওয়াজকে আইনগত মর্যাদা দেয়া হয় না। কতগুলো শর্তে আদালত তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। শর্তাবলীর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো :

১. 'উরফ যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। এই প্রেক্ষিতে আইনের একটি Maxim বা স্বীকৃত নীতি হচ্ছে : "কুপ্রথা বাতিলযোগ্য", অর্থাৎ 'উরফের গ্রহণযোগ্যতা জনকল্যাণের শর্তের সাথে জড়িত।

২. 'উরফ অপরিহার্য হতে হবে অর্থাৎ জনগণ তাকে ওয়াজিব ও জরুরী বলে বিশ্বাস করতে হবে। কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারমূলক চাপিয়ে দেয়া রেওয়াজ 'উরফের মর্যাদা পাবে না।

৩. 'উরফ দেশের আইনের পরিপন্থী হলে তা অগ্রাহ্য হবে। আইন প্রণয়ন সংস্থা (যথা পার্লামেন্ট) কর্তৃক রচিত আইনের সাথে সঙ্গতি থাকা আবশ্যক, অন্ততপক্ষে বিরোধ থাকবে না।

৪. সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জারী থাকা (Long Standing Custom হওয়া) জরুরী। আগে শর্ত ছিল 'উরফ হবে স্মরণাতীত কালের, কিন্তু পরে এই শর্ত শিথিল করা হয়েছে; সুনির্দিষ্ট রেওয়াজ এবং তদনুযায়ী জনগণের আমল প্রমাণিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। তবে, গ্রহণযোগ্যতার জন্য এখনও রেওয়াজের সূচনাকাল প্রমাণ করা জরুরী মনে করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত মেয়াদের শর্তটি খ্রিষ্টান গির্জাধ্যক্ষগণ রোমান আইন থেকে গ্রহণ করেছিল।

৫. সাধারণ আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। রসম ও রেওয়াজ যদি পুরোনো হয় তাহলে তার সাধারণ আইনের মধ্যে বিভিন্নতা থাকা উচিত নয়। এই শর্তের সম্পর্ক হচ্ছে নতুন রসমের সাথে।

www.pathagar.com

ফকীহ্গণ প্রায়ই 'উরফ ও রেওয়াজের দীর্ঘস্থায়িত্বকে বেশী গুরুত্ব দেননি। যেমন, সাহাবায়ে কিরামের সময়কাল থেকে তার প্রচলিত হওয়া অপরিহার্য নয়। বরং পরে যখনই তার রেওয়াজ শুরু হবে তখন তার ওপর নির্ভর করা যাবে। এমন কি 'উরফ ও রেওয়াজ নসে বিধৃত যে সমস্ত বিধানের 'ইল্লাত স্থিরীকৃত হবে সেসব বিধানের ক্ষেত্রে প্রতি যুগেই এই 'ইল্লাত জারী হবে এবং 'উরফ বদলে যাওয়ার সাথে সাথে বিধানের রূপও বদলে যেতে থাকবে। এটিই গবেষক ফকীহ্গণের অভিমত।

ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে :

أن المعتبر العرف الطارئ بأنه لا يخالف النص بل يوافقه

"(উল্লিখিত অবস্থাগুলোতে) প্রচলিত 'উরফই বিবেচনাযোগ্য হবে এই অবস্থায় যে, তা নসের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধী নয় বরং অনুকূল।"[২০]

অনুরূপভাবে এক স্থানের বা দেশের 'উরফ ও রেওয়াজ অনুযায়ী অন্য স্থানের ও দেশের লোকদের কাজ করা জরুরী নয়। বরং সেখানকার 'উরফ ও রেওয়াজ অনুযায়ী সেখানকার লোকদের জন্য ভিন্নতর বিধান হবে।

'উরফ ও রেওয়াজের আরো কতিপয় রূপ

শরয়ী 'উরফ ও সমকালীন লোকদের 'উরফের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সমকালীন লোকদের 'উরফ গৃহীত হবে এবং শরয়ী 'উরফ গৃহীত হবে না। ফকীহ্গণ ইয়ামীন (কসম) অধ্যায়ে বিশেষ করে এই অগ্রবর্তিতাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন, কোনো ব্যক্তি কসম খেলো সে কার্পেটের বিছানায় বা শতরঞ্জির ওপর বসবে না। কিন্তু তারপর সে মাটিতে বসলো। এ অবস্থায় সে হানেস (কসম ভঙ্গকারী) গণ্য হবে না। অথচ কুরআন মাজীদে (শরয়ী 'উরফ) মাটি বা ভূমিকে বিছানা বা কার্পেট বলা হয়েছে। যেমন : আল্লাহ্‌র বাণী,

جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا

"যিনি বানিয়েছেন ভূমিকে তোমাদের জন্য বিছানা বা কার্পেট।"[২১]

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি গোশত খাবার কসম খেলো। সে মাছ খেয়ে ফেললো। এ অবস্থায় কুরআন মাজীদে (শরয়ী 'উরফ) মাছকে গোশত বলা সত্ত্বেও সে কসম ভঙ্গকারী গণ্য হবে। এই সর্বজনীন নিয়মের কতিপয় ব্যতিক্রমও ফকীহ্গণ বর্ণনা করেছেন। ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।[২২]

---

২০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪

২১. সূরা আল-বাকারা : ২২

২২. আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৬৭

www.pathagar.com

সংক্ষেপে বলা যায়, লোকদের মধ্যে চিরকাল যেসব রেওয়াজ ও আচার প্রচলিত হয়ে এসেছে সেগুলো সব একত্র করে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

১. এর বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে শরয়ী দলীল রয়েছে।

২. শরয়ী দলীল নেই ঠিকই, তবে তা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। প্রথম অবস্থাটি সম্পর্কিত হুকুম সুস্পষ্ট। অর্থাৎ অন্যান্য শরয়ী বিষয়গুলোর মতো এরও বৈধতা ও অবৈধতার ফায়সালা শরয়ী হুকুমের মাধ্যমেই হবে। নিছক অভ্যাস ও রেওয়াজের কারণে খারাপ জিনিস ভালো গণ্য হবে না। আবার ভালো জিনিসও খারাপ গণ্য হবে না। তবে দ্বিতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো তাকে কার্যকর করার ব্যাপারটি স্থগিত রাখার আবার কখনো নিঃশেষ করে দেবার অবকাশ রয়েছে। ফকীহ্‌গণ-এর কয়েকটি রূপ বর্ণনা করেছেন। ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দেখা যেতে পারে।[২৩] সংক্ষেপে ফিক্‌হের এই ব্যাখ্যাটুকুই যথেষ্ট :

ما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس لانها دلالة

"যার পক্ষে শরীয়তের কোনো দলীল নেই তার ফায়সালা লোকদের অভ্যাস অনুযায়ীই হবে। কারণ তার মাধ্যমে পথ নির্দেশনা হয়।"

"ফিক্‌হের উসূল ও সর্বজনীন নীতি" অধ্যায়ে 'উরফ ও আদতের কোনো কোনো দিক সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

---

২৩. আল-মুওয়াফাকাত ইত্যাদি।

www.pathagar.com

দেশজ আইন : ফিক্‌হের দ্বাদশ উৎস

ইসলামী ফিক্‌হের দ্বাদশ উৎস হচ্ছে দেশজ আইন। 'উরফ ও রেওয়াজ অধ্যায়ে কুরআনের যেসব আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে, দেশজ আইনের সমর্থনেও সেগুলো পেশ করা যেতে পারে। ইসলামী দাওয়াতের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে الامر بالمعروف। অর্থাৎ সৎকর্মের আদেশ দান, আর মা'রূফ-এর ব্যাপক পরিধিতে এমনসব দেশজ আইনও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং শরীয়ত ও বিবেক বিরোধী নয়। ইরশাদ হচ্ছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

> "সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত। তোমাদের অভ্যুদয় ঘটান হয়েছে মানুষের (সংশোধন ও হেদায়াত তথা সৎপথ দেখাবার) জন্য; তোমরা সৎকাজের হুকুম দেবে, অসৎকাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার হবে।"[১]

উম্মতে মুহাম্মদী স. দুনিয়ার যেখানেই গিয়েছে সেখানকার ভালো (معروف) রসম-রেওয়াজ ও আইনকে উৎসাহিত করেছে উপর্যুক্ত আয়াতের আলোকে এবং প্রেরণায়। এগুলো ছিল পূর্ববর্তী শরীয়তের অবশিষ্টাংশ এমন ঢালাও দাবী ভিত্তিহীন। সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে প্রত্যেক দেশের অধিবাসীরা কতিপয় আইন অবশ্যই রচনা করেছিল, তার সাথে পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের সম্পর্কও অবশ্যই ঘটেছে, তা আংশিক হোক বা সামগ্রিক; যদিও যথাযথ রেকর্ডের অভাবে তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

দেশজ আইনের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ স. কী করেছিলেন?

রসূলুল্লাহ্ স. তদানিন্তন আরবে প্রচলিত বহু আইন প্রয়োজনমত সংশোধন ও পরিবর্তন করে গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী কোন শরীয়তের সাথে সম্পর্কের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেননি। পরবর্তীকালে এই আইনগুলো ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থগুলোতে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু এই গ্রহণের প্রতি পর্যায়ে সমাজের অবস্থা ও গণচেতনার যথাযথ পরিমাপ করা হয় এবং যেগুলোতে গ্রহণ করা হয় সেগুলোকে এমনভাবে ইসলামের ছাঁচে ঢালাই করা হয় যার ফলে সেগুলো

---

১. সূরা আলে ইমরান : ১১০

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়তের কাঠামোয় পুরোপুরি ফিট হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ স. তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত নিম্নোক্ত আইনগুলো গ্রহণ করেছিলেন :

(১) اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
(মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে) প্রমাণ পেশ করা বাদীর দায়িত্ব, যে ব্যক্তি দাবী অস্বীকার করে (বিবাদী) তার ওপর কসম বা শপথ ওয়াজিব।[২]

(২) বিবাহের ব্যাপারে কয়েকটি পদ্ধতি যথা ইজাব, কবুল, মোহর ইত্যাদি।

(৩) সম্পত্তি ব্যবহার ও হস্তান্তরের কয়েকটি পদ্ধতি যথা: বিক্রয় (بيع), হিবা (هبة), রেহেন (رهن), ইজারা (اجارة) ইত্যাদি। ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি যাতে ঝগড়া সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল তা বাদ দেয়া বা তাতে শর্তারোপ করা হয়েছিল।

বাই/بيع (বেচাকেনা)-এর বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন ছিল। বাই সরফ, বাই সালাম, মুরাবাহা, তাওলিয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদের সাথে জড়িত অবস্থাগুলোকে বাতিল গণ্য করে সঠিক অবস্থাগুলোর প্রচলন করা হয়। ফিক্হ শাস্ত্রে এ সবগুলোর বিধান রয়েছে।

(৪) অসিয়্যাতের (وصية) নিয়ম।

(৫) আইন প্রয়োগ করা এবং বলবৎ রাখার কতিপয় পদ্ধতি ইত্যাদি।

মূলত প্রচলিত আইনগুলোর মধ্যে যেটিই ইসলামী আইনের অনুকূল ছিল অথবা ইসলামী আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে সহযোগীর ভূমিকা পালন করতো সেই ধরনের সমস্ত আইন রসূলুল্লাহ স. গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আর যার মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল সেটিতে সংশোধন ও কাটছাট করে ইসলামী আইনের অনুকূল করে নিয়েছিলেন।

ভিনদেশের মুসলিমদের সংস্পর্শ- তাদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ

রসূলুল্লাহ স.-এর পর সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী মুসলিমগণ বহু দেশ ও জাতির সংস্পর্শে এসেছিলেন প্রধানত ব্যবসায় উপলক্ষে এবং সামরিক অভিযান সূত্রে। সিরিয়ায় ও মিসরে তাঁরা রোমীয় এবং ইরাকে ইরানী আইন, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির মুখোমুখি হতেন। ইয়ামেনেও ইহুদি, রোমীয় ও ইরানী প্রভাব ছিল। উসমান রা.-এর খিলাফত আমলে ইসলামের বিজয় অভিযান পশ্চিম চীন থেকে স্পেনের কিছু অংশ পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। এই বিস্তৃত এলাকার দেশগুলোতে প্রাচীন কয়েকটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বিভিন্ন প্রকার আইনেরও প্রচলন ছিল। মুসলিমগণ বিজিত দেশগুলোর ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদির সংরক্ষণ করতেন, তাদের বৈষয়িক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, তাদের সামাজিক

---

২. আস-সুনানুল কুবরা, কিতাব : আদ-দাওয়া ওয়াল বায়্যিনাত, বাব : আল-বায়্যিনাতু আলাল মুদ্দাঈ ওয়াল ইয়ামীনু আলাল মুদ্দাআ আলাইহি, হাদীস নং-২১৭৩৩

www.pathagar.com

আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব দেশজ ও ধর্মীয় আইনে হস্তক্ষেপ করতেন না।

মুসলিম শাসকগণ তাদের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাও অক্ষুণ্ন রাখেন। সেগুলো ছিল :

أحرار في شهاداتهم ومناكحاتهم ومواريثهم وجميع أحكامهم

"সাক্ষ্যদান, বিবাহ-শাদী, উত্তরাধিকার ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে তারা স্বাধীন ছিল (নিজেদের আইন কার্যকরী ছিল)।"[৩]

দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিজিত দেশসমূহের অফিস আদালতের কাজকর্ম স্থানীয় ভাষায় চলার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কাজেই ইরাকে ফারসী ভাষায়, সিরিয়ায় রোমান ভাষায় এবং মিসরে কিব্তী (Coptic) ভাষায় কাজ চলতো। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সময় আরবী সরকারী ভাষা রূপে প্রবর্তিত হয়েছিল।

যুদ্ধরত বা বিজিত দেশসমূহের অমুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মুসলিমগণ চুক্তির শর্তগুলো পালন করতেন। এমনকি মুসলিম সেনাপতি হেম্‌স-এর অধিবাসীদেরকে তাদের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্বের অর্থ ফেরৎ দিয়েছিলেন যখন তিনি রণকৌশল স্বরূপ হিম্‌স ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করে শত্রুর মোকাবিলা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন- কারণ তিনি করদাতার অধিকার ও নিরাপত্তা দিতে পারলেন না। মুসলিম শাসকগণ সাধরণত বিজিত দেশের অমুসলিমদের বিধি-বিধান ও রীতি-রেওয়াজের প্রতি যথাসম্ভব সহানুভূতিশীল ছিলেন।

উমর রা. বিজিত দেশের বহু আইন অক্ষুণ্ন রাখেন

১. ইরাক, সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর উমর রা. রোমান, গ্রীক ও ইরানী ভূমিকর ও রাজস্ব আইনের বৃহদাংশ অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। তবে এই সঙ্গে তিনি জুলুম ও অন্যায়মূলক ব্যবস্থা এবং কৃষকদের ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বনের আইন সংশোধন ও পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।[৪]

২. নগর শুল্কের ক্ষেত্রে আইন ছিল, বিদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে তেমন ব্যবহার করা হবে যেমন তারা নিজেদের দেশের আইন অনুযায়ী মুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে করে থাকে।

এভাবে মুসলিমগণ অন্য জাতিদের ও দেশের কোনো কোনো ভালো আইন গ্রহণ করার ব্যাপারে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করেননি। বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে এ ধরনের বিনিময় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিবার্য বিষয় ছিল।

---

৩. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১০১

৪. বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন লেখকের উর্দু ভাষায় লিখিত গ্রন্থ : ইসলাম কা যারঈ নিযাম (ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা)।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

"জ্ঞানগর্ভ কথা মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানেই সে তা পাবে সে-ই হবে তা গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশী হকদার।"[৫]

"কালেমাতুল হিকমাহ্"- এর মধ্যে সমস্ত ভালো জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইসলামী ফিক্হের ভিত্তি কি বিদেশী আইনের ওপর স্থাপিত?

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ অবশ্য এমন ধরনের কথাই লিখেছেন। তারা বলেছেন, ইসলামী ফিক্হ রোমান আইন থেকেই গৃহীত। কেউ কেউ তো একে রোমান আইনেরই ভিন্ন রূপ বলে অভিহিত করেছেন। প্রমাণ হিসেবে তারা নিচে উল্লিখিত কয়েকটি উদাহরণ পেশ করে থাকেন :

১. ইসলামী আইনের অন্যমত নীতি :

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

এ নীতিটি রোমান আইনেও পাওয়া যায়।

২. পারস্পরিক লেনদেন ও অর্থনৈতিক কতিপয় বিধানের মধ্যে রোমান আইনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

৩. কোনো কোনো পরিভাষাগত শব্দ যেমন 'ফিক্হ' ও 'ফকীহ'-এর সমার্থক শব্দের ব্যবহার রোমানদের মধ্যেও ছিল।

৪. ইসলামের বিজয় অভিযানকালে সিরিয়ার কাইসারীয়া ও অন্যান্য স্থানে রোমান আইনের কোনো কোনো শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৫. এমন কতিপয় প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল যেগুলোতে রোমান আইন কার্যকরী ছিল।

মাত্র গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত অথবা কোনো আইনের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য এ কথা প্রমাণ করে না যে, ইসলামী ফিক্হের বিরাট ভাণ্ডার রোমান আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিছুটা সম্পর্ক অস্বাভাবিক নয়, বরং স্বীকার্য।

---

৫. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : আল-ইলম, বাব : ফাযলুল ফিকহ ফিল ইবাদাহ, হাদীস নং-২৬৮৭। হাদীসটি খুবই দুর্বল (ضعيف جدا)।

www.pathagar.com

উপসংহার

শরীয়তের উৎস সম্পর্কিত এই বিস্তারিত আলোচনার উপসংহারে আল্লামা শাতিবী রহ.-এর একটি বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেন :

> الأدلة الشرعية ضربان أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض ... فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة وأما الثاني فالقياس والاستدلال ... إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل وإنما أثبتناه بالأول إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه

> "শরীয়তের দলীল সমূহ (উৎস) আসলে দুই প্রকার। এক, যাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র নকল (النقل)-এর সাথে। দুই, যাদের সম্পর্ক কেবল রায় (الرأى)-এর সাথে।... প্রথম প্রকার দলীলের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ (النقل)এবং দ্বিতীয় প্রকার দলীলের ভিত্তি হচ্ছে কিয়াস ও ইস্‌তিদ্‌লাল (الرأى)।... কিন্তু দলীল মূলত কুরআন ও সুন্নাহ-তে সীমাবদ্ধ। কিয়াস ও ইস্‌তিদ্‌লাল কেবল বুদ্ধির সাহায্যে দলীল রূপে প্রমাণিত হয়নি, বরং কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই আমরা তার প্রমাণ করেছি; এটাই رأى-এর নির্ভযোগ্যতার ভিত্তি।"

ইসলামী আইনে বুনিয়াদি ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ, বুদ্ধি তার অনুসারী মাত্র। অন্যদিকে মানব রচিত আইন অধিকতর বুদ্ধি নির্ভর। ধর্মের নাম যদি এবং যতটুকু নেয়া হয় তা রাজনৈতিক কারণে নেয়া হয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ফিক্‌হের মূলনীতি (اصول) ও সামগ্রিক নীতি (كليات)

ফিক্‌হে ইসলামীর কয়েকটি ব্যাপক নিয়ম যাকে আমরা Legal Maxim-এর সাথে তুলনা করতে পারি, এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো। ইসলামের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ যথেষ্ট পরিমাণে এই সামগ্রিক নীতি মালার (كليات) সাহায্য নিয়েছেন। এ জাতীয় নিয়ম বা সূত্রগুলো আইনগত সামগ্রিক নীতিতে পরিণত হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা এগুলোকে সামগ্রিক নীতি আখ্যায় আখ্যায়িত করবো।

সামগ্রিক নীতি : ১

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"কষ্টসাধ্য সহজতর বিধান আকর্ষণ করে বা চাহিদা সৃষ্টি করে।"

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এর সমর্থন পাওয়া যায় :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান, যা কঠিন তা চান না।"[১]

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا

"আল্লাহ চান তোমাদের বোঝা হালকা করে দিতে এবং মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে ।"[২]

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো ওপর তার ক্ষমতার বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।"[৩]

ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের জন্যও রসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়ত ছিল রহমত। এ সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"আল্লাহ্‌র রসূল নামিয়ে দিচ্ছেন তাদের সেই বোঝা এবং সেই জিঞ্জির যা তাদের ওপর (জগদ্দল পাথরের মত) চেপে ছিল।"[৪]

---

১. সূরা আল-বাকারা : ১৮৫
২. সূরা আল-বাকারা : ২৮
৩. সূরা আল-বাকারা : ২৮৬
৪. সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৭

www.pathagar.com

আয়াতে যে বোঝা আর জিঞ্জিরের কথা বলা হয়েছে তার কিছুটা আল্লাহ্ ইহুদীদের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ তাদের ওপর চাপিয়েছিলেন। বাকী ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের ওপর চাপিয়েছিল তাদের ধর্মীয় নেতা যাজক পুরোহিতরা। এদের বাড়াবাড়ি (غلو في الدين)-তে তাদের ধর্ম তাদের ওপর জগদ্দল পাথরের মত গুরুভার বোঝায় পরিণত হয়েছিল। শরীয়তে ইসলামে সে সব বোঝা থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা ছিল এবং রসূলুল্লাহ স. এ সব বোঝা নামিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ স. এ প্রসঙ্গে বলেন :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ

"দীন অবশ্যই সহজ, কেউ তার মধ্যে অযথা বাঁধন-কষণ যোগ করলে দীন অবশ্যই তাকে পরাভূত করবে অর্থাৎ সে দীনের অনুসরণ মুশকিল হবে।"[৫]

রসূলুল্লাহ্ স. মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করাকে নবুওয়াতের অংশ গণ্য করে বলেন :

وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

"মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন নবুওয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।"[৬]

আলোচ্য مشقة বা কষ্টের অর্থ

ফকীহগণ প্রত্যেকটি কষ্টকে আলোচ্য مشقة-এর মধ্যে শামিল করেননি, বরং এরও সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্‌র হিকমত ও মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেয়ার পক্ষপাতি নয় যাতে আরামপ্রিয় ও অদূরদর্শী লোকদের হাতে দীন খেলনায় পরিণত হয়ে যায়।

শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করবে, কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করবার সাহস ও শক্তি লাভ করবে।

একথা সুস্পষ্ট, মানুষের জীবনে তখনই এসব গুণের প্রকাশ ঘটতে পারে যখন তার জৈব প্রকৃতির ওপর নৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপিত হবে এবং গ্রহণ ও বর্জনের নৈতিক ও আইনগত বিধানের আওতাধীনে সে জীবন যাপন করবে। এ ছাড়া মানুষের জীবন গড়ে ওঠতে পারে না এবং একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

এটা কেমন করে সম্ভব, ইন্দ্রিয় লালসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিধি-বিধান ও আইন-কানুন নির্ধারণ করা হবে এবং সেখানে মানুষ মামুলি কষ্ট ও শ্রমও বরদাশত করবে না? তা ছাড়া একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে

---

৫. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : আদ-দীনু ইউসরুন, হাদীস নং-৩৯
৬. সুনানু আবি দাউদ, কিতাব : আল-আদাব, বাব : ফিল অকার, হাদীস নং-৪৭৭৮

www.pathagar.com

তোলার জন্য কাঁটাগাছের ঝোপ-ঝাড়ও যেমন পার হতে হবে তেমনি আবার আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা আকাঙ্খা ও কামনা-বাসনার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপের ক্ষেত্রেও সর্বত্র সহজ ও নরম নীতি অবলম্বনের পথ উন্মুক্ত থাকতে হবে। মানুষের জীবনের কোনো বিভাগই কিছুটা مشقة-এর আওতা বহির্ভূত নয়। এমনকি আহার-বিহার ইত্যাদি জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারগুলোও কষ্ট ও শ্রম মুক্ত নয়। একারণে প্রখ্যাত ফকীহ্ ইমাম আশ-শাতিবী রহ. বলেন :

> فأحوال الإنسان كلها كلفة فى هذه الدار فى أكله وشربه وسائر تصرفاته ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات
>
> "এই দুনিয়ায় মানুষের সমস্ত অবস্থাই কষ্টসাধ্য। এমনকি তার পানাহার এবং অন্য সমস্ত কর্মও শ্রম মুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে ও সব কর্মের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, যাতে সে তার কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন না হয়ে যায়।"[৭]

এ অবস্থায় শরীয়তের বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে কষ্ট ও শ্রমকে পুরোপুরি বাদ দেয়া কেমন করে সম্ভব ? এবং প্রত্যেকটি মামুলি কষ্ট ও শ্রমের ক্ষেত্রে সহজ ও হালকা নীতি অবলম্বনের সুযোগ দেবার দাবী করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?

দুনিয়ার কোনো কাজই কষ্ট মুক্ত নয়

একথা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখা উচিত, ফকীহ্গণ প্রত্যেকটি কষ্ট ও পরিশ্রমকে আলোচ্য কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে গণ্য করেননি। এবং সহজ ও হালকা করার নীতিকেও এত বেশী ব্যাপকতা দান করেননি যার ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো সময় তার পথ বের করে নিতে পারে।

পার্থিব সংগ্রামের ক্ষেত্রে মানুষকে যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয় জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য ততটুক কষ্ট অপরিহার্য এবং একটি বিশেষ পরিমাণ কষ্ট সুস্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি বজায় রাখার জন্যও প্রয়োজনীয়।

কাজেই যারা দৈহিক কষ্টের কাজ করে না তারাও নিজেদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক কাঠামো অটুট রাখার জন্য সামান্য কষ্ট করতে বাধ্য হয়। নয়তো তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। এভাবে দেখা যায় কষ্টের বেশ একটা অংশ মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য। একে বাদ দিয়ে মানুষ কোনোক্রমেই চলতে পারে না। আবার এর আর একটা অংশকে গ্রহণ না করলে জীবন যুদ্ধে তার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভবপর নয়।

---

৭. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১২৩

www.pathagar.com

এই দু'ধরনের কষ্টকে مشقة-এর পরিবর্তে محنة (পরিশ্রম) বলাই ভালো। ফকীহগণের পরিভাষায় একে অভ্যাস সংশ্লিষ্ট (معتاد) কষ্ট বলা হয়। শরীয়ত এ দু'ধরনের কষ্টের ব্যাপারে প্রধানত কোনো রুখ্‌সাত বা সহজ ব্যবস্থার সুযোগ দেয়নি। কিন্তু যে কষ্ট অভ্যাসের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করার মতো নয় অথবা যার পরিমাণ এত বেশী যে, জীবনকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তা কল্যাণকর হবার পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় তার মধ্যে শরীয়তে রুখ্‌সাত-এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম আশ-শাতিবী রহ. এ দু'ধরনের কষ্টের পরিচিতি এবং পার্থক্য সম্পর্কে বলেন,

> إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه وإلى وقوع خلل فى صاحبه فى نفسه أو ماله أو حال من أحواله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد فى العادة مشقة
>
> "(যে ধরনের কর্মে مشقة-এর দরুণ تيسير অর্থাৎ সহজসাধ্য বিধানের প্রয়োজন পড়ে) সে কর্মটি এমন-যদি তা সর্বক্ষণ করা হয় তাহলে কর্মীর জানমালের ক্ষতি হয় অথবা তার কোনো না কোনো অবস্থায় বিরূপ পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে সে কাজটি সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের مشقة কে অভ্যস্থ (معتاد) কষ্ট বহির্ভূত মনে করা হবে (এবং এতে تيسير প্রয়োজন হবে)। আর যে مشقة-এ উপরোক্ত কোন অবস্থার উদ্ভব প্রায়শ হয় না ফকীহগণ তাকে তাঁদের পরিভাষাগত مشقة বলে গণ্য করেন না।"[৮]

অর্থাৎ যে শরয়ী বিধানসমূহ ব্যক্তির কর্মক্ষমতার প্রেক্ষিতে এমন পর্যায়ভুক্ত হবে যে, তার ওপর নিয়মিত আমল করলে ধন-প্রাণের ক্ষতি হয় অথবা মানুষের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হয়ে যেতে থাকে, এ ধরনের কষ্টের কাজ হালকা ও সহজ করার দাবী করে। আর যেসব বিধান এমন নয় সেগুলো কষ্টের আওতাধীন হবে না এবং সেগুলো সহজ ও হালকা করারও অবকাশ নেই।

মুশাক্কাত (مشقة)-এর প্রকারভেদ

উসূলে ফিক্‌হে মুশাক্কাত দুই ভাগে বিভক্ত :

১. যথার্থ (واقعی) মুশাক্কাত এবং

২. কাল্পনিক (وهمی) মুশাক্কাত।

প্রথমোক্ত মুশাক্কাত সহজতর বিধানের (اسباب) কারণ রূপে গণ্য। এই কারণসমূহ নিম্নরূপ :

---

৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৩

www.pathagar.com

১. সফর (سفر), ২. রোগ (مرض), ৩. ইকরাহ (اكراه / জোর-জবরদস্তি), ৫. জাহ্‌ল (جهل / অজ্ঞতা), ৬. 'উস্‌র (عسر / মুশকিল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া), ৭. 'উমূমুল বালওয়া (عموم البلوى / দুর্যোগের ব্যাপকতা), ৮. নুক্‌স (نقص / প্রকৃতিগত অক্ষমতা), ৯. উম্মাদ অবস্থা (جنون), ১০. সংজ্ঞাহীনতা (غشى), ১১. নিদ্রা (نوم), ১২. অল্প বয়স (صغر) ইত্যাদি (সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)।

যথার্থ কষ্টের একটি দৃষ্টান্ত : রুগ্নাবস্থায় রমযান মাসের ফরয সওম ভঙ্গ করা জায়েয। কারণ, তাতে যথার্থ মুশাক্কাত বিদ্যমান। অদ্রূপ একজন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো অভিজ্ঞ ও পারদর্শী চিকিৎসকের অভিমতের ভিত্তিতে ঐরূপ সওম ভাঙতে পারে যদিও সে সম্প্রতি সওম রেখে যাচাই করে নাই সওম রাখলে তার যথার্থ মুশাক্কাত হবে কি না।

ফকীহগণ রুখসাত (رخصة) অর্থাৎ সহজতর বিধান দানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক। তাই উল্লিখিত উদাহরণেও তাঁদের বিধানের আসল রূপ হচ্ছে : প্রথমে রোগীকে সওম রেখে দেখতে হবে; যদি অসহ্য হয় তাহলেই রুখ্‌সাত-এর আশ্রয় নিতে হবে। অবশ্য বিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বা ডাক্তারের পরামর্শেও রুখ্‌সাতের আশ্রয় নেয়া যাবে; কারণ 'ইল্লাত পাওয়া গেলে হুকুমও স্থিত হয়।

খেয়ালী মুশাক্কাতের একটি উদাহরণ : এক ব্যক্তি দুই/তিন দিন অন্তর একদিন কিছুক্ষণ জ্বরে ভোগে, অন্য দিনগুলোতে প্রায় সুস্থ এবং সওম রাখতে সক্ষম থাকে। সে রুখ্‌সাতের দাবীদার হবে যখন বাস্তবে জ্বর আসে। তেমনি মেয়েলোক রুখ্‌সাত পাবে যখন বাস্তবে ঋতু শুরু হয়। তার আগে নয়, কারণ 'ইল্লাতের সম্ভাবনা থাকলেও জ্বর আসার কিংবা ঋতু শুরু হবার পূর্বে 'ইল্লাত অনুপস্থিত, সুতরাং হুকুমও স্থিত হবে না। অন্যপক্ষে পালা মতো জ্বর না আসা কিংবা ঋতুস্রাব না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, কারণ পালা এবং অভ্যাস বদলায়।

কাল্পনিক বা সাধারণ রকমের মুশাক্কাত সহ্য করে নেয়া যায়, শরীয়তের বিধান পালনের মহান উদ্দেশ্যে তা সহ্য করে নেয়াই কর্তব্য।

তেমনিভাবে মেয়েদের ঋতু শুরু হবার নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ঋতু শুরু না হওয়া পর্যন্ত তারা রুখ্‌সাত লাভের অধিকারী গণ্য হবে না। মোটকথা এই ধরনের অবস্থাগুলোর শুধুমাত্র অভ্যাসগতভাবে 'ইল্লাত বর্তমান থাকাটাই যথেষ্ট হবে না। বরং তার সশরীরে উপস্থিত থাকাটাই জরুরী। কারণ অনেক সময় অভ্যাস বিরোধী কাজ হতে থাকে এবং অভ্যাস বদলায়ও। যদি একে ভিত্তি বানিয়ে নেয়া হয়, তাহলে বিধানের ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলা কায়েম রাখা যাবে না। আর এই নিয়ম শৃঙ্খলাই হচ্ছে শরীয়তের প্রাণ।

www.pathagar.com

কষ্টের স্তর বিভাগ

ফকীহগণ কষ্টের স্তর বিভাগও করেছে। এরি ভিত্তিতে তারা রুখ্‌সাত ও সহজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যেমন :

১. এর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, কোনো হুকুমের ওপর আমল করতে গিয়ে মানুষকে এত বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে যে, তার ফলে শরীরের কোনো অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা প্রাণ সংহার হয়েছে। অথবা যেসব মুনাফা অর্জন করার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়েছে সেগুলো খতম হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

২. এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে, হুকুমের ওপর আমল করতে গেলে মামুলি ও হালকা ধরনের কষ্ট হয়। মাথা বা কোনো অঙ্গে সামান্য যন্ত্রণা হবার আশঙ্কা থাকে। অথবা মেজাজে হালকা ধরনের প্রভাব পড়ার ভয় থাকে।

৩. মাঝারি স্তর হচ্ছে, হুকুমের ওপর আমল করতে গেলে এমন পর্যায়ের কষ্ট বরদাশত করতে হয় যা উপরোল্লিখিত দু'টি স্তরের মাঝামাঝি ধরনের। যেমন, রোগগ্রস্ত অবস্থায় রোযা রাখলে রোগ বেড়ে যাবার অথবা দেরিতে রোগ নিরাময় হবার আশঙ্কা থাকে।

এই তিনটি স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ ও মাঝারি স্তর দু'টিতে রুখ্‌সাত ও সহজ করার অবস্থা সৃষ্টি হয়। সর্বনিম্ন স্তরে রুখ্‌সাতের অবকাশ নেই। কারণ অভ্যস্ত বিষয়গুলোতে সামান্য পরিবর্তনের কারণে এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তা দূরও হয়ে যায়। এর ফলে যে ধরনের হালকা ক্ষতি হয় তা রোধ করার চাইতে বরং এক্ষেত্রে হুকুমের ওপর আমল করার যে কল্যাণ লাভ করা যায় তা লাভ করাটাই উত্তম প্রমাণিত হবে।[৯]

কষ্টের ব্যবহারে সীমা নির্দেশ ও বিধি-নিষেধ

মুশাক্কাতের প্রেক্ষিতে রুখ্‌সাত ফকীহগণের মতে শর্ত সাপেক্ষ। তারা বলেন : যে হুকুমটির ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকবে তার মধ্যে উল্লিখিত নীতি চলবে না। আর যেখানে এই সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকবে না এবং প্রকৃত প্রয়োজনও থাকবে সেখানে কেবলমাত্র প্রয়োজন পরিমাণেই এই নীতিকে ব্যবহার করা হবে।

প্রথম শর্ত হচ্ছে : "মুশাক্কাত এবং হারাজ (সংকীর্ণতা)-এর বিবেচনা কেবল সে ক্ষেত্রেই হবে যে-ক্ষেত্রে বিবেচনার বিরুদ্ধে কোন দলীল (نص) না থাকে; যদি থাকে তবে সে মুশাক্কাতের বিবেচনায় রুখ্‌সাত পাওয়া যাবে না।"

---

৯. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৫৬

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে এই শর্তের সাক্ষ্য পাওয়া যায় :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমাদেরকে জিহাদের হুকুম দেয়া হয়েছে অথচ তোমাদের তাতে অনীহা। কিন্তু যাতে তোমাদের অনীহা তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এবং যা তোমরা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না।"[১০]

জিহাদে অবশ্যই মুশাক্কাত আছে, মৃত্যুরও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলে রুখ্‌সাত মিলবে না, কারণ نص (এ ক্ষেত্রে কুরআনের স্পষ্ট বাক্য) মুশাক্কাতের প্রেক্ষিতে রুখ্‌সাতের বিপরীত হুকুম দিচ্ছে। সুতরাং জিহাদ সকল সক্ষম মুসলিমের জন্য ফরয; মুশাক্কাতের বিচার এ ক্ষেত্রে অচল।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রগুলো অনুধাবন করা এবং তার আলোকে কর্মপন্থা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়। এটা যদি এতই সহজ হতো তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যেমন মানুষকে কর্তৃত্বশীল করা হয়েছে তেমনি এটাকেও তার কর্তৃত্বাধীন করা হতো। এ জন্য অনবরত ও ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ দানের প্রয়োজন হতো না এবং দীন ও জীবন বিধানকে পরিপূর্ণতা দান করারও দরকার হতো না। এ কারণেই কষ্টের ব্যবহার এবং তার মাধ্যমে রুখ্‌সাত ও সহজ করার অনুমতি দানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন। প্রত্যেকে একাজ করতে পারবে না এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্যও হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে : সবক্ষেত্রে মানুষের প্রকৃতি বা ভাবাবেগের প্রেক্ষিতে মুশাক্কাতের বিবেচনা করা যাবে না; কারণ শরীয়তের লক্ষ্য সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব মুক্ত করা, প্রবৃত্তিকে শরীয়তের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাই উদ্দেশ্য। এর সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহ্র কয়েকটি বক্তব্য উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল :

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

"তুমি কি দেখেছো এমন ব্যক্তিকে যে প্রবৃত্তিকে তার মা'বুদ বানিয়ে রেখেছে?"[১১]

প্রবৃত্তি ও আবেগতাড়িত ফায়সালাকে অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করে বলা হয়েছে :

---

১০. সূরা আল-বাকারা : ২১৬

১১. সূরা আল-জাছিয়াহ : ২৩

www.pathagar.com

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

"অবশ্যই নফ্‌স মন্দ কাজের প্ররোচণা সৃষ্টিতে অত্যন্ত পটু।"[১২]

রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন :

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِه

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি (শরীয়ত), তার অনুবর্তী না হয়ে যাবে।"[১৩]

তাই ইমাম আশ-শাতিবী রহ. বলেন :

أن قصد الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها فلا تعتبر في شرعية الرخصة بالنسبة إلى كل من هويت نفسه أمرا

"শরীয়ত প্রণয়নের মাধ্যমে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ও আচার-আচরণের শৃঙ্খলমুক্ত করা। তাই রুখ্‌সাত তথা সহজতর বিধান দানের ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিমূলক বিষয় বিবেচ্য হবে না।"[১৪]

তিনি আরো বলেছেন :

وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها

"প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাসমূহকে শরীয়তের অধীন করার উদ্দেশ্যেই শরীয়ত প্রণয়ন করা হয়েছে।"[১৫]

শরীয়ত প্রণেতা আবেগ ও প্রবৃত্তি এক পর্যায় পর্যন্ত গ্রাহ্য করেছেন, তবে এ শর্তটি ব্যাপক নয়

শরীয়ত আবেগ-অনুভূতি ও প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি ও সর্বত্র অগ্রাহ্য করেছে, একথা ঠিক নয়। বরং কল্যাণ লাভ এবং ক্ষতির হাত থেকে নিস্কৃতির জন্য যেসব ক্ষেত্রে আবেগ ও প্রবৃত্তির বিবেচনা জরুরী ছিল শরীয়ত প্রণেতা খুঁটে খুঁটে সে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করেছেন। এবং বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে সেগুলোর পুরোপুরি বিবেচনা করেছেন এমনকি অনেক বিষয়ে মূলনীতির প্রতিকূলেও তা করা হয়েছে।

তাই ইমাম আশ-শাতিবী রহ. বলেন :

قد وسع الله تعالى على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم على وجه لا يفضي إلى مفسدة ولا يحصل بها المكلف على مشقة ولا ينقطع بها عنه التمتع إذا أخذه على الوجه المحدود له فلذلك شرع له ابتداء رخصة السلم والقراض والمساقاة وغير ذلك مما هو توسعة عليه وإن كان فيه مانع في قاعدة أخرى

---

১২. সূরা ইউনুস : ৫৩

১৩. আস-সুন্নাহ, বাব : মা ইয়াজিবু আন-ইয়াকূনা হাওয়াল মারই তাবআন লিমা জাআ বিহিন নাবিয়্যি স., হাদীস নং-১৫

১৪. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ১, পৃ. ২৩৬

১৫. প্রাগুক্ত, খ. ১

www.pathagar.com

"মহান আল্লাহ মানবিক কামনা-বাসনা, তার বিভিন্ন অবস্থা ও তার সুখী-সমৃদ্ধ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে তার বিবেচনাকে এমন প্রশস্ত করেছেন যাতে মানব কোনো ক্ষতি বা (অযথা) কষ্টের সম্মুখীন হয় না, তার সুখ-সমৃদ্ধির পথও রুদ্ধ হয় না, অবশ্য সে সমৃদ্ধি হবে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পরিধির মধ্যে। এই কারণেই শুরুতে রুখ্‌সাত-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে) بيع سلم এবং قراض (যথাক্রমে ধারে বিক্রয় এবং লাভের অংশ প্রাপ্তির শর্তে কর্জ দেয়া)-এর ব্যাপারে এবং শরীকানায় জমি চাষ (مساقات)-এর ক্ষেত্রে ইত্যাদি; এ সবই শরীয়তের প্রশস্তি স্বরূপ যদিও অন্য নিয়ম (কিয়াস) অনুযায়ী এই রুখ্‌সাতে বাধা রয়েছে।"[১৬]

তৃতীয় শর্ত : সম্ভাব্য পরিণতির বিবেচনা হবে না

উল্লিখিত কষ্ট ব্যবহারের জন্য সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য বিপদ আঁতিপাতি করে খুঁজে বের করে আনা অথবা নেকী ও পরহেজগারীর ধারণায় বা আত্ম-অহমিকায় মামুলি ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করে বড় ধরনের ক্ষতি গ্রহণ করে নেয়া। উপরন্তু রুখ্‌সাত ও সহজ করার পথ তৈরী করার জন্য নিছক সম্ভাবনা ও আশা পোষণ করার বিষয়টি গ্রাহ্য করা সঠিক নয়।

আসলে মনে যখন ইখলাস ও সত্যনিষ্ঠা সৃষ্টি না হয় এবং সেখানে বাইরের প্রভাবের প্রাধান্য সৃষ্টি হয় তখন সাদামাটা আইন কানুন ও বিধানের মধ্যে নানা ধরনের জটিলতা ও বাধা বিপত্তি দেখা যায়। এহেন অবস্থায় মানুষ বিভিন্ন টালবাহা না করে আত্মরক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং তাকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে। বরং অনেক সময় নেকী ও পরহেজগারীর চিন্তাকে নেকী ও পরহেজগারীর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে।

এর একটি উদাহরণ কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত আয়াতে দেখা যায় :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا

"তাদের মধ্যে কেউ বলে, আমাকে অনুমতি দিন (যাতে তাবুক-এর জিহাদে যোগ না দিতে হয়) এবং আমাকে (ঐ অঞ্চলের সুন্দরী নারীদের) ফিতনায় ফেলবেন না। মনে রেখো, এরা আসলে ফিতনার মধ্যে পড়েই গেছে।"[১৭]

গ্রীষ্মের খরতাপে বিশাল মরু অঞ্চল অতিক্রম করে সুদূর তাবুক-এ গিয়ে জিহাদ করা অবশ্যই বিস্তর মুশাক্কাতের ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে রসূলুল্লাহ স. রুখ্‌সাত দিয়েছেন অবশ্যই। কিন্তু আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি রুখ্‌সাত চাচ্ছেন একটি সম্ভাব্য মুশাক্কাতের অজুহাতে, আর তা হচ্ছে সুন্দরীদের

১৬. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ১, পৃ. ২৩৬
১৭. সূরা আত-তাওবা : ৪৯

www.pathagar.com

ফাঁদে পড়ে তার চরিত্র দূষণের ভয়। এই মুশাক্কাত সম্ভাব্য, বাস্তব বা অবশ্যম্ভাবী নয়, আসলে তা ছিল অজুহাত মাত্র; সুতরাং লোকটি সম্ভাব্য পরিণতির বিবেচনায় রুখ্‌সাত দাবী করতে পারে না।

কাল্পনিক ও অনুমানভিত্তিক কথায় ও মামুলি ধরনের কষ্টের কারণে আমরা ফিতনার মধ্যে পড়ে যাবো বলে মনে করা নিজেই একটি বড় ফিতনা ও নফ্‌সের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে :

> فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ
>
> "যারা জিহাদে শরীক হয়নি তারা আল্লাহ্‌র রসূলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘরে বসে থাকায় খুশী। নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। তারা লোকদের বলেছিল, এই গরমের মধ্যে রওয়ানা হয়ো না।"[১৮]

সত্য পথে চলায় এবং সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। তাই এই ধরনের প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে রুখ্‌সাত ও সহজ করার সুযোগ চাওয়া এবং আত্ম-প্রতারণায় মনোতুষ্টি লাভ করা সত্যনিষ্ঠা নয়। দীনের কথা না হয় বাদই দিলাম, দুনিয়ার বিভিন্ন কাজ কারবার করার জন্য মানুষকে কত রকমের কষ্ট সহ্য করতে হয়। এহেন অবস্থায় কষ্ট ছাড়া দীন অর্জন কেমন করে সম্ভবপর?

হালকা ও সহজ করার আর একটি রূপ

ফিক্‌হের বিধানসমূহ হালকা ও সহজ করার আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে, আইন কানুন ও বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ শুরুতে মন-মানসিকতাকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে ধীরে ধীরে আইন ও বিধান গ্রহণ করার যোগ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়। একবার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে গেলে মন আপনা আপনিই তা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে।

একথা সবাই জানে, দুনিয়ার কোনো আইন ও ব্যবস্থা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া যায় না। বরং তা ভিতর থেকে উৎসারিত হয় এবং নিজের স্থান নিজেই তৈরী করে নেয়। অনুরূপভাবে জীবনে একই সঙ্গে তার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বরং মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও পরিবেশ অনুকূল করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কেমন করে আশা করা যেতে পারে, দুনিয়ার কোনো জাতি ও দল কোনো নতুন আইন ও ব্যবস্থার নাম শুনতেই নিজের স্বভাব-প্রকৃতির কাঠামো

১৮. সূরা আত-তাওবা : ৮

www.pathagar.com

সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে এবং সমস্ত পুরানো মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিয়ে একেবারে সাদরে গ্রহণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে অথবা সরকারী ঘোষণা দেবার সাথে সাথেই তা কার্যকর করতে থাকবে?

তেইশ বছর ধরে কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়া এবং আইন-বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বভাব-প্রকৃতির দিকে নজর রাখা উপরন্তু প্রত্যেক পদক্ষেপে অবস্থা অনুযায়ী বিধান হালকা ও সহজ করা ইত্যাদি এরই সাক্ষ্য বহন করে যে, কোনো আদেশকে মনের গহীনে স্থান দেবার জন্য পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতিই সর্বোত্তম ও সবচাইতে বেশী বিজ্ঞান সম্মত। এই আইন ও বিধানগুলো একই সঙ্গে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলে মানসিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বিধান না করার কারণে বিরাট সঙ্কট ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে অনেক স্বীকৃত সত্যও সন্দেহজনক পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার এমন অনেক বিষয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হবে যেগুলো জীবনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য এবং যেগুলোর সাহায্য ছাড়া কোনো সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ অস্তিত্বই লাভ করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের নাসেখ-মানসুখ নীতি থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ফকীহগণ একে ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ সমাজ জীবনের অবস্থা ও দাবীর প্রেক্ষিতে প্রকৃত প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত রেখে বিধানের মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা, বিধানকে হালকা করা এবং তার মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. বলেন,

> والثاني : أن يكون شيء مظنة مصلحة أو مفسدة ، فيحكم عليه حسب ذلك ، ثم يأتي زمان لا يكون فيه مظنة لها ، فيتغير الحكم
>
> "দ্বিতীয় 'নাসেখ-মানসুখ হচ্ছে, কোনো সুবিধাকে সামনে রেখে অথবা কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় কোনো হুকুম দেয়া হয়, তারপর এমন সময় আসে যেখানে এটি উদ্দেশ্য হিসেবে টিকে থাকে না, সেক্ষেত্রে এই হুকুম বদলে যাবে।"[১৯]

পূর্ববর্তী মনীষীদের যুগে 'নাসেখ-মানসুখ' নীতি থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

পূর্ববর্তী সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মনীষীদের (সালফে সালেহীন) যুগে এই 'নাসেখ-মানসুখ' নীতি থেকে যথেষ্ট সাহায্য নেয়া হয়েছে। ফকীহগণও সাময়িক অবস্থা ও সুবিধার ভিত্তিতে 'প্রবর্তক শক্তি'র এত ব্যাপক ক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে,

---

১৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, পৃ. ১২২

www.pathagar.com

অনেক বৈধ বিষয়কেও তা নিষিদ্ধ গণ্য করতে আবার অনেকের প্রবর্তনকেও বিলম্বিত করতে পারে। সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছিল এমন অনেক মাধ্যম ও উপায় উপকরণ এর আওতায় আসতে পারে। কিন্তু যখন সে অবস্থা বর্তমান নেই তখন অনিবার্যভাবে তার মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।

যেমন রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিম্নলিখিত কর্মপদ্ধতি থেকে এই নীতির ওপর আলোকপাত হয় :

'হাতীম' ছিল কাবাঘরের একটি অংশ। এটি দীর্ঘকাল থেকে কাবাঘরের ইমারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ স. জাতীয় প্রকৃতি ও মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে একে কাবাঘরের ইমারতের অন্তর্ভুক্ত করেননি। আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে তিনি এর কারণ বর্ণনা করে বলেন :

لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ

"যদি জাতি নতুন নতুন কুফ্‌রী থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ না করে থাকতো তাহলে আমি কাবাঘর ভেঙে ইবরাহিমী ভিত্তির ওপর তাকে নির্মাণ করতাম (অর্থাৎ হাতীমকে কাবার ইমারতের মধ্যে শামিল করতাম)।"[২০]

আসলে প্রত্যেক যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। আবার তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন-বিধানের মধ্যে পরিবর্তনের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু সাংস্কৃতিক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক বিপদ-এর মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য। আল্লাহ্‌র হেদায়াতের আলোকেই এই পার্থক্য অনুধাবন করা যেতে পারে। অন্যথায় "বিপরীতপক্ষে তথাকথিত জীবন কর্পূরের মতো" এই প্রবাদ সত্য প্রমাণিত হবে। আর মানুষ উন্নতি ও সভ্যতা সংস্কৃতির নামে না জানি কত বিপদকে সম্পদ মনে করে তাদেরকে সংস্কৃতির অংশে পরিণত করবে, যার ফলে সেগুলো সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা করার পরিবর্তে তার দুশমন হয়ে যাবে।

শরীয়তে হারাজ[২১] থাকবে না

কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এই নীতির ভিত্তি :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

"আল্লাহ দীনের মধ্যে তোমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক কোনো সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেননি।"[২২]

---

২০. সহীহ মুসলিম, কিতাব : আল-হাজ্জ, বাব : নাকযুল কাবাতি ওয়া বিনাইহা, হাদীস নং-৩৩০৪

২১. حرج = সংকীর্ণতা।

www.pathagar.com

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"আল্লাহ চান না তোমাদের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি, তবে তিনি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন করতে চান এবং তিনি তোমাদের ওপর তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিতে চান, যাতে করে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো।"[২৩]

এই কারণে ফকীহগণ বলেন : الحرج مرفوع অর্থাৎ হারাজ তুলে নেয়া হয়েছে বা রহিত।[২৪]

হারাজের তাৎপর্য

আরবী ভাষায় "হারাজ" মানে হচ্ছে :

الحرجة من الشجر ما ليس له مخرج

"(ঘন সন্নিবিশিত) বৃক্ষাদির মধ্যে حرجة বলতে বোঝায় তা (বৃক্ষাদির জট) থেকে বের হবার উপায় না থাকাকে।"[২৫]

আয়িশা রা. 'হারাজ'-এর মানে বলেছেন যাইক (ضيق) অর্থাৎ সংকীর্ণতা।[২৬] ফিক্‌হের গ্রন্থেও তাই বলা হয়েছে।[২৭]

আবূ হুরায়রা রা. একবার বিখ্যাত কুরআন ব্যাখ্যাতা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করেন, "দীনের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই এ কথার অর্থ কি, অথচ অনেক কামনা-বাসনা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছে?" জবাবে তিনি বলেন, "সংকীর্ণতা না থাকার মানে হচ্ছে, প্রাচীন জাতিদের জন্য (তাদের অবস্থা অনুযায়ী) যে সব কঠোর বিধান নির্ধারিত হয়েছিল, তেমন কঠোর বিধান এই উম্মতের জন্য নির্ধারিত হয়নি।"[২৮]

তিনি আরো বলেন :

إنما ذلك سعة الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات

"আল্লাহ যে তওবা (توبة) ও কাফ্‌ফারা (كفارة)-র ব্যবস্থা করেছেন, তা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের প্রশস্ততার (وسعة-এর বিপরীতার্থক শব্দ حرج বা حرجة) প্রমাণ স্বরূপ। যে রূপ নির্ধারণ করেছেন তা ইসলামের ব্যাপকতার প্রকাশ।"[২৯]

২২. সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮
২৩. সূরা আল-মায়িদা : ৬
২৪. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ১
২৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৯
২৬. তাফসীরে কাশশাফ, পৃ. ২৯২, তাফসীরে কাবীর, পৃ. ১২৮, ফুটনোট তাফসীরে কাবীর, পৃ. ৩০০
২৭. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১৫৯
২৮. তাফসীরে কাবীর ইত্যাদি।
২৯. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১৫৯

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রা.-এই ব্যাখ্যাগুলো থেকে দু'টি কথার প্রকাশ হয়:

১. দীনের মধ্যে কঠিন (সংকীর্ণতার ধারক) বিধান নেই।
২. মানবিক দুর্বলতা ও সামাজিক গলদের কারণে যদি কোনো বিধান কঠিন মনে হয় তাহলে তার মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টির বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

বিশিষ্ট তাবি'ঈ ইকরামা রহ. ইসলামের প্রশস্ততার এবং সংকীর্ণতার একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন :

ما أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

"আল্লাহ যে দুই দুই, তিন তিন, চার চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন" (তাও ইসলামী শরীয়তের وسعة এর প্রমাণ)।[৩০]

ইসলাম চিরকৌমার্য যেমন অনুমোদন করে না, তেমনি চারটির অধিক বিবাহেরও অনুমতি দেয় না, অন্যপক্ষে একাধিক বিবাহে 'আদল'[৩১]-এর শর্ত আরোপ করে। হিকমতে ইলাহী দীনে এই وسعة এর ব্যবস্থা করেছে যাতে কোন মুসলিম বা মুসলিম সমাজ কোন যুগে এবং কোন অবস্থায় হারাজ-এর সম্মুখীন না হয়। ইসলাম বিধবা এবং বিপত্নিকদের বিবাহ দেবার আদেশ দিয়েছে। বিধবাকে বাকী জীবন একলা থাকতে বললে দীনে হারাজ এসে যাবে এবং সমাজে ব্যভিচারের প্রাবল্য হবে।

এই ব্যাপকতাকে প্রবৃত্তির কামনা ও লালসা-চরিতার্থ করার মাধ্যমে পরিণত করা যাবে না অথবা এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে সমতা খতম করারও অধিকার পরিমাপ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং মানুষ যাতে তার প্রকৃতিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় এবং এর মাধ্যমে সামাজিক সমতা সৃষ্টি হয় সেজন্য এই ব্যাপকতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আসল জিনিস হচ্ছে, জীবনে আদল ও ভারসাম্য এবং সমাজে সমতা সৃষ্টি। এজন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তার ওপর সে বেশী জোর দেয়নি বরং সে মানুষের মনস্তাত্বিক ও প্রকৃতিগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ ও নিম্ন সীমানা নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে।

সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় যদি এই অনুমতিকে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানব জীবনে ইনসাফ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। আর যদি স্থান ও অবস্থা থেকে একে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে তা হারাজের (সংকীর্ণতা) অবস্থা সৃষ্টি করবে। এর ফলে যৌন ভ্রষ্টতার সৃষ্টি হবে এবং তা সমগ্র সমাজ দেহে পচন ধরাবে।

---

৩০. প্রাগুক্ত, খ. ১

৩১. عدل= স্ত্রীদের সাথে সম্পর্কে যথাসাধ্য সমতা রক্ষা।

www.pathagar.com

এই ধরনের বিষয়াবলীতে প্রগতিশীলতায় আতঙ্কিত হয়ে এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে ভীতির চোখে দেখে জীবন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। বরং আসল জিনিস হচ্ছে, অবস্থা ও স্থানের যথাযথ পর্যালোচনা করে স্থান ও কাল নির্ধারণ, তারপর এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিধান যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করা।

অবস্থা ও স্থানের সঠিক পর্যালোচনা করা সহজ ব্যাপার নয়। একে প্রত্যেক যুগের সবচেয়ে কঠিন কাজ মনে করা হয়েছে। এটি অনুধাবন না করে ব্যাপকতা ও সংকীর্ণতার ফায়সালা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

কর্মজীবনে শরীয়তের ভূমিকা পারদর্শী চিকিৎসকের মতো

প্রকৃতপক্ষে মানুষের কর্মজীবনে আল্লাহ্‌র শরীয়তের মর্যাদা একজন পারদর্শী চিকিৎসকের মতো যিনি নাড়ির গতি, রোগীর শরীরের উত্তাপ ও শীতলতা এবং রোগ ও মেজাজের অবস্থা ও ধরন দেখে ঔষধ ও খাদ্য নির্দেশ করে থাকেন। এভাবে ঔষধ ও খাদ্যের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মেজাজের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে এমনভাবে সক্রিয় ও প্রতিষ্ঠিত করা হয় যার ফলে সে নিজেই রোগের মোকাবিলা করতে থাকে।

রোগীর সঠিক রোগ নির্দেশ অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাছাড়া এই উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য বহুতর পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে উত্তাপ ও শীতলতা এবং কোমলতা ও কঠোরতার যথাযথ পরিমাপ করে ঔষধ ও খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত সংশোধনী দেয়া যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাতে সন্দেহ নেই। ইমাম শাতিবী রহ. বলেন,

> فعل الطبيب الرفيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لائقا به فى جميع أحواله
>
> "আল্লাহ্‌র শরীয়ত একজন স্নেহশীল চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে। এই শরীয়ত রোগীর অবস্থা অভ্যাস এবং রোগের শক্তি ও দুর্বলতার চাহিদা অনুযায়ী রোগীর রোগ নিরাময়ে সহযোগিতা করে। এমনকি যখন রোগীর স্বাস্থ্য বহাল হয়ে যায় তখন তার জন্য এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ কর্মসূচী নির্দেশ করে যা তার সব ধরনের অবস্থার উপযোগী হয়।"[৩২]

আইন ও বিধানের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় পৌঁছার জন্য বিভিন্ন পর্যায় প্রয়োজন

সন্দেহ নেই, চিকিৎসকদের কাছে যেমন ঔষধ ও খাদ্যের একটি 'পূর্ণ কোর্স' থাকে তেমনি বিধি-বিধান ও আইনেরও একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তাকে যথাস্থানে খাপ খাওয়াবার জন্য অবস্থা ও চাহিদা অনুধাবন করা এবং

---

৩২. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১৬৩

www.pathagar.com

বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে সমাজকে কোর্স পূর্ণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন করা সবচেয়ে নাজুক কাজ। খতমে নবুওয়ত ও হেদায়াতের পূর্ণতার অর্থ হচ্ছে সমাজকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়ে একটি মানসম্পন্ন সমাজ গঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কোর্স ও একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা প্রদান করা। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ এই সমাজের মাঝখানের সমস্ত পর্যায় বাদ দিয়ে এক লাফে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার উচ্চতম শৃঙ্গে পৌঁছার চেষ্টা করবে।

জীবনে ইনসাফ ও ভারসাম্য সৃষ্টিই আসল জিনিস। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ের এমন কিছু আয়াত ও হাদীস পেশ করা হচ্ছে যেগুলো থেকে পর্যায়ক্রমে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে জীবনে আদল ও ভারসাম্যের অবস্থা সৃষ্টি করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেসব পার্থিব কার্যক্রমের ওপর দুনিয়ার জীবনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল শুরুতে মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে বিভিন্নভাবে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আবার যখন দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণের ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা প্রকাশের আশঙ্কা দেখা দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন বিভিন্ন ভাবে দুনিয়ার মর্যাদাহীনতা ও স্থায়িত্বহীনতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ.

"দুনিয়ার এই জীবন তো নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর মুত্তাকীদের জন্য নিঃসন্দেহে আখেরাতের গৃহই উত্তম। দুঃখের বিষয় তোমরা এতটুকু কথাও বুঝছো না।"[৩৩]

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"এই দুনিয়ার জীবন নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। যথার্থই আসল জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন, হায় যদি লোকেরা তা জানতো।"[৩৪]

রসূলুল্লাহ স. বলেন :

إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا

"দুনিয়ার বিজয় তার শোভা ও সৌন্দর্য এবং তরতাজা অবস্থা যখন তোমরা লাভ করবে, সেই অবস্থাটির ব্যাপারেই আমি বেশী আশঙ্কা করছি।"[৩৫]

---

৩৩. আল-কুরআন, ৬ : ৩২
৩৪. আল-কুরআন, ২৯ : ৬৪
৩৫. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আয-যাকাত, বাব : আস-সাদাকাতু আলাল ইয়াতামা, হাদীস নং-১৩৯৬

www.pathagar.com

একবার তিনি বলেন :

فَوَاللّٰهِ لا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

"আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের দারিদ্র্যের কারণে আমি শঙ্কিত নই। বরং আমি শঙ্কাবোধ করছি, তোমরা যখন তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো দুনিয়াবী স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি লাভ করবে তখন তোমরাও তার মধ্যে তারা যেমন ডুবে গিয়েছে ঠিক তেমনি ডুবে যাবে। তারপর তা তোমাদের ঠিক তেমনিভাবে ধ্বংস করে দেবে যেমনি তাদের ধ্বংস করেছে।"[৩৬]

কিন্তু যখন সামাজিক বিন্যাস এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যে তার মধ্যে ভারসাম্যহীনতার বেশী আশঙ্কা থাকেনি তখন বলা হয় :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

"বলে দাও (হে মুহাম্মদ)! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সৌন্দর্য সামগ্রী এবং পানাহারের যে পাক পরিচ্ছন্ন জিনিসগুলো সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো কে হারাম করে দিয়েছে?[৩৭]

অন্যত্র রসূলগণের আওতাধীনে জাতিকেও হুকুম দেয়া হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"হে রসূলগণ! পাক পরিচ্ছন্ন জিনিস খাও এবং ভালো কাজ করো। তোমরা যে কাজ করো তা আমার কাছে গোপন নেই।"[৩৮]

তারপর তার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র (নির্দেশিত বৈধ বস্তু সমূহ) ও নিষিদ্ধ বস্তু সমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ কোর্স তৈরী করে দেয়া হয়েছে। এগুলোর ওপর যথাযথভাবে আমল করলে ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে না।

এগুলো ছাড়াও কুরআন ও সুন্নাতে এমন অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যেগুলো সমাজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সন্ধান দেয়। জীবনে নিছক ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্যই এদের অর্থের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে :

---

৩৬. সহীহুল বুখারী, আবওয়াব : আল-জিযয়া ওয়াল মুওয়াদা'আহ, বাব : আল-জিযয়া ওয়াল মুওয়াদা'আহ মিন আহলিয যিম্মাতি ওয়াল হারব, হাদীস নং-২৯৮৮

৩৭. আল-কুরআন, ৭ : ৩২

৩৮. আল-কুরআন, ২৩ : ৫১

www.pathagar.com

وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ

"তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে, তোমরা তা প্রকাশ করে দাও বা গোপন রাখো, যেকোনো অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা জানেন এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন (তোমরা ভেতরের গুনাহ্ দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে গোপন করতে পারো কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি থেকে বাঁচতে পারো না)।"[৩৯]

এরপর বলা হয়েছে :

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"আল্লাহ্ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সামর্থের চাইতে বেশী বোঝা চাপান না। যে ব্যক্তি ভালো কাজ করেছে তার সুফল তার জন্য রয়েছে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করেছে তার কুফলও তার ওপর চেপেছে।"[৪০]

এ প্রসঙ্গে আর এক জায়গায় বলা হয়েছে :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"আমার বান্দাদের তুমি বলে দাও যারা (অপরাধ করে) নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে, তারা যেন আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ না হয়। অবশ্য আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[৪১]

প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোন কর্ম বা কৃচ্ছ্রসাধন দীনের অঙ্গ হতে পারে না। তাতেও দীনের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটির কথা ধরা যাক :

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ

"আর জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) একটি পরীক্ষা বিশেষ।"[৪২]

যখন আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে এসে এক সাহাবী বললেন, তিনি লাগাতার রোযা রাখেন, আর একজন বললেন, তিনি প্রত্যেকদিন সারারাত নামায পড়েন, তৃতীয়জন বললেন, তিনি বিবাহ না করার সংকল্প করেছেন। তাঁরা হয়ত আশা করেছিলেন রসূলুল্লাহ্ স. তাঁদের এ সব কৃচ্ছ্রসাধন অনুমোদন করবেন। কিন্তু তিনি বললেন :

---

৩৯. আল-কুরআন, ২ : ২৮৪
৪০. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬
৪১. আল-কুরআন, ৩৯ : ৫৩
৪২. আল-কুরআন, ৮ : ২৮

www.pathagar.com

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"কিন্তু (আমাকে দেখো) আমি রোযা (নফল) রাখি, আবার কখনো রাখিনা, নামায পড়ি, আবার ঘুমাইও এবং আমি মেয়েদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও রাখি। মনে রেখো, যে ব্যক্তি আমার এই সুন্নাত ছেড়ে দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৪৩]

আসলে এ উক্তিটি রসূলুল্লাহ্ স. এমন তিনজন লোকের কথার জবাবে করেছিলেন যাদের একজন দিনরাত লাগাতার রোযা রাখা, দ্বিতীয়জন লাগাতার নিশি জাগরণ করা এবং তৃতীয়জন চিরন্তনভাবে নিজেকে পুরুষত্বহীন করার শপথ করেছিলেন। এথেকে ইসলামী জীবন ধারার ভারসাম্যের কথা প্রকাশ হয়।

সমাজ জীবন ছাড়া ব্যক্তি জীবনে ভারসাম্য সৃষ্টি করার উপায়

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো তো সমাজ জীবনে ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্য গৃহীত হয়েছিল। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ্ স. ব্যক্তি জীবনে ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্যও বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর কাছে বিভিন্ন ধরনের লোক আসতো এবং আফযালুল আ'মাল (শ্রেষ্ঠতম কাজ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। অথবা তাদের কোনো প্রশ্ন ছাড়াই তিনি শ্রেষ্ঠতম কাজের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে এগুলো বিভিন্ন হতো। যেমন কাউকে তিনি বলেছেন, নামায শ্রেষ্ঠতম কাজ। কাউকে বলেছেন, পিতা-মাতার খেদমত শ্রেষ্ঠতম, আবার কাউকে বলেছেন, জিহাদ শ্রেষ্ঠতম কাজ। এছাড়াও আরো বহু কাজকেও তিনি শ্রেষ্ঠতম কাজ বলেছেন। হাদীসের গ্রন্থগুলোয় সহজেই এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ লাভ করা যায়। ব্যক্তিদের অবস্থা ও তাদের মানসিক পর্যায়ের প্রেক্ষিতেই এই পার্থক্য দেখা দেয়। লোকদের অবস্থা দেখে তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন, এই ব্যক্তির জীবনে ভারসাম্যহীনতা কোনো দিক দিয়ে আসতে পারে এবং আইন ও বিধানের মধ্যে কোনটিকে অগ্রবর্তী ও কোনটিকে পশ্চাতবর্তী করলে এই ভারসাম্যহীনতা দূর হতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির বাস্তব জীবন বিভিন্ন হয়, এটি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কারোর জীবনের কোনো দিক দুর্বল হবে। তার সংশোধনের ওপর বেশী জোর দেবার প্রয়োজন হবে। এই দিক দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতম কাজ সমান হতে পারে না। যেমন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু দৈহিক পরিশ্রম করা তার পক্ষে কঠিন। এহেন ব্যক্তির জন্য এমন সব কাজ শ্রেষ্ঠতম হবে যেগুলো দৈহিক পরিশ্রমের সাথে সম্পর্কিত অথবা যে ব্যক্তি দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত কিন্তু অর্থের প্রতি লোভ অনেক বেশী তাকে অর্থ ব্যয়ের ওপর বেশী জোর দেয়া হবে এবং

---

৪৩. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আন-নিকাহ্, বাব : আত-তারগীব ফিন-নিকাহ্, হাদীস নং-৪৭৭৬

www.pathagar.com

এটিই হবে তার জন্য শ্রেষ্ঠতম কাজ। অন্যান্য বিধান ও কাজের স্থান কালের ব্যাপারটিও অনুরূপ মনে করা উচিত। যেমন ইমাম শাতিবী রহ. লিখেছেন :

هكذا تجد الشريعة أبدا في مواردها ومصادرها

"এভাবে শরীয়তকে প্রত্যেকটি স্থান ও কালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দেখতে পারেন।"[৪৪]

তারপর তিনি আরো বলেছেন :

على نحو من هذا الترتيب يجري الطبيب الاهر يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه الاعتدال في توافق مزاج المغتذي مع مزاج الغذاء ويخبر من سأله عن بعض الأكولات التي يجهلها المغتذي أهو غذاء أم سم أم غير ذلك فإذا أصابته علة بانحراف بعض الأخلاط قابله في معالجته على مقتضى انحرافه في الجانب الآخر ليرجع إلى الاعتدال وهو المزاج الأصلي والصحة المطلوبة

"একজন পারদর্শী চিকিৎসক খাদ্য সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে এমনি ধরনের বিন্যাস কার্যকর করেন। যখন কোনো ব্যক্তির মেজাজে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা সৃষ্টি করা তার লক্ষ্য হয় তখন তিনি দেখেন কোনো জিনিসের ব্যবহারে কোনো কোনো মিশ্রণ দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং এর ফলে কাঙ্খিত ফল লাভে বাঁধা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদিকে সুবিধা দান করে তিনি এর প্রতিবিধান করেন এবং অগ্রবর্তী ও পশ্চাতবর্তী উপরস্তু কম-বেশী করার বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা ফিরিয়ে আনেন। এই ভারসাম্যই মানুষের মেজাজের মূল বিষয় এবং এটিই স্বাস্থ্যের কাঙ্খিত বস্তু। এরি জন্য বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়।"[৪৫]

উপরোক্ত বিষয়টি বুঝে নেবার পর ফিক্‌হের আইন ও বিধানে হারাজ এর সমস্যার বৃহত্তম অংশের সমাধান হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া সমাজ ও সভ্যতার যেসব নতুন নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রশ্ন ওঠতে থাকে সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রেও বিরাট ভাবে সাহায্য পাওয়া যায়।

'হারাজ'-এর সীমানা

ফকীহগণ বলেন : যেসব বিষয়ে যথার্থই "হারাজ" এর অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং "হারাজ তুলে নেয়া হয়েছে"-এই নীতিকে কার্যকর করার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেগুলোর ব্যাপারে নিম্নলিখিত সীমারেখা ও বিধি-নিষেধ রয়েছে। "হারাজ"-এর সীমা চিহ্নিত করতে গিয়ে ইমাম শাতিবী রহ. বলেছেন :

---

৪৪. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১৬৭

৪৫. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

أصل الحرج الضيق فما كان من معتادات المشقات في الأعمال المعتاد مثلها فليس بحرج لغة ولا شرعا

"মূলত হারাজ-এর অর্থ হচ্ছে সংকীর্ণতা। কাজেই নিত্যদিনকার কাজকর্মে অভ্যাসগতভাবে যেসব কষ্ট হয় তা হারাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, না আভিধানিক অর্থের দিক থেকে, না শরীয়তে পারিভাষিক দিক দিয়ে। দেখা যাচ্ছে, মুশাক্কাত সম্বন্ধে পূর্বে যা বলা হয়েছে, হারাজ-এর বেলায়ও তা প্রযোজ্য।"[৪৬]

এর আরো ব্যাখ্যা হচ্ছে :

كيف وهذا النوع من الحرج وضع لحكمة شرعية وهي التمحيص والاختبار حتى يظهر في الشاهد ما علمه الله في الغائب

"এটা (অর্থাৎ নির্জলা হারাজ থেকে মুক্তি) কেমন করে হতে পারে? কোনো না কোনো পর্যায়ে হারাজের উপস্থিতি শারঈ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আইন-বিধানের মাধ্যমে মানুষের পরীক্ষা হবে। বিভিন্ন মানদণ্ডে তাকে যাচাই করা হবে। এভাবে তার ভেতরের জিনিসগুলো বাইরে বের হয়ে আসবে।"[৪৭]

এই পরীক্ষা ও যাচাই গ্রহণ ও বর্জন উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিধান সমূহে অনুষ্ঠিত হবে :

والابتلاء يتعلق بالمشروع وغير المشروع فعلا وتركا

"পরীক্ষা ও যাচাই আদেশ-নিষেধ উভয় ধরনের বিধানের সাথে সম্পর্কিত।"

হারাজ ও সংকীর্ণতার একটি অবস্থা তো পার্থিব বিষয়াবলী ও কাজ-কারবারের মধ্যে রয়েছে। এর দ্বিতীয় অবস্থাটি দীনী ও জাতীয় বিষয়াদি ও সমস্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত। উহাদহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি কোনো হুকুম ও আইন কার্যকর করতে গিয়ে তার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সংকীর্ণতা ও সংকট দেখা দেয় (ওয়াজিব তরক করা অনিবার্য হয়ে পড়ে অথবা হারাম কাজ করার প্রয়োজন দেখা দেয়) তাহলে শারঈ দিক দিয়ে এই ধরনের কষ্ট দূর করাও জরুরী হয়ে পড়বে। যেমন গবেষক ফকীহগণ বলেন, যখন দীনের কোনো মূলনীতি (ঐতিহ্য) বিধ্বস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেবে তখন পার্থিব প্রাণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের হারাজ তথা ক্ষতির ওপর শরীয়তকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

إن أصول الدين تقدم على اعتبار النفس والأعضاء،... أما غير أصول الدين، فأنت تعلم أن الأمر فيها غير ذلك

---

৪৬. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১৫৯

৪৭. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

"দীনের মূলনীতি (অর্থাৎ এর হেফাজত) তো মানুষের প্রাণ ও তার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ওপর অগ্রবর্তী।... তবে যেসব বিধান দীনের মূলনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয় সেগুলোর কথা আলাদা।"[৪৮]

হারাজ চেনার একটি উপায়

যে 'হারাজ' ও কষ্ট চিহ্নিত করার ব্যাপারে মানুষের সাধারণ দৃষ্টি প্রতারিত হয় ফকীহগণ তার পরিচিতি লাভ করার জন্য কতিপয় পদ্ধতি নির্ণয় করেছেন। সেগুলো হচ্ছে, কাজের ক্ষেত্রে যে কষ্ট ও সংকীর্ণতা দেখা দেয় তাকে তারা তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন : ১. বড় ২. ছোট ও ৩. মাঝারী।

১. বড় পর্যায়টি হচ্ছে- যদি এই কষ্টে আরো কিছু বৃদ্ধি হয়, তাহলে তা অনভ্যাসজনিত কষ্টে পরিণত হবে;

২. ছোট পর্যায়টি হচ্ছে- এতে যদি সামান্যতম কম হয়ে যায় তাহলে এ আর কষ্টের দলভুক্ত থাকবে না;

৩. আর মাঝারী পর্যায়টি এই দু'টির মাঝামাঝি অবস্থিত।

আপাত দৃষ্টিতে বড় পর্যায়ের কষ্টটি অনভ্যাসজনিত কষ্টের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। কারণ উভয়ের মধ্যে দূরত্ব খুব কমই থেকে যায়। এ সত্ত্বেও ফকীহগণ একে অভ্যাসজনিত কষ্টের মধ্যে গণ্য করেছেন। ফলে তারা এক্ষেত্রে রুখ্‌সাতকেও সহজীকরণের অনুমতি দেননি।

ক্রমান্বয়ে মনযিলে পৌঁছার জন্য নাসখের প্রয়োজন নেই

শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আইন ও বিধান মেনে চলার মাধ্যমে মানুষ মুনাফা অর্জন ও ক্ষতির প্রতিবিধান করতে থাকবে। এই উদ্দেশ্য হাসিলের ক্ষেত্রে যদি বাইরের কার্যকারণ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে মানুষের কর্মের কোনো দখল না থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে নীতিগতভাবে সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, বাইরের প্রতিবন্ধকগুলো দূর করে দিয়ে সমাজকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন করে তুলতে হবে যার ফলে মানুষ স্বাধীনভাবে ও খোলামনে মুনাফা অর্জন করতে ও ক্ষতি অতিক্রম করতে পারে। এক্ষেত্রে আইন ও বিধানের মধ্যে পরিবর্তন করা হবে না। তবে কোনো হুকুম কার্যকর করলে যদি "হারাজ" ও ক্ষতিকারক ব্যাপকতা লাভ করে এবং দেশ ও জাতির বিপদে নিক্ষিপ্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজ পরিপূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ হুকুম বরদাশত করার যোগ্যতা অর্জন করে তার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন ও ক্ষতিকারকের প্রতিবিধান করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত হুকুম প্রবর্তন বিলম্বিত এবং হুকুম সীমিতকরণ উপরন্তু

---

৪৮. আল-মুওয়াফাকাতের ফুটনোট, খ. ২, পৃ. ১৫২

www.pathagar.com

ব্যাপকতার মধ্যে বিশিষ্টতা দান করার নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে। স্থান ও কালের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে যেমন মানসুখ করার প্রশ্ন ওঠেনা তেমনি তার প্রয়োজনও দেখা দেয় না। বরং তার অবস্থা ক্রমান্বয়ে কোনো এক মনযিলে পৌঁছার জন্য সময় উপযোগী কর্মসূচীর পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।

নিচের বক্তব্যে একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে ইহুদিদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

"ইহুদিদের জুলুমের কারণে আমি কিছু হালাল জিনিস তাদের ওপর হারাম করে দিয়েছি, যা (আগে) তাদের জন্য হালাল ছিল। উপরন্তু এ কারণে যে, তারা লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র পথে বড় বেশী বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল।"[৪৯]

এ থেকে প্রমাণ হয়, জাতিকে সাময়িকভাবে এমন মুবাহ ও জায়েয কাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে, যা ভুল ব্যবহারের কারণে দুস্কৃতির মাধ্যমে পরিণত হয়ে গেছে।

কা'বা ঘরের মধ্যে হাতীম সম্পর্কিত বর্ণনা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তা থেকে মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত মাসায়েল উদ্ভাবন করেছেন :

১. বড় জিনিসের প্রয়োজনে ছোট জিনিসকে উপেক্ষা করা উচিত;
২. যতদূর সম্ভব মানসিক সঙ্গতি রক্ষা করার প্রতি নজর রাখা উচিত;
৩. যে জিনিসটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু জাতীয় আগ্রহের কারণে তাকে বাঁধা দিলে ঘৃণা জন্মাবার আশঙ্কা থাকে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়।[৫০]

বিভিন্ন পয়গম্বরদের আনীত আইন-বিধানের মধ্যে দূরত্বের বড় কারণ ছিল এই সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা । তাছাড়া মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিকে এমন যোগ্য করে গড়ে তোলাও ছিল তার কারণ যার ফলে তা ভারসাম্য সহকারে মুনাফা অর্জন ও ক্ষতিকারক দূর করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।

এখন এ সম্পর্কে আরো কতিপয় ফিক্‌হের নিয়ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এগুলোর সাহায্যে ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার পরিসর সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং একথা জানা যায় যে, এই নীতিকে কখন কিভাবে কতটুকু ব্যবহার করা যেতে পারে।

সামগ্রিক নীতি : ২

মুশাক্কাত এবং হারাম সম্বন্ধে শরীয়তের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রেক্ষিতে ফকীহগণ যে নীতিমূলক সামগ্রিক নীতি উদ্ভাবন করছেন তা হচ্ছে : الضَّرَرُ يُزَالُ অর্থাৎ ক্ষতি দূর করতে হবে।

---

৪৯. সূরা আন-নিসা : ১৬০
৫০. শারহে মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪২৯

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীসে এ নীতির সমর্থন মিলে। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন :

لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ

"ইসলামে (নিজে) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও (অন্যকে) ক্ষতিগ্রস্ত করার কোনো অবকাশ নেই।"[৫১]

নিম্নোক্ত আয়াতটিও এর ওপর আলোকপাত করে :

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

"আর জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র রসূল। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যদি রসূল সেসব ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে চলে তাহলে তোমরা কষ্টে (ضرر) পড়বে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। কুফ্‌রী, নাফরমানী ও গুনাহকে তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করেছেন।"[৫২]

ফকীহগণ এই আয়াতটির একটি ইঙ্গিতের উল্লেখ করে বলেন :

فقد أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله وزينه فى قلوبنا بذلك

"এই আয়াত জানিয়ে দিচ্ছে যে, দীনকে সহজ করে (تيسير- تسهيل) আল্লাহ আমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তদুপায়ে তাকে আমাদের অন্তরে সুসজ্জিত করেছেন।"[৫৩]

রসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন :

عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا

"যথা সামর্থ কাজ করে যাওয়াই তোমাদের কর্তব্য। (তোমাদের কাজের বহর যাই হোক না কেন) আল্লাহ বিরক্তি বোধ করেন না (বরং) তোমরাই কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ো।"[৫৪]

রসূলুল্লাহ্ স.-এর নীতি সম্পর্কীয় পূর্বে বর্ণিত একটি রেওয়াত প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হলো :

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

---

৫১. সুনানুদ দারাকুতনী, কিতাব : আল-বুয়ূ', হাদীস নং-২৮৮, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-২৮৬৫

৫২. সূরা আল-হুজরাত : ৭

৫৩. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১৩৬

৫৪. সুনানুন নাসায়ী, কিতাব : আল-ঈমান ওয়া শারাইয়িহী, বাব : আহাব্বুদ্দীনি ইলাল্লাহি 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা, হাদীস নং-৫০৩৫

www.pathagar.com

"রসূলুল্লাহ স.-কে যখন দু'টি ব্যাপারের মধ্য থেকে কোনো একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি যেটা বেশী সহজ সেটাই গ্রহণ করতেন।"[৫৫]

এ প্রসঙ্গে আরো বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম শাতিবী রহ. বলেন :

من السآمة والملل والعجز وبغض الطاعة وكراهيتها

"ক্লান্তি, অবসাদ ও অক্ষমতা আনুগত্যের ক্ষেত্রে অপছন্দ হবার কারণে পরিণত হবার সমস্ত অবস্থা ও রূপ এই হাদীসগুলোর অন্তর্ভুক্ত।"[৫৬]

এই নীতি প্রয়োগের উদাহরণ

الضرر يزال - নীতির আওতায় ক্ষতির পথরোধ করার ব্যাপারে ফকীহগণের উদ্ভাবিত বিধান সমূহের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত নিম্নে দেয়া গেল :

خيار الفسخ অর্থাৎ বেচা-কেনার পর পণ্যের মধ্যে দোষ দেখা গেলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে বিক্রয় (بيع) নাকচ (فسخ) করার, خيار الرؤية অর্থাৎ পণ্য দর্শন পর্যন্ত লেন-দেন স্থগিত রাখার এখতিয়ার, خيار الشرط অর্থাৎ শর্তসাপেক্ষ ভাবে বেচা-কেনার এখতিয়ার ইত্যাদিতে ضرر এর প্রতিরোধমূলক বিধান প্রণীত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত حق الشفعة অর্থাৎ জমি, বাড়ি ইত্যাদি বিক্রির ব্যাপারে সংলগ্ন জমি বা বাড়ির মালিকের অগ্রাধিকার; قصاص (শোণিতপণ), حدود (দণ্ডবিধান), كفارة (নিষিদ্ধ কর্মের প্রতিবিধান), امانة এবং ضمانة-এর জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব, সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সুবিধা অসুবিধার বিবেচনা, এমনকি বিচারক নিয়োগের ব্যাপারেও ফকীহগণ উক্ত নীতির প্রয়োগ করেছেন যাতে যথাসম্ভব ক্ষতির পথরোধ করা যায়।

ইমাম শাতিবী রহ. এই পদ্ধতিতে আসলে শরীয়তকে নিম্নোক্ত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল করেছেন :

إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله

"এ দীনটি বড়ই মজবুত। কাজেই এর মধ্যে হাত দাও কোমলভাবে। আর আল্লাহ্‌র ইবাদতকে (আইন বাস্তবায়ন) নিজের জন্য ঘৃণিত, বিদ্বেষমূলক ও অপছন্দনীয় করো না।"[৫৭]

সামগ্রিক নীতি : ৩

الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তু (বা ব্যাপার)-কে মুবাহ (জায়িয) করে দেয়।"

---

৫৫. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-মানাকিব, বাব : সিফাতিন নাবিয়্যি স., হাদীস নং-৩৩৬৭
৫৬. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১৩৬
৫৭. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১৩৭

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদে এ নীতির ভিত্তি রয়েছে। মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা জন্তুর গোশত হারাম ঘোষণার পর আল্লাহ বলছেন :

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"যে ব্যক্তি চরম ক্ষুধায় বাধ্য হয়ে (জান বাঁচাবার জন্য এ সব হারাম জিনিস খায়) ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহের দিকে না গিয়ে (প্রয়োজনের অতিরিক্ত না খেলে) অবশ্যই আল্লাহ অসীম ক্ষমাশীল, দয়ালু।"[৫৮]

কাফির অভিশপ্ত হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করবে এই কথার পর আল্লাহ বলেছেন :

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ

"যার ওপর যবরদস্তী করা হয় অথচ তার মন অবিচল ঈমানে প্রশান্ত তার পক্ষে প্রাণ রক্ষার জন্য মুখে কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ জায়েয।"[৫৯]

কুরআন মাজীদের এই আয়াতের ভিত্তিতে ফকীহগণ উপরোক্ত নীতি (Maxim) রচনা করেছেন এবং অনুরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, যথা :

ক. আক্রমণকারীকে সর্ববিধ উপায়ে হটিয়ে দেয়া জায়েয, এমনকি এতে আক্রমণকারীর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও।

খ. গলায় কিছু আটকে গেছে এমনভাবে যে দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম অথচ মদ্য ছাড়া নাগালের মধ্যে পানি বা অন্য পানীয় নেই, এ অবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ মদ্য পান করা জায়েয ইত্যাদি।

ফকীহগণ উপর্যুক্ত নীতি প্রয়োগের কতিপয় শর্ত সাব্যস্ত করেছেন, যেমন :

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"প্রয়োজন (ضرورة)-এর দরুণ যাকে মুবাহ গণ্য করা হবে তার ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনের পরিমাণে।"

এই শর্তের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন মাজীদের غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ বা غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ (২ : ১৭৩) এবং অনুরূপ আয়াতাংশ। এই শর্ত অনুযায়ী ডাক্তার কিংবা ধাত্রীকে শরীরের ঠিক অতটুকু অঙ্গ অনাবৃত করে দেখানো জায়েয হবে যতটা না হলে চিকিৎসা বা সন্তান প্রসব করানো সম্ভব নয়।

---

৫৮. আল-কুরআন, ৫ : ৩

৫৯. আল-কুরআন, ১৬ : ১০৬

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৪

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِه

"ওযর (عذر)-এর কারণে যা জায়েয হয়, ওযর খতম হয়ে গেলে তা আর জায়েয থাকবে না।"

উদাহরণ : জীবন রক্ষার জন্য যেটুকু পানি আছে তা দিয়ে অযু করা চলবে না। সুতরাং تيمم (তায়াম্মুম) জায়েয হবে। কিন্তু এ সঙ্কট দূরীভূত হলে তায়াম্মুম জায়েয হবে না।

প্রয়োজনের ভিত্তিতে মুবাহ্ প্রয়োজন পরিমাণই হবে

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"প্রয়োজন (ضرورة)-এর দরুণ যাকে মুবাহ্ গণ্য করা হবে তার ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনের পরিমাণে।"

১. কাজেই 'মুযতার' (ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির) এর জন্য তার প্রাণ বাঁচাবার প্রয়োজনে যতটুকু পরিমাণ হারাম বস্তু গ্রহণ করা দরকার তার বেশী গ্রহণ করা জায়েয নয়।

২. বন ও জনবিরল প্রান্তরের কুয়ায় (যার মুখ খোলা থাকে) দু' চারটে পশুর লেদা পড়ে গেলে কোনো ক্ষতি নেই। এক্ষেত্রে ভাঙ্গা বা গোটা এবং ভেজা বা শুকনা লেদাতে কোনো পার্থক্য নেই। সবার হুকুম সমান। তবে যদি বেশী পরিমাণ পড়ে যায় তাহলে কুয়া অপবিত্র হয়ে যাবে। বেশী নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হচ্ছে এই যে, জনবসতি ও জনবিরল এলাকার কুয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় এলাকার কুয়ার সামান্য পরিমাণ অপবিত্র বস্তু পড়লে পানি পাক থাকবে কিন্তু বেশী পরিমাণ পড়লে উভয় জায়গার কুয়ার পানিই অপবিত্র হয়ে যাবে। কারণ সামান্য পরিমাণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া উভয় স্থানেই কঠিন। পশুরা সাধারণত সব জায়গায়ই চক্কর দিয়ে ফেরে।

৩. ডাক্তার ও ধাত্রীর প্রয়োজন পরিমাণ সতর দেখার অনুমতি আছে বেশীর নেই।

৪. বিড়ালের সামান্য পরিমাণ পেশাব কাপড়ে লেগে গেলে তা মাফ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পাত্রে লেগে গেলে তা মাফ করা হয়নি। কারণ সাধারণত পাত্র ঢেকে রাখার নিয়ম আছে। কাজেই সেখানে মাফ করার প্রয়োজন নেই।

৫. ইমাম শাফেঈ রহ. এ নীতির ভিত্তিতে ইস্‌তিদ্‌লাল করেছেন, পাগলের একটির বেশী বিবাহ করার অনুমতি নেই। কারণ তার এর বেশীর

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া স্ত্রীর হক বিনষ্ট হবার আশঙ্কাও রয়েছে। (বলা বাহুল্য এটা এমন একটা অবস্থা যাতে নারীর অধিকার বিনষ্ট হবে না।)

ওযর ভিত্তিক বৈধতা ওযরের পরেই খতম হয়ে যাবে

مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِه

"ওযরের ভিত্তিতে যা জায়েয হয় ওযর খতম হবার পর তার বৈধতা খতম হয়ে যাবে।"

এরই ভিত্তিতে যেসব অবস্থায় তায়াম্মুম ইত্যাদির অনুমতি রয়েছে সেসব অবস্থা খতম হয়ে যাবার পর এ অনুমতিও খতম হয়ে যাবে। অথবা নিজের জায়গায় অন্যকে সাক্ষী বানাবার যে অনুমতি রোগ ও সফরের কারণে দেয়া হয়েছে তা তাদের খতম হয়ে যাবার পর নিজে নিজেই খতম হয়ে যাবে এবং মূল সাক্ষীর উপস্থিতি জরুরী হবে।

সামগ্রিক নীতি : ৫

الضَّرَرُ لا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"একটি ক্ষতিকে অন্য ক্ষতির সাহায্যে দূর করা যাবে না।"

উদাহরণ : খাদ্যাভাবে জান যাবে এমন এক অনন্যোপায় মুযতার (নিরুপায়) ব্যক্তিকে অন্য এক নিরুপায় ব্যক্তির যৎসা মান্য খাদ্য খাইয়ে দেয়া জায়েয নয়। কারণ তাতে এক ব্যক্তির জান রক্ষা করতে গিয়ে আর এক জনের জীবন বিপন্ন করা হবে।

সামগ্রিক নীতি : ৬

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ ؛ لأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ

"ব্যাপক (عام) ক্ষতি রোধের জন্য বিশেষ (خاص) কোন ক্ষতি সহ্য করতে হবে।"

জাতীয় ও দলীয় স্বার্থ যেমন ব্যক্তি স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার লাভ করে এবং একটি বড় জিনিস লাভ করার জন্য একটি ছোট জিনিসের ত্যাগ স্বীকার করা যেমন বৈধ (তবে শর্ত হচ্ছে তা যেন ঐতিহ্য ধ্বংসের কারণ না হয়) ঠিক তেমনি সাধারণ ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষতিকে উপেক্ষা করা হবে।

যেমন :

১. হুদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ স. সাহাবীদের আপত্তি সত্ত্বেও মক্কাবাসীদের অন্যায় শর্তসমূহ মেনে নিয়েছিলেন যাতে সে যাত্রা যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়েছিল এবং পরিণামে মুসলিম পক্ষের বিস্তর লাভ হয়েছিল, যদিও আশু তাদের মর্যাদাহানি হয় এবং অত্যাচারের শিকার পলাতক মুসলিম আবূ জানদালকে অত্যাচারীদের হাতে সোপর্দ করতে হয়।

www.pathagar.com

২. ইসলামের শত্রুরা যদি তাদের কর্তৃত্বাধীন মুসলিমগণকে মানব ঢাল রূপে ব্যবহারের জন্য তাদের বাহিনীর পুরোভাগে ঠেলে দেয় তাহলে বৃহত্তর স্বার্থে মুসলিম সেনাদলের জন্য তাদের ওপর হামলা চালিয়ে শত্রুদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করা জায়েয।

৩. যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কারাগারে আবদ্ধ থাকে, ঋণ আদায়ের জন্য তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আদালত বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার সম্পদ বিক্রি করা জায়েয, যাতে ঋণ দাতারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

৪. ব্যবসায়ীরা পণ্যের মূল্য অত্যধিক বাড়িয়ে দিলে গণস্বার্থে রাষ্ট্রের পক্ষে পণ্যের দাম বেঁধে দেয়া জায়েয।

৫. যারা খাদ্য দ্রব্য মজুদ করে জনজীবন দুর্বিষহ করে তোলে, জোরপূর্বক তাদের মজুদকৃত মাল বিক্রি করে দেয়া জায়েয।

৬. একই জাতের দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে এমন কোনো দোকান বসানোর ক্ষেত্রে বাধা দেয়া জায়েয যা বাজারবাসীদের কষ্ট দেয়। যেমন মুদির দোকানের লাইনে এমন কোনো দোকান বসানো যার চুলার ধোঁয়া ও উড়ন্ত দাহ্য পদার্থের কণায় অন্য মুদিদোকানদার কষ্ট পায়। মোটকথা এই ধরনের সাধারণ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ ক্ষতিকে উপেক্ষা করা হবে।

সামগ্রিক নীতি : ৭

الضَّرَرُ الأَشَدُّ يُزَالُ بِالأَخَفِّ

"অপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষতি দিয়ে (মেনে নিয়ে) বৃহত্তর ক্ষতি নিবারণ করতে হবে।"

যেমন, ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় করছে না। অথবা অপর কোনো ব্যক্তি যার ওপর অন্য বহু লোকের জরুরী ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব রয়েছে, সে নিজের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করছে, এ অবস্থায় তাকে বন্দী করা জায়েয। কারণ ঋণ আদায় না করা এবং ব্যয় নির্বাহ না করায় অন্যদের যে ক্ষতি হয় বন্দী হওয়া তার তুলনায় অনেক কম ক্ষতি।

যেমন, জবরদখলকৃত কাঠ বা লোহা-লক্কড় ইমারতে লাগিয়েছে কিন্তু সে ইমারতে জবরদখলকারী ক্ষতি পূরণ করতে অস্বীকার করে এবং দেখা যায় ইমারত অপেক্ষা ঐ কাঠ বা লোহার মূল্য বেশী, তাহলে ইমারত ভেঙে কাঠ-লোহা ইত্যাদির মালিকের ক্ষতি পূরণ করে দেওয়া জায়েয হবে।

তদ্রূপ যদি জবরদখলকৃত জমির উপর ইমারত তৈরী করা হয়ে থাকে, তাহলে জমি এবং ইমারতের দামের তারতম্যের ভিত্তিতে উক্ত নীতিতে বিধান দিতে হবে।

www.pathagar.com

মৃত মায়ের পেটে জীবিত সন্তান থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেলে মায়ের পেট চিরে সন্তান বের করে নেয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এক খণ্ড মূল্যবান পাথর গিলে ফেলে এবং তারপর মারা যায়, তাহলে তার পেট চিরে সেই পাথর বের করে নেয়া জায়েয নয়। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা সম্পদের মর্যাদার চাইতে অনেক বেশী। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মূল্য আদায় করা হবে। কোনো কোনো শাফেঈ ফকীহ্ ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে উভয় দিকের অবকাশ রেখেছেন। তাদের মতে অবস্থা ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা যাবে।

দু'টি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে হালকা বিপর্যয়টি গ্রহণ করা হবে

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

"যখন দু'টি বিপর্যয় মুখোমুখি হয় তখন বড় বিপর্যয়টি থেকে বাঁচার জন্য ছোট বিপর্যয়টি সংঘটনের সংকল্প করা হবে।"

এরি নিকটবর্তী নীতি এটিও :

أَنَّ مَنْ أُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ ، وَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ يَأْخُذُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا

"যে ব্যক্তি দু'টি সমান সমান ক্ষতিকর জিনিসের মধ্যে পড়ে যায় সে তার মধ্য থেকে যেটিকে ইচ্ছা অবলম্বন করতে পারে। আর যদি কমবেশীর দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে তাহলে যার মধ্যে কম আছে সেটিকে অবলম্বন করা উচিত।"

এর কারণ, মূলত হারাম ও ক্ষতিকর কাজ করা নিষেধ। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা জায়েয। এ কারণে প্রয়োজনের বেশী পরিমাণের অনুমতি হবে না।

১. এক ব্যক্তির শরীরে এমন ধরনের জখম আছে, সে সিজদায় গেলে সেখান থেকে গলিত ধারা প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে বসে থাকলে জখম থেকে ধারা প্রবাহিত হয় না। এহেন ব্যক্তির বসে নামায পড়ার অনুমতি আছে। কারণ জখম প্রবাহিত হলে তার অযু ভেঙে যাবে। আর অযু বিহীন নামায পড়ার চাইতে বসে অযু সহকারে নামায পড়া ভালো। অযুবিহীন নামাযের তুলনায় সিজদা ত্যাগ করা বেশী সহজ। এর নযীরও পাওয়া যায়। যেমন, সওয়ারী পশুর পিঠের ওপর বসে বসে নফল পড়া এবং ইশারায় রুকূ ও সিজদা করা জায়েয। অন্যদিকে অযুবিহীন নামায পড়ার কোনো অনুমতি নেই।

www.pathagar.com

২. যে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়ার ক্ষমতা রাখে না কিন্তু বসে পড়তে পারে তার বসে কিরাআত সহকারে নামায পড়ার অনুমতি আছে। কিরাআত ত্যাগ করা জায়েয হবে না। এই দু'টি অবস্থায় বিপরীত আমল করলে নামায হবে না।

৩. দু'টি কাপড় আছে কিন্তু দু'টিতেই এক দিরহামের চাইতে বেশী পরিমাণ জায়গায় নাপাক লেগে আছে। এক্ষেত্রে যাতে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ লেগে আছে তাতেই নামায পড়তে হবে।

৪. ক্ষুধায় যার প্রাণ ওষ্ঠাগত (মুযতার) এমন এক ব্যক্তির কাছে একটি মৃতজীব আছে এবং অন্য এক ব্যক্তির খাবার আছে। এ অবস্থায় কোনো কোনো ফকীহ মৃতজীব খাবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু অধিক নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, মৃতজীব খাবার অনুমতি নেই। স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে এর মধ্যেও অবকাশ রয়েছে। অনেক সময় অন্য ব্যক্তির খাবারকে মৃত আহার করার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অন্যথায় খাদ্য বর্তমান থাকা অবস্থায় মৃতজীব আহার করার অনুমতি নেই।

সামগ্রিক নীতি : ৮

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"মাস্‌লাহাত (কল্যাণ) অর্জন অপেক্ষা ক্ষতিরোধ অগ্রগণ্য।"

অর্থাৎ বৈধ কর্ম সম্পাদন করার তুলনায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকার ওপর শরীয়তে বেশী জোর দেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ স. বলেন :

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"যখন কোনো কিছু করতে নিষেধ করি তখন তা থেকে দূরে থেকো। আর যখন আমি তোমাদের কোনো কাজ করার হুকুম করি তখন তোমাদের শক্তি সামর্থ্য মোতাবিক তা সম্পাদন করো।"[৬০]

এই হাদীসে أَمَرْتُكُمْ (হুকুম করার)-র সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ (তোমাদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী) শব্দদ্বয় যুক্ত করা হয়েছে, অথচ فَاجْتَنِبُوهُ (তোমরা তা থেকে দূরে থেকো) কথাটির সাথে এমন কোনো কথা যোগ করা হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় আদেশ মান্য করার তুলনায় নিষিদ্ধ বর্জনের গুরুত্ব বেশী। ফিক্‌হের কিতাবসমূহে আর একটি হাদীসও পাওয়া যায়। দিরায়াতের (বুদ্ধিবৃত্তিক

৬০. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, বাব : আল-ইকতিদাউ বি-সুনানি রাসূলিল্লাহ্, হাদীস নং-৬৮৫৮

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ) নীতি অনুযায়ী তা সহীহ্ বলে মনে হয় না কিন্তু প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার অবস্থায় তাকে সহীহ্ বলে মেনে নেয়ার মধ্যে তেমন বেশী কিছু দোষ আছে বলে মনে হয় না। সেটি হচ্ছে :

لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَى اللّٰهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ

"আল্লাহ্ যেসব কাজ নিষেধ করেছেন তা থেকে ধূলি পরিমাণ দূরে থাকা দুই জগতের ইবাদতের চাইতেও বেশী মর্যাদার অধিকারী।"

গুরুত্বপূর্ণ মাস্লাহাতের তাগিদে খুঁটিনাটি বিষয়ে (جزئيات) উল্লিখিত মূলনীতির শিথিলতার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া গেল :

১. বাবা-মায়ের একজন যদি কিতাবী (ইহুদী বা খ্রিস্টান) এবং অন্যজন মাজূসী (অগ্নি উপাসক) হয় তাহলে সন্তানকে কিতাবী গণ্য করা হবে, অথচ درء المفاسد নীতি অনুযায়ী তাকে মাজূসী গণ্য করে পরিত্যাগ করাই উচিৎ। কিন্তু অন্য এক নীতি অনুযায়ী শিশু ধর্মীয় বিচারে خير الابوين (বাবা-মার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ) তার অনুসারী হয়। এই ক্ষেত্রে তাওহীদবাদী কিতাবী অগ্নি উপাসক মাজূসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই সন্তান কোনো জীব যবাই করলে তা হালাল হবে এবং যদি মেয়ে সন্তান হয় মুসলিমের সাথে তার বিবাহ জায়েয হবে।

২. যদি ছাগল মদ্য পান করে অথবা তাকে এ জাতীয় কোনো হারাম খাদ্য খাওয়ানো হয় তাহলেও তার গোশত এবং দুধ হালাল হবে। যদিও তাকওয়া এবং (درء المفاسد) নীতিতে তার গোশত এবং দুধ বর্জন করতে হয়। কিন্তু তা মাস্লাহাত-এর বিপরীত তথা সমাজকে ক্ষতির সম্মুখীন করে।

৩. যদি কোনো ব্যক্তির উপার্জনে হালাল ও হারামের মিশ্রণ ঘটে এবং তার হালাল আয়ের পরিমাণ বেশী থাকে, তাহলে এহেন ব্যক্তির হাদিয়া (هدية / উপহার) ও দাওয়াত গ্রহণ করা জায়েয হবে, বিপরীত অবস্থায় জায়েয হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদি নিশ্চিত জানা যায় যে, এই হাদিয়া সামগ্রী ও দাওয়াতের খাদ্যসম্ভার হারাম আয় থেকে অর্জিত হয়েছে তাহলে তা গ্রহণ করা একেবারেই নাজায়েয।

৪. যদি একটি দোকানে হালাল ও হারাম উভয় পন্থায় লব্ধ পণ্য বিক্রয় হতে থাকে, তাহলে হারাম পন্থায় লব্ধ পণ্য চিহ্নিত না হওয়া পর্যন্ত সে দোকানে কেনা-কাটা করা জায়েয।

৫. যদি একটি লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারাম উভয় ধরনের লেনদেন করা হয়ে থাকে তাহলে হালালটি জায়েয ও হারামটি নাজায়েয হবে। এইসব অবস্থাকে প্রয়োজন ও মাস্লাহাতের ভিত্তিতে উল্লিখিত নীতি থেকে আলাদা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৯

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ،وَالْمُقْتَضِي فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْمَانِعُ

"যখন সংঘর্ষ বাঁধবে একটি মানি'[৬১] আর একটি মুকতাযী[৬২] হুকুম-এর মধ্যে তখন মানি' হুকুমটি অগ্রগণ্য হবে।[৬৩] উদাহরণ :

১. যেমন, কোনো ব্যক্তির গায়ে দু'টো আঘাতের মধ্যে একটি আঘাত ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে; এ ক্ষেত্রে (قصاص / সমদণ্ড) কার্যকর হওয়া দাবী করে। আর দ্বিতীয় আঘাতটি ভুলক্রমে করা হয়েছে; এতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। এ অবস্থায় কোনটিতেই কিসাস ওয়াজিব হবে না, বরং দীয়াত (دية / অর্থদণ্ড) ওয়াজিব হবে।

২. জানাবাত[৬৪] অবস্থায় গোসল ওয়াজিব, কিন্তু এমন অবস্থায় শহীদ হলে কী হবে? শহীদকে গোসল করানোর বিধান নেই। এই কারণে নেতিবাচক হুকুমকে অগ্রগণ্য মনে করে কোনো কোনো ফকীহ্ বলেন, জানাবাত অবস্থায়ও শহীদ হলে তাকে গোসল করানো জায়েয নয়। কিন্তু মানি' (مانع) কে অগ্রগণ্য স্থির করলে যদি কবীরা গুনাহ (كبيرة / বড়) জনিত গুরুদণ্ড প্রাপ্তির অবস্থা দাঁড়ায়, তখন মানি'-কে উপেক্ষা করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ মাস্‌লাহাতের ভিত্তিতে। যেমন মৃত মুসলিম এবং অমুসলিমের লাশ এমন অবস্থায় জড়ো রয়েছে যে, কোন্‌টি মুসলিমের লাশ তা সনাক্ত করার উপায় নেই। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এমতাবস্থায় সবগুলো লাশের জন্য কাফন এবং নামায-এ-জানাযা ওয়াজিব, অর্থাৎ অমুসলিম লাশের গোসল কাফন ইত্যাদি যে হয় না এই মানি' হুকুমটিকে অগ্রগণ্য করা হলে মুসলিমদের লাশেরও গোসল কাফন বাদ পড়ে যাবে এবং তাতে কবীরা গুনাহ্ হয়ে যাবে। সুতরাং মানি' ও হুকুমটি এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে না।

তবে যদি অমুসলিমের সংখ্যা বেশী হয়ে থাকে এবং সনাক্ত করার কোনো উপায় না থাকে তাহলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কাফন-দাফন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো মাস্‌লাহাতের ভিত্তিতে ফকীহ্গণ কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আদেশমূলক বিধান সমূহ (ওয়াজিব পর্যন্ত) ত্যাগ করা জায়েয গণ্য করেছেন। কিন্তু কবীরা গুনাহ্ করার ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। তবে যেখানে মাস্‌লাহাত প্রাধান্য পেয়ে যায় সেখানে তার মধ্যেও অবকাশ রেখেছেন।

---

৬১. مانع = রোধক, বাধা প্রদানকারী অর্থাৎ নেতিবাচক।

৬২. مقتضى = দাবীদার অর্থাৎ ইতিবাচক।

৬৩. আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর, পৃ. ৮৩

৬৪. جنابة = গোসল ওয়াজিব হয় এমন অপবিত্রতা।

www.pathagar.com

নামায শুদ্ধ হবার শর্ত তথা তাহারাত[৬৫], সাতরুল আওরাত[৬৬] এবং কিবলামুখী হওয়া, যদি কোনোটিরই সামর্থ্য না থাকে- অথচ এগুলো নামাযের مانع - তা হলেও নামাযের সময় এলে নামায আদায় করতে হবে বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন; কারণ কবীরা গুনাহ এড়াতে হবে। অনুরূপভাবে মিথ্যা বলা হারাম তথা মিথ্যা বলার হুকুম হচ্ছে مانع। কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাস্‌লাহাতের তাগিদে 'তারীয'[৬৭]-এর, এমনকি মিথ্যা বলারও অনুমতি আছে। মাস্‌লাহাতের উদাহরণ : যেমন লোকদের মধ্যে মিলমিশ বা ঝগড়া মিটমাট করে দেয়া বা স্বামী-স্ত্রীর ভেঙে পড়া সম্পর্ককে জুড়ে দেবার এবং সম্পর্ক মধুর করার উদ্দেশ্যে 'তারীয'-এর মাধ্যমে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে।

সামগ্রিক নীতি : ১০

الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة كانت او خاصة

"প্রয়োজন (Necessity) যরূরাত বা অতি প্রয়োজনের (Emergency) স্থান গ্রহণ করে তা সাধারণ পর্যায়ের হোক বা বিশেষ পর্যায়ের।"

অভাবের কারণে যেমন, বাঈয়ে-সালাম ও কারিগরের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে যদিও পণ্য উপস্থিত নেই তবুও এই নীতির ভিত্তিতে তা জায়েয। উদাহরণ : যখন কোথাও সুদবিহীন ঋণ পাওয়া যায় না অতি প্রয়োজনে সে ক্ষেত্রে সুদে ঋণ নেয়া জায়েয যদি প্রয়োজনটি শরীয়ত সম্মত হয়।

সামগ্রিক নীতি : ১১

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

"যখন হালাল ও হারাম উভয়ই একত্র হয়ে যায় তখন হারাম প্রাধ্যান্য লাভ করে।"[৬৮]

একই মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে[৬৯] :

مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلا غَلَبَ الْحَرَامُ على الحلال

ফকীহগণ এ থেকেই উপর্যুক্ত প্রবচন প্রণয়ন করেছেন এবং তাকে সম্প্রসারিত করেছেন নিম্নোক্তরূপে :

إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ : أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالآخَرُ الإِبَاحَةَ قُدِّمَ التَّحْرِيمُ

---

৬৫. طهارة = পবিত্রতা-অযু, গোসল, তায়াম্মুম।

৬৬. ستر العورة = লজ্জাস্থান ঢাকা।

৬৭. تعريض = ইঙ্গিত, কথার মারপ্যাচে মিথ্যা বলা।

৬৮. নাসাবুর রায়াহ

৬৯. মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক, হাদীস নং-১২৭৭২

www.pathagar.com

"যখন এমন ধরনের দু'টি দলীল মুখোমুখি হয় যার একটির চাহিদা কোনো কিছুকে হারাম করে দেয়া এবং অন্যটির চাহিদা তাকে মুবাহ্ করে দেয়া, তখন হারামকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।"

উদাহরণ :

১. পশু যবাই করার সময় ছুরি ছিল এক মুসলিমের হাতে কিন্তু কোনো কাফির বা মুশরিক সে মুসলিমের হাত চেপে ধরে যদি ছুরি চালিয়ে দেয়, এ অবস্থায় যবাই করা পশু হালাল হবে না।

২. যদি মৃত পশুর চর্বি তেলের সাথে মিশে যায় তাহলে সে তেল ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

৩. যদি গাভীর দুধ গাধীর দুধের সাথে মিশে যায় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

৪. যদি কুকুরের সাথে সঙ্গমের ফলে ছাগী বাচ্চা প্রসব করে তাহলে তা হালাল হবে না।

৫. গাধা ও ঘোড়ার মিলনে যে খচ্চরের জন্ম হয় তাও হালাল নয়।

৬. গৃহপালিত পশু ও বন্য পশুর মিলনে যে পশুর জন্ম হয় তার কুরবানী জায়েয নয়।

সামগ্রিক নীতি : ১২

أنّ الأمْرَ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ ، وَإذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

"যখন কোনো হুকুমের পরিসর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে তখন বিধানের ব্যাপকতা সাধন করা হবে, আবার যখন পরিসর ব্যাপক হয়ে পড়ে তখন তাকে সংকীর্ণ করতে হবে।"

সমাজ জীবনের অবস্থা ও নিয়ম কানুন মেনে চলার ব্যাপারে বড়ই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। কারণ চিন্তা ও প্রবণতার ধারা কোন দিকে এগিয়ে চলে, কোন জিনিসের ওপর তার প্রভাব পড়ে, উপরন্তু জীবনের কোন সীমারেখা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, এ সবকিছু সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত না হয়ে জীবনে আদল-ইনসাফ ও ভারসাম্য সৃষ্টিকারী বিধান নির্ধারণ করা খুবই কঠিন।

কোনো একটি দিকের প্রতি যখন সাধারণ ঝোঁক প্রবণতা বেড়ে যায় এবং সে কারণে অন্যদিক দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্য এমন সব বাঁধন ও বিধি-নিষেধ আরোপ করার প্রয়োজন হয় যার ফলে উভয় দিক নিজের সীমানার মধ্যে থাকে এবং কোনো দিক দুর্বল হয়ে না পড়ে। তাছাড়া এমন ধরনের আইন ও নিয়ম-কানুনের ওপর বেশী জোর দেবার প্রয়োজন দেখা দেয়

www.pathagar.com

যা দুর্বল দিককে তার উপযোগী স্থানে এনে দাড় করাতে পারে। এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যখন বিপরীত হয়ে যায় তখন আবার তার সাথে সম্পর্ক রেখে আইন ও বিধানের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তাই ফকীহগণের মতে :

كُلُّ مَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِّهٖ انْعَكَسَ إِلَى ضِدِّهٖ

"যে বস্তু নিজের সীমা অতিক্রম করে যায় তা নিজের বিপরীত দিকে ফিরে আসে (কারণ এ ছাড়া ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারেনা)।"

অনেক সময় প্রাথমিক স্তরে একটি বস্তুর প্রয়োজন হয় কিন্তু তাকে চিরন্তন মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না। অথবা শেষে তার প্রয়োজন হয় এবং এর আগের স্তরগুলোতে এর ভার বহন করার যোগ্যতা থাকে না। সংস্কার ও গঠনমূলক কর্মসূচীতে এই ধরনের অসংখ্য অবস্থা দেখা দেয় এবং তা শেষ হয়ে যেতেও থাকে। তাই সেগুলো আইনের মর্যাদা লাভ করে না এবং চিরন্তনভাবে কার্যকরযোগ্যও হয় না। কিন্তু দীর্ঘকাল সেগুলো কার্যকর থাকার কারণে এমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যার ফলে সেগুলো আসল দীন ও আইনের স্থান গ্রহণ করে। এ ধরনের অবস্থায় উপরে উল্লিখিত নীতির বেশী প্রয়োজন হয়। কখনো বস্তুকে তার মূল সীমার মধ্যে রাখার জন্য পূর্ব রূপে তার বিপরীত বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কাজেই বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর অধিকাংশ মোড় পরিবর্তনের সময় এমন ধরনের বিষয় আসে, যাকে আপাত দৃষ্টিতে বাড়াবাড়ি বলা হবে। কিন্তু যারা জাতীয় ও দলীয় জীবনের রহস্য উপলব্ধি করেন তাদের পক্ষে এই রহস্য অনুধাবন হচ্ছে যথার্থ আদল ও ভারসাম্য। কারণ এ ছাড়া ভবিষ্যতে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন সফল হতে পারে না। আইন ও বিধান সমূহে উল্লিখিত ধরনের অবস্থার প্রমাণ নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে।

প্রথম ও শেষ পর্যায়ে কোনো কোনো বিধান বিভিন্ন হয়

يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لا يُغْتَفَرُ فِي الابْتِدَاءِ وَيُغْتَفَرُ فِي الابْتِدَاءِ مَا لا يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ

"স্থায়ীভাবে এমন অনেক বিধানের প্রয়োজন হয় যেগুলো শুরুতে থাকে না। অনুরূপভাবে শুরুতে এমন অনেক বিধানের প্রয়োজন হয় যেগুলোর কোনো প্রয়োজন আর শেষের দিকে থাকে না।"[৭০]

ফকীহগণ উপর্যুক্ত নীতির মাধ্যমে বড়ই সূক্ষ্মভাবে আদল ও ভারসাম্যের বিষয়ের সমাধান করেছেন। সেখানে তারা প্রত্যেকটি অবস্থা অনুসারে ব্যাপকতা ও সংকীর্ণতার অবকাশ রেখেছেন। এ সত্যটি না বুঝার কারণে ফিক্‌হের বহু

---

৭০. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, পৃ. ৫৭

www.pathagar.com

খুঁটিনাটি ও আংশিক বিষয়ে সঙ্কট দেখা দেয় এবং কোনো কোনো বিষয় আবার পুরোপুরি বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী জানাও যায়নি।

উদাহরণ

একজন উচ্চ স্তরের ফকীহ্ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিম্নোক্ত উক্তিতে এই নীতি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দেখা যায়। তিনি বলেন,

لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ

"কোনো ব্যক্তি যেন নিজের মধ্যে শয়তানের জন্য একটি অংশের ব্যবস্থা না করে- সে কেবল ডান দিকে থেকে ঘুরে বসাকে ওয়াজিব গণ্য করে। আমি অনেক বছর রসূলুল্লাহ স.-কে বাম দিক থেকে ঘুরে (মুসল্লীদের দিকে মুখ করে) বসতে দেখেছি।"[৭১]

নামাযে সালামের পর ইমাম ডান দিক থেকে বা বাম দিক থেকে ঘুরে বসাটা কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, উভয় দিক থেকে ফিরে বসা সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যে সাহাবী রসূলুল্লাহ স.-কে যে দিক থেকে ঘুরতে দেখেছেন, তিনি তেমনটি বর্ণনা করেছেন। এ কারণে ফকীহ্গণ উভয় দিক দিয়ে ঘুরে বসাকে জায়েয গণ্য করেছেন। এদিক বা ওদিক কোন দিক থেকে ফেরাকে ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করলে হুকুমের ব্যাপকতার স্থানে সংকীর্ণতা এসে যায়। এই সংকীর্ণতাকে রুখতে হবে এবং এই কারণেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. উপরোক্ত কড়া মন্তব্য করেছেন। বাম দিক দিয়ে ফেরার পক্ষ সমর্থন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। হাদীসবিদগণের মধ্যে কেউ কেউ ডানদিক-ওয়ালা হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা অধিক মনে করে ডানদিক থেকে ঘুরে বসা শ্রেয় মনে করেন। কিন্তু কোনো এক দিক থেকে ফিরে বসাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নিলেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া হয় এবং ব্যাপককে সংকীর্ণ করা হয়।

আল্লামা নববী রহ. এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন :

إنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ

"এই (উক্তি) তারই সম্পর্কে যে একটি দিকে ফেরা অপরিহার্য মনে করে। যে ব্যক্তি দু'টির মধ্যে একটিকে অপরিহার্য মনে করবে সে ভুল করবে।"[৭২]

---

৭১. সহীহ মুসলিম, কিতাব : সলাতুল মুসাফিরীন ওয়া কাসরুহা, বাব : জাওয়াযুল ইনসিরাফি মিনাস সালাতি আনিল ইয়ামীনি ওয়াশ শিমাল, হাদীস নং-৭০৭

৭২. শারহে মুসলিম

www.pathagar.com

এ নীতির (أَنَّ الأَمْرَ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ) প্রেক্ষিতে শরীয়ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (قوة نافذة) -কে ব্যাপক এখতিয়ার দেয়। যখন কোনো অগুরুত্বপূর্ণ কাজকে লোকেরা অপরিহার্য মনে করে এবং কার্যত তাকে ফরয-ওয়াজিবের মর্যাদা দিতে থাকে তখন কিছু কালের জন্য তা ত্যাগ বা বন্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ উপায়ে গর্হিত কর্মের ব্যাপকতায় সংকীর্ণতা আনয়ণ করা হয়। অনুরূপভাবে কোনো ভালো কাজের দিক থেকে যদি জনগণের দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরে যায় তাহলে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং কিছুটা জোর তৎপরতা চালান যায়। এ উপায়ে হিতকর কর্মে উদাসীনতা (ضيق / সংকীর্ণতা) দূর করে তাতে ব্যাপক সচেতনতা (اتساع / ব্যাপকতা) আনয়ন করা হয়।

রসূলুল্লাহ স.-এর অনেক আহকাম থেকে এ নীতির উৎপত্তি প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য : মদীনা থেকে বিতাড়িত তিন ইহুদী গোষ্ঠির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টন, গনীমত[৭৩]-এর বণ্টন, ফায়[৭৪]-এর ব্যবস্থা, খায়বার বিজয়ের পর তথাকার ইহুদীদের জমি-বাগানগুলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এই একই নীতির প্রেক্ষিতে ধর্মপ্রাণ মুসলিম সেনাপতি-শাসকগণ বিজিত দেশ সমূহের অধিবাসীদের ওপর চাপানো উৎপীড়নমূলক ভূমিকর, বাণিজ্য শুল্ক ইত্যাদি হ্রাস করেছেন, ভূমি-দাস প্রথা উচ্ছেদ করেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, সেচ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছেন, অরাজকতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি বন্ধ করেছেন। সেনাপতি-শাসকগণ এ সব কাজ করেছেন নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি বিবেচনাসম্মত উপায়ে। প্রয়োজনে তারা খলীফার অনুমোদন চাইতেন। খলীফা অনুমতি দিতেন নিজ এখতিয়ারে, শুভবুদ্ধির আলোকে যাতে অশুভ ضيق এবং اتساع দুই-ই রুদ্ধ হয়। 'আব্বাসী আমলে খলীফা হারূনুর রশীদের প্রধান বিচারপতি ইমাম আবূ-ইউসুফ-এর একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

وأرجو أن يكون ذلك موسعا عليه فكيفما شاء من ذلك فعل

"আমি আশা করি এ ব্যাপারে খলীফার যে সুপ্রশস্ত এখতিয়ার রয়েছে তাকে তিনি যে ভাবে ইচ্ছা (জনকল্যাণে) প্রয়োগ করবেন।"[৭৫]

তিনি আরো বলেছেন :

واعمل بما ترى أنه أصلح للمسلمين وأعم نفعا لخاصتهم وعامتهم وأسلم لك في دينك

---

৭৩. غنيمة = যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

৭৪. فيء = বিনা যুদ্ধে লব্ধ শত্রু-পরিত্যক্ত সম্পদ

৭৫. কিতাবুল খারাজ, পৃ. ৫৯, ৬০; 'ইসলাম কা যারয়ী নিযাম' কিতাব থেকে গৃহীত।

www.pathagar.com

"মুসলিমদের জন্য তোমার (হারূনুর রশীদের) বিবেচনায় যা সব চাইতে বেশী কল্যাণকর, যাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ লোকদের ব্যাপক উপকার রয়েছে এবং যা তোমার দীনের হেফাযতের জন্য সব চাইতে প্রকৃষ্ট তাই তুমি করো। ফলকথা, মুসলিম শাসকগণ কল্যাণ রাষ্ট্র রূপে দেশ শাসনের বেলায় উপর্যুক্ত নীতির অনুসরণ ব্যাপারে এখতিয়ার রাখেন।"[৭৬]

ওয়াক্‌ফ-এর ব্যাপারে ফকীহদের মত এই নীতির আর একটি উদাহরণ

أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف لأن أصلها لبيت المال

"ওয়াক্‌ফের অধিকাংশই যখন গ্রামীণ ও কৃষি জমি হয় তখন খলীফা (বা তাঁর প্রতিনিধি) তাঁর হুকুম অনুযায়ী ব্যবস্থা করবেন, এমনকি তাতে যদি ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহের বিরোধিতাও হয়; কারণ নীতিগতভাবে এইরূপ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বাইতুলমালের সম্পদ সদৃশ (যার ওপর খলীফার পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে)।"[৭৭]

রসূলুল্লাহ স.-এর বিশেষ কর্মপদ্ধতি

রসূলুল্লাহ স.-এর বিশেষ কয়েকটি কর্মকে একথা বলে এড়িয়ে যাওয়া হয় যে, ঐগুলো তাঁর خصوصية বা খাস ব্যাপার, (সুতরাং ঐগুলো সাধারণ আইনের বা নিয়মের আওতায় আসে না)। আসলে একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, সেগুলো থেকে উল্লিখিত নীতির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়।

যেমন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন, আমি অপরাধ করেছি (মদ পান করেছি), আমাকে শাস্তি দিন। তিনি বলেন, "তুমি না এখনি আমাদের সাথে নামায পড়লে?" সে জবাব দেয়, "জ্বি-হ্যাঁ।" তিনি বলেন, "যাও, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।"

এই ক্ষমার প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর এমনভাবে পড়ে যে, এরপর থেকে সে চিরকালের জন্য মদ পান করা থেকে তাওবা করে। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, সেই ব্যক্তি বললো, "আপনার কোড়া অর্থাৎ চাবুকের (মদ পানের সাজা) ভয়ে মদ পান ত্যাগ করাকে আমি নিজের জন্য অবমাননাকর মনে করছিলাম। কিন্তু এখন যখন আপনি আমাকে মাফ করে দিলেন তখন আল্লাহর কসম, আমি ঐ অভিশপ্ত জিনিসটি আর কখনো স্পর্শ করবো না।"[৭৮]

---

৭৬. প্রাগুক্ত

৭৭. দুররুল মুখতার, খ. ১; ইসলাম কা যারয়ী নিযাম

৭৮. ই'লামুল মু'আক্‌কি'ঈন

www.pathagar.com

অপরাধ করে তা স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে স্বীকার করা এবং শাস্তির আবেদন করা- এ থেকে রসূলুল্লাহ্ স. তার অন্তরের গভীর এবং খাঁটি অনুশোচনা বা তাওবা আঁচ করতে পেরেছিলেন বলে শরীয়তের বিধান মওকুফ করে দিলেন। ফল হলো অতীব সন্তোষজনক।

একটি ঘটনায় অপরাধীর পরিবর্তে নিরপরাধ (যিনি অপরাধীকে বাঁচাবার জন্য এসেছিলেন) পাকড়াও হয়ে যান। রসূলুল্লাহ স. তাকে শাস্তির হুকুমও শুনিয়ে দেন। এ অবস্থা দেখে অপরাধী নিজেই এগিয়ে এসে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয় এবং দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপরাধমুক্ত ঘোষণা করে। রসূলুল্লাহ্ স. উভয়ের শাস্তি মাফ করে দেন। ধৃত ব্যক্তিকে এজন্য মাফ করেন দেন যে, তিনি আসলে অপরাধী ছিলেন না। আর অপরাধীকে এজন্য যে, তিনি নিরপরাধ ব্যক্তির জান বাঁচাবার তথা তার অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেন। রসূলুল্লাহ্ স. অপরাধীকে বললেন, তুমি খাঁটি তাওবা করেছো। উমর রা.-এর মনে খটকা ঠেকলো যে, অপরাধ স্বীকারের পর অপরাধীকে শাস্তি না দেয়া তাকে উৎসাহিত করার শামিল। কাজেই তিনি শাস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি রসূলুল্লাহ্ স.-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৭৯] কিন্তু দূরদর্শী রসূল স. তাঁর মতে অবিচল রইলেন। এই অপরাধীর অপরাধ স্বীকারের মধ্যে তার সত্যিকার তাওবার সে দেদিপ্যমান প্রকাশ হয়েছিল, শাস্তি দিলে তা হয়ত হতো না। সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবহার করলেন খালাস দেওয়ার পক্ষে- ضيق-এর মোকাবিলায় তিনি اتساع-এর পথ ধরলেন। মুসলিম শাসক এবং বিচারককে শরীয়ত অবস্থা বিশেষে এরূপ এখতিয়ার দিয়েছে। তবে এই এখতিয়ার ব্যতিক্রমধর্মী, সাধারণত ফৌজদারী মামলায় তা প্রয়োগ করা যায় যদি কারীনা[৮০] বা অবস্থাদৃষ্টে শুভ পরিণতির প্রত্যাশা করা যায়।

সামগ্রিক নীতি : ১৩

الأَحْكَامُ الظَّاهِرَةُ تَابِعَةٌ لِلأَدِلَّةِ الظَّاهِرَةِ

"প্রকাশ্য আহকাম প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণের অনুর্বতী হবে।"

অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে যা দলীল-প্রমাণ পাওয়া যাবে, মামলার রায় হবে তারই ভিত্তিতে; আমরা মানুষ, যা দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়গাহ্য (ظاهر) তাই আমরা জানতে পারি, অদৃশ্য বা باطن-এর খবর রাখেন আল্লাহ।

---

৭৯. নাসায়ী

৮০. قرينة = বহুবচনে قرائن = ইঙ্গিত।

www.pathagar.com

এই ظاهر-এর ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ স. উক্ত ব্যক্তির শাস্তির হুকুম দেন যদিও সে আসলে অপরাধী ছিল না কিন্তু প্রকাশ্য সাক্ষ্য প্রমাণ তাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল।

সামগ্রিক নীতি : ১৪

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"জনগণের ব্যাপারে ইমামের এখতিয়ার কল্যাণ-নির্ভর হতে হবে।"

ইসলামী শরীয়তে আইন প্রয়োগকারী শক্তি ডিকটেটর বা একনায়ক রাজশক্তির পর্যায়ভুক্ত নয়, জনগণের সাথে তার সম্পর্ক প্রভু ও গোলামের মতো নয়। বরং তার অবস্থান "আমানতদার" (امين)-এর। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"অবশ্য আল্লাহ তোমাদের হুকুম দেন, আমানতসমূহকে তাদের প্রাপকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে, আর যখন তোমরা লোকদের বিচার-আচার করবে তখন আদল (ইনসাফ)-এর ভিত্তিতে ফায়সালা করবে।"[৮১]

"আমানত" বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি কারো কাছে কিছু অর্থ বা সম্পদ গচ্ছিত রাখা। কিন্তু এর অর্থ খুবই ব্যাপক। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখ বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীগণের ব্যাখ্যার আলোকে মুফাসসিরগণ বলেন :

ان الامانات جمع امانة يعم الحقوق المتعلقة بذمتهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد

"আয়াতে উল্লিখিত امانات শব্দটি امانة-এর বহুবচন; তাদের (আমানতদারদের) দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ্‌র সমস্ত অধিকার এবং বান্দাদের যাবতীয় অধিকার সমভাবে এই শব্দের অর্থের শামিল।"[৮২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় যায়েদ ইবনে আসলাম রা. বলেন :

أن هذا خطاب لولاة الأمر أن يقوموا برعاية الرعية وحملهم على موجب الدين والشريعة ، وعدوا من ذلك تولية المناصب مستحقيها

"এই আয়াতে يَأْمُرُكُمْ বলে শাসকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা যেন তাদের কর্তৃত্বাধীন সব মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে, তাদেরকে দীন ও শরীয়তের চাহিদা পূরণে অভ্যস্ত করে, রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলোতে যোগ্য লোকদের নিয়োগও এই আমানত শব্দের অর্থের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়।"[৮৩]

---

৮১. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৮
৮২. ইসলাম কা যারয়ী নিযাম, পৃ. ২৯১
৮৩. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

আইন প্রয়োগকারী অর্থাৎ শাসন কর্তৃপক্ষের সমস্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার মানুষের কল্যাণে পরিচালিত হতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই। ফিক্‌হ গ্রন্থগুলোতে আরো বলা হয়েছে :

وَيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَصْرِفَ إِلَى كُلِّ مُسْتَحِقٍّ قَدْرَ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَسِيبًا

"ইমামের কর্তব্য আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং প্রত্যেক হকদারের জন্য তার প্রয়োজন মত প্রাপ্য নির্ধারণ করা যেন তার অধিক না হয়, যদি ইমাম ক্রটি করে তবে নিকাশ করবার জন্য আল্লাহ্ তো রয়েছেন।"[৮৪]

অতএব দেখা যায়, আইন প্রয়োগকারী সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। যদি সে শরীয়তের বিপরীত রায় দেয় তাহলে, ফকীহ্‌গণ বলেন :

لَمْ يَنْفُذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلا إِذَا وَافَقَهُ ، فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذْ

"তাহলে তার রায় আইনত কার্যকরী হবে না। শরীয়ত সম্মত হলেই কার্যকরী হবে, শরীয়ত বিরুদ্ধ হলে হবে না"। দৃশ্যত কল্যাণকর অথচ পরিণামে অকল্যাণ বা অসুবিধাজনক কাজের আদেশ দেয়ার অধিকারও তার নেই। যথা এমন জায়গায় মসজিদ নির্মাণের বা মসজিদের পরিসর বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়া জায়েয নয়, যে জায়গার সাথে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত থাকে এবং যার ফলে লোকের যাতায়াতে বা ব্যবসায়ে কষ্ট হয়।"[৮৫]

ওয়াক্‌ফ (وقف) এবং ইয়াতীমদের ব্যাপারে এ নীতির প্রয়োগ

অনুরূপভাবে এমন ধরনের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি যার মালিক উপস্থিত নেই এবং সাধারণভাবে তা তার এখতিয়ারভুক্ত তার মধ্যে এমন কোনো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই যা মাস্‌লাহাতবিহীন এবং যার ফলে কোনো শ্রেণীর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

ফকীহ্‌গণ বলেন :

تَصَرُّفُ الْقَاضِي فِيمَا لَهُ فِعْلُهُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ، وَالتَّرِكَاتِ ، وَالأَوْقَافِ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ

"ইয়াতীমের সম্পদ, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির ব্যাপারে কাযীর অধিকার মাস্‌লাহাতের শর্তসাপেক্ষ, মাস্‌লাহাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তা শুদ্ধ (কার্যকরী) হবে না।"[৮৬]

---

৮৪. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর

৮৫. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, পৃ. ৮৮

৮৬. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, পৃ. ৮৮

www.pathagar.com

মাস্‌লাহাতের ব্যাপারে ফকীহ্‌গণের সতকর্তার একটি উদাহরণ হচ্ছে : তাদের মতে ওয়াক্‌ফের আয় থেকে মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য মাইনে করা লোক নিয়োগ জায়েয নয় যদি বিনা পারিশ্রমিকে কেউ এ কাজে এগিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য যদি ওয়াকিফ[৮৭]-এর শর্তাবলীতে এই খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে কিংবা স্বেচ্ছাসেবী না পাওয়া যায় তবে জায়েয হবে। ফকীহ্‌গণ আরো বলেন :

> أَنَّ مِنَ الْقَضَاءِ الْبَاطِلِ الْقَضَاءَ بِخِلَافِ شَرْطِ الْوَاقِفِ ؛ لأَنَّ مُخَالَفَتَهُ كَمُخَالَفَةِ النَّصِّ
>
> "ওয়াকিফের (ওয়াক্‌ফকারী) শর্তাবলীর প্রতিকূলে বিচারকের ফায়সালা বাতিল গণ্য হবে। কারণ ওয়াকিফের বিরোধিতা নস (কুরআন-হাদীস)-এর বিরোধিতার নামান্তর।"[৮৮]

তবে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের বৃদ্ধি ও উন্নতির ব্যবস্থা বা সম্পত্তির ক্ষতিরোধের ব্যবস্থা কাযীর এখতিয়ারভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, যদি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী (متولی) বা তত্ত্বাবধায়ক মুনতাযিম (منتظم) ব্যবস্থাপক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা চরিত্র দোষে সম্পদের ক্ষতি সাধন করে, তাকে বরখাস্ত করার অধিকার কাযী বা কর্তৃপক্ষের অবশ্যই থাকবে।

মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে শরয়ী ওযর সৃষ্টি হয়ে গেলে আলাদা করা অপরিহার্য

মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপকের মধ্যে যদি শরয়ী ওযর সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তাকে আলাদা করে নেয়া অপরিহার্য। যেমন, ওয়াক্‌ফের সম্পদ তার কারণে সংরক্ষিত থাকছে না। তিনি ব্যবস্থাপনা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তিনি ফাসেক দুশ্চরিত্র, মদ পান, চুরি, জুয়া ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।[৮৯]

পারিবারিক মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব ততদিন পর্যন্ত চলতে পারে যতদিন পরিবার থেকে প্রকাশ্য খেয়ানতের প্রকাশ না ঘটে। খেয়ানতের প্রমাণ বা কোনো শরয়ী ওযর সৃষ্টি হবার পর শাসক তাকে আলাদা করে দিতে পারেন। কারণ এসব হস্তক্ষেপ মাস্‌লাহাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং ওয়াক্‌ফকে আরো ভালো করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হবে।[৯০]

মুতাওয়াল্লীর জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, তাকে আমানতদার হতে হবে, বিশ্বস্ত হতে হবে, আল্লাহ্‌কে ভয় করতে হবে। তিনি খেয়ানতকারী, অর্থ তসরুপকারী, চোর ও দায়িত্বহীন হবেন না। তিনি মুতাওয়াল্লীর পদ লাভ করার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা

---

৮৭. واقف = যিনি ওয়াক্‌ফ করেন।

৮৮. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, পৃ. ৮৯

৮৯. রদ্দুল মুহ্‌তার, খ. ৩

৯০. আলমগীরী, ওয়ালাতুল ওয়াক্‌ফ অধ্যায়।

www.pathagar.com

চালাবেন না। কারণ এহেন ব্যক্তির কাছ থেকে বেশী দায়িত্বানুভূতির আশা করা যেতে পারে না। জনগণ ও তাদের সম্পদের ওপর রাষ্ট্রের সাধারণ অভিভাবকত্ব স্বীকার্য কিন্তু তা নিরঙ্কুশ নয়। ফকীহ্‌দের কথায় :

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

"বিশেষ অভিভাবকত্ব সাধারণ অভিভাবকত্বের চাইতে বেশী শক্তিশালী।"

সাধারণ পর্যায়ে সরকার অভিভাবকত্ব ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রাখে। কিন্তু যারা বিশেষ পর্যায়ে অধিকার রাখে তারা সরকারের ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। তারা যদি সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয় তবুও। তবে কোনো অবস্থায় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা তাদের সামর্থের বাইরে চলে গেলে অথবা তাদের অযোগ্যতা ও অব্যবস্থাপনার প্রমাণ সংগৃহীত হয়ে গেলে সরকার তাদের বেদখল অথবা অন্য কোনো উপযোগী ব্যবস্থাপনা করতে পারে।

এ নীতির আওতায় ফকীহ্‌গণ বলেন :

لا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ وَصِيِّهِ ، وَلَوْ كَانَ مَنْصُوبَهُ

"ইয়াতীমের ওয়াসী (وصى)[৯১] বর্তমান থাকতে কাযী (শাসক) ইয়াতিমের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন না, কাযী নিজেই ওয়াসী নিযুক্ত করলেও না।"

মুতাওয়াল্লীর অধিকার সম্বন্ধে ফকীহ্‌গণের নীতি হচ্ছে :

أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَمْلِكُ عَزْلَ الْمُقِيمِ عَلَى الْوَقْفِ إلا عِنْدَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ مِنْهُ

"কাযীর অধিকার নেই ওয়াকিফ কর্তৃক নিয়োজিত কায়্যিম (Administrater বা মুতাওয়াল্লী)-কে বরখাস্ত করার যে পর্যন্ত খিয়ানত (خيانة) প্রমাণিত না হয়।"

তারা আরো বলেন :

لا يَمْلِكُ الْقَاضِي التَّصَرُّفَ فِي الْوَقْفِ مَعَ وُجُودِ نَاظِرٍ وَلَوْ مِنْ قِبَلِه

"ওয়াক্‌ফের ব্যবস্থাপকের উপস্থিতিতে কাযী (বা শাসক) ওয়াক্‌ফের সম্পত্তিতে কোন এখতিয়ার খাটাতে পারবে না, এমনকি যদি কাযী কর্তৃক ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হয়।"[৯২]

---

৯১. ওসী (وصى) অর্থ মনোনীত অভিভাবক (Trustee and Executor), যাকে প্রকৃত অভিভাবক (যথা বাবা বা দাদা) জীবদ্দশায় তার অন্তিম ইচ্ছা (وصية) রূপে মনোনয়ন দান করেন যাতে সে ইয়াতীম ছেলে-মেয়ের ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে পারে।

৯২. আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযাইর, পৃ. ১১৫

www.pathagar.com

এ নীতির আওতায় কতিপয় বিধানের উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. অভিভাবক (ولى)[৯৩] এর উপস্থিতিতে কাযী বা শাসক নিজ এখতিয়ারে ইয়াতীম ছেলের ও ইয়াতীম মেয়ের বিবাহ দিতে পারেন না।

২. নিহত ব্যক্তির ওয়ালী চাইলে হত্যাকারী থেকে কিসাস (প্রাণের বদলে প্রাণ) নিতে পারে, দিয়্যাত বা শোণিতপণ আদায় করে আপোষ করতে পারে অথবা তাকে মাফ করে দিতে পারে। কিন্তু মাফ করে দেয়ার অধিকার শাসকের নেই। ওয়ালী বর্তমান না থাকলে অথবা ওয়ালী-এর খেয়ানত প্রমাণিত হলে (যথা ওয়ালী ধনের লোভে ছেলে বা মেয়ের স্বার্থ উপেক্ষা করে অসঙ্গত জায়গায় বিবাহ দিতে উদ্যোগী হলে) কাযী বিবাহের ব্যাপারে অভিভাবকত্ব লাভ করবে। নিঃসন্দেহে এমন অবস্থায় ওয়ালী-এর অভিভাবকত্ব বাতিল হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অভিভাবকত্বের ব্যাপারে স্তরভেদ এবং এখ্‌তিয়ারের প্রভেদ রয়েছে। যেমন :

১. পর্যায়ক্রমে ইয়াতীমের বাবা ও দাদা উভয়েই অর্থ ও বিবাহ উভয় ব্যাপারে অভিভাবকত্ব লাভ করবে। এরা দু'জন নিজেদের এই অধিকার থেকে অব্যাহতি চাইলেও তারা অব্যাহতি পাবে না।

২. ইয়াতীমের মা, ভাই, চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি কতিপয় আত্মীয় পর্যায়ক্রমে অভিভাবকত্ব লাভ করতে পারে; তারা বিবাহের অভিভাবকত্ব লাভ করবে, সম্পদের অভিভাবকত্ব লাভ করবে না।

৩. অনাত্মীয় ওয়াসী (وصى) শুধুমাত্র সম্পদের অভিভাবকত্ব লাভ করবে। বিবাহের অভিভাবকত্ব লাভ করবে না।

সামগ্রিক নীতি : ১৫

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কাজের বিচার হবে।"

এই মূলনীতির আওতায় প্রদত্ত বিধানের কয়েকটি উদাহারণ নিম্নরূপ :

১. মদ তৈরী করার উদ্দেশ্যে না হয়ে যদি সিরকা বানাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে আংগুর ইত্যাদি ফলের রস নিংরানো হয় তাহলে তা বৈধ।

---

৯৩. ওলী (বহুবচন أولياء)- হচ্ছে এমন নিকট আত্মীয় (রক্ত সম্পর্কে) যে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর শরীয়ত অনুযায়ী তার ইয়াতীম ছেলে-মেয়ের অভিভাবকত্ব (ولاية) প্রাপ্ত হয়।

www.pathagar.com

২. কারোর সাথে সম্পর্ক তিন দিনের বেশী ছিন্ন রাখা জায়েয নয়। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি মূলত সম্পর্ক ছিন্ন করা না হয়ে থাকে বরং তাতে শরীয়ত সম্মত কোনো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তিন দিনের বেশীতে কোনো ক্ষতি নেই।

৩. স্বামীর মৃত্যু ছাড়া আর কারোর মৃত্যুতে স্ত্রীর জন্য তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি শোক প্রকাশ করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তাহলে তিন দিনের বেশী সময় সাজসজ্জা (শোক প্রকাশের একটি পদ্ধতি) ইত্যাদি পরিত্যাগ করায় কোনো ক্ষতি নেই।

৪. শত্রু যদি মুসলিমদের এবং তাদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমদের সামনে ঠেলে দেয়, পাল্টা হামলায় যদি তাদের হত্যা করা উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে বরং শত্রুর কাছে পৌঁছে যাওয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ না থেকে থাকে, তাহলে ঐ মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

৫. নামাযের উদ্দেশ্য পাল্টে যায়, নামাযরত অবস্থায় এমন কাজ করলে নামায বাতিল (باطل) হয়ে যায়, যথা : কোনো ব্যক্তির কথার জবাবে কুরআন মাজীদের কোন আয়াত তেলাওয়াত করা; কোনো সুখবর শুনে "আলহামদুলিল্লাহ" বলে ফেলা; অপ্রীতিকর কোনো কথা শুনে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলা; মৃত্যুর খবর শুনে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন" পড়ে ফেলা।

৬. প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা বা বজায় রাখার জন্য কুফরীর ফতওয়া দেওয়া শরীয়তবিরুদ্ধ কর্ম। বিশেষত এই জন্য যে, এ জাতের উদ্দেশ্যমূলক কুফ্‌রী ফতওয়া মুসলিম জনগণের ঐক্য বিনষ্ট করে।

৭. নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী নয়, নিছক লোভের বশবর্তী হয়ে ক্ষুধা নিবারণের প্রয়োজনের চাইতে বেশী করে খাওয়া হারাম। কিন্তু রোযা রাখার উদ্দেশ্যে বা নিমন্ত্রণকারীর আবদারে কিছু অতিরিক্ত আহার জায়েয।

৮. যে সিন্দুকে বা গাঁঠরীতে কুরআন মাজীদ রাখা আছে যদি তার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা তাকে অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার ওপর বসা যায়, তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই; সাধারণ অবস্থায় তা নাজায়েয।

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ১৬

اَلْيَقِيْنُ لا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"বিশ্বাস বা নিঃসন্দেহ অবস্থা সন্দেহের দ্বারা অপসারিত হয় না"

রসূলুল্লাহ স.-এর কথায় এ সামগ্রিক নীতির সূত্র পাওয়া যায় :

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِه شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِد حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"যদি কেউ পেটে এমন কিছু অনুভব করে যাতে তার পক্ষে, পেট থেকে [অযু (وضوء) ভঙ্গকারী] কোনো জিনিস বেরুলো কিনা বোঝা মুশকিল হয়, তাহলে সে অবশ্যই মসজিদ থেকে বেরোবে না (অযু করবার জন্য) যতক্ষণ না সে (বায়ু নিঃসণের) শব্দ শোনে অথবা গন্ধ পায়।"[৯৪]

কারণ, প্রথম অবস্থাটি অর্থাৎ তার পবিত্রতার (طهارة) কথাটি ছিল নিঃসংশয়, এখন সন্দেহ হচ্ছে অযু ভেঙ্গে গেল না কি। এই সন্দেহ পূর্ববর্তী নিঃসংশয় অবস্থার অবসান ঘটাবে না।

لأَنَّ الشَّكَّ الطَّارِئَ لا يَرْفَعُ حُكْمَ الْيَقِيْنِ السَّابِق

"কেননা পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট সন্দেহ পূর্বেকার বিশ্বাসের হুকুমকে খতম করে না।"

যেমন নাপাক কাপড়ের কোথায় নাজাসাত লেগে আছে তা খুঁজে পাওয়া গেলো না এবং সম্পূর্ণ কাপড়টা ধোয়াও কঠিন। এ অবস্থায় অনুমানের ভিত্তিতে যে জায়গায় নাজাসাত লেগে থাকার সম্ভাবনা বেশী পাওয়া যায় সেই জায়গাটি ধুলেই কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। কারণ মূল হচ্ছে পবিত্রতা। নাজাসাত একটি মধ্যবর্তীকালীন ঘটনা। একটি জায়গায় যখন অনুমান করে ধুয়ে ফেলা হবে তখন মূল তাহারাত তার নিজের জায়গায় যথারীতি কায়েম হয়ে যাবে। তবে সতর্কতার দাবী অনুযায়ী সমগ্র কাপড়টি ধুয়ে ফেলা উচিত। ফকীহগণ বেশ কিছু মাসায়েলকে এই নীতির বাইরে রেখেছেন। ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

অন্য কথায় একই সামগ্রিক নীতির রূপ

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

"নীতি হচ্ছে (সন্দেহের অবস্থায়) যে অবস্থা আগে ছিল তার স্থিতি।"

যেমন, হাদাছ[৯৫] হয়েছে বলে সন্দেহে ফের অযু করতে হবে না, তেমনি হাদাছ হয়েছিল জানা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে হয়তোবা অযু আছে তা হলে করতে হবে।

---

৯৪. সহীহ মুসলিম, কিতাব : আল-হায়য, বাব : আদ-দালীল 'আলা আন্না মান তায়াক্কানাত তাহারাহ ছুম্মা শাক্কা ফিল হাদাছি ফালাহু আয়্যুসাল্লিয়া, হাদীস নং-৩৬২

৯৫. حدث = অযু ভঙ্গের অবস্থা।

www.pathagar.com

তদ্রূপ কোনো স্থানের মাটি বা ধূলা, কাদা ইত্যাদিকে পবিত্র মনে করা হবে যতক্ষণ তার সম্পর্কে অপবিত্র হওয়ার নিঃসন্দেহ প্রমাণ না পাওয়া যাবে অথবা নাপাকী সম্বন্ধে প্রবলতর ধারণা (ظن غالب) না হবে (সে মাটিতে নামায পড়া বা তা দিয়ে তায়াম্মুম করা চলবে)।

কোনো ব্যক্তি সুব্‌হে সাদিক (صبح صادق / ঊষা)-এর আগমন হয়নি বলে মনে করে যদি সাহ্‌রী খায় এ অবস্থায় তার সওম হয়ে যাবে। কারণ পূর্ববর্তী অবস্থায় (রাত) বাকি থাকাই হচ্ছে আসল। কিন্তু উত্তম হচ্ছে, এমন অবস্থায় সাহ্‌রী না খাওয়া। বিশেষ করে যখন আকাশে মেঘ থাকে বা চাঁদনী রাতের কারণে সময়ের সঠিক নির্ধারণ সম্ভব না হয়। বিপরীতপক্ষে যদি সূর্য ডোবার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে ইফতার জায়েয হবে না।

সামগ্রিক নীতি : ১৭

مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَمْ لا؟ فَالأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ

"যার কোনো কাজ করার ও না করার ব্যাপারে সন্দেহ হয় তবে না করাই আসল বলে মেনে নেয়া হবে।"

অনুরূপভাবে-

مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ ، وَالْكَثِيرِ حَمَلَ عَلَى الْقَلِيلِ

"যদি কোনো কাজ করার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে কিন্তু তার মধ্যে কমবেশী হবার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে কমের ওপর আমল করা হবে।"

প্রথম অবস্থায় না করা নিশ্চিত ধরতে হবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় কম করা নিশ্চিত জ্ঞান করতে হবে। যেমন ফিক্‌হে বলা হয় :

مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لا يَرْتَفِعُ إِلا بِيَقِينٍ

"যে কথা প্রত্যয় (يقين) দ্বারা প্রমাণিত তাকে প্রত্যয়ই খতম করতে পারে।"

ফকীহদের ব্যবহৃত চারটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্যণীয় :

১. يقين = ظن غالب অর্থাৎ প্রবল ধারণা;

২. ظن = ترجيح جهة الصواب অর্থাৎ صواب (সত্যতা)-র দিককে অগ্রগণ্য করা (ترجيح);

৩. الوهم = رجحان جهة الخطاء অর্থাৎ خطاء (ভুল)-এর দিকটি অগ্রগণ্য হওয়া;

৪. الشك = تساوى الطرفين অর্থাৎ সন্দেহ বলতে উভয় দিকের সমান সম্ভাবনা বুঝতে হবে।

www.pathagar.com

ফকীহগণের মতে شك অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত অবস্থায় যদি কোনো একদিকের পাল্লা ভারী (ظن غالب) না হয় তাহলে হুকুম বা বিধান شك-এর ভিত্তিতে হবে যাতে করে شك উন্নীত হয় يقين-এর পর্যায়ে, যেমন :

১. তালাক দেয়া হয়েছে কি হয়নি বলে যে ব্যক্তির মনে সন্দেহ হয় অর্থাৎ যদি সন্দেহ হয় দুই তালাক দেয়া হয়েছে না তিন তালাক, তাহলে দুই তালাক ধরা হবে।

২. নামায পড়ার বা না পড়ার ব্যাপারে যার মনে সন্দেহ হয় তাকে পুনর্বার নামায পড়তে হবে। আর যদি রাকআতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে (যথা দু' রাকআত কি তিন রাকআত) তাহলে কম সংখ্যাটিই সঠিক বলে হুকুম দেয়া হবে।

৩. যদি ইমাম ও মুকতাদী (مقتدى) দের মধ্যে রাকআতের সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ হয় এবং ইমামের নিজের কথার ওপর তাঁর প্রত্যয় (يقين) থাকে, এক্ষেত্রে নামায আবার পড়ার দরকার নেই। আর যদি প্রত্যয় না থাকে, তাহলে আবার পড়া জরুরী।

৪. যুহর (ظهر)-এর নামাযের নিয়ত বেঁধেছে। এক রাকআত পড়ার পড় তার সন্দেহ হয়, সে আসর (عصر)-এর নামায পড়ছে, তৃতীয় রাকআতে সন্দেহ হয়, সে নফল (نفل) পড়ছে, চতুর্থ রাকআতে সন্দেহ হয়, সে যুহরের নামাযই পড়ছে। এ অবস্থায় সন্দেহের কোনো মূল্য বা প্রভাব থাকবে না এবং যুহরের নামায হয়ে যাবে।

কম ও বেশী এই সংক্রান্ত নীতি থেকে নিচের কয়েকটি অবস্থা ব্যতিক্রম গণ্য হবে। এগুলো সাধারণত অন্যের হক (حق) বা অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। যেমন :

১. এক ব্যক্তির কাছে কয়েক ধরনের সম্পদ আছে এবং সবগুলোর ওপর যাকাত (زكوة) ওয়াজিব হয়। কিন্তু সন্দেহ হল, যত রকমের সম্পদ আছে সবগুলো তার মালিকানায় পূর্ণ একটি বছর রয়েছে কি না। এক্ষেত্রে সমগ্রের উপর যাকাত দিতে হবে, কারণ এতে দুঃস্থজনের অধিকার সংশ্লিষ্ট।

২. যদি ধরে নেয়া যায় যে, তালাক ও মৃত্যুর 'ইদ্দত (عدة)-এর মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, এক্ষেত্রে দীর্ঘতর অর্থাৎ মৃত্যুর 'ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পালন করতে হবে।

কোনো কোনো বিষয়ে অনস্তিত্বই আসল

الأَصْلُ الْعَدَمُ

"আসল হচ্ছে অনস্তিত্ব তথা না হওয়া।"

www.pathagar.com

১. যেমন, দু'জন শরীকের মধ্যে লাভের ব্যাপারে বা লাভের পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ হলো। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি লাভ না পাওয়ার বা কম পাওয়ার শপথ করে তার কথাই প্রাধান্য পাবে। কারণ আসল হচ্ছে (লাভ) না হওয়া। তবে যদি বিরোধী পক্ষের কাছে শক্তিশালী প্রমাণ থাকে, তাহলে তার কথা গ্রহণীয় হবে।

২. স্ত্রী স্বামীর কাছে খোরপোষের দাবী করলো এবং স্বামী তা আদায় করা হয়েছে বলে শপথ করলো। অথবা ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় করা হয়েছে বলে শপথ করলো এবং ঋণদাতা অস্বীকার করলো। এক্ষেত্রে স্ত্রী ও ঋণদাতার কথা গ্রাহ্য হবে। কারণ আসল হচ্ছে না হওয়া এবং এরা দু'জনই এই না হওয়ার দাবীদার। (তবে এর বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেলে ফায়সালার ধরন বদলে যাবে)।

কোনো কোনো বিষয়ে অস্তিত্বই আসল

الأَصْلُ الْوُجُودَ

"অস্তিত্বই আসল।"

যেমন, প্রাপ্ত বয়স্ক দেখে কোনো পশু কেনা হলো। তারপর বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। এক্ষেত্রে বিক্রেতার বক্তব্য গ্রাহ্য হবে। কারণ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া আসল গুণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এর বিরুদ্ধে যদি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে ক্রেতার কথা গ্রাহ্য হবে।

সামগ্রিক নীতি : ১৮

الأَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ

"নীতিগতভাবে নতুন ঘটনার সম্পর্ক হবে নিকটতর সময়ের সাথে।"

১. তালাকপ্রাপ্ত মহিলার দাবী হচ্ছে, স্বামী মৃত্যু-রোগের সময় তাকে তালাক দিয়েছিল, কাজেই সে পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকার (ميراث)-এর দাবীদার। অন্যদিকে ওয়ারিসগণ বলছে, অন্তিম রোগে আক্রান্ত হবার আগেই তালাক দিয়েছিল, কাজেই মীরাসে তার হক নেই। কোনো পক্ষই কিন্তু তাদের দাবী প্রমাণ করতে পারছে না। এ অবস্থায় উল্লিখিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মহিলার কথা গ্রাহ্য হবে। কারণ তার দাবী নিকটতর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

২. এক ব্যক্তির কাপড়ে নাজাসাত (নাপাক জিনিস) লেগেছে যখন সে নামায পড়ছিল। ঠিক কখন লেগেছিল তা সম্যক নিরূপণ সম্ভব নয়। এ অবস্থায় নিকটবর্তী সময়ের সাথে অর্থাৎ সে যখন জানতে পারলো সে

www.pathagar.com

সময়ের সাথে নাজাসাত লাগা সম্পর্কিত হবে। ফলে সে সময়ের পূর্বে সম্পাদিত সকল নামায নয়, কেবলমাত্র শেষ দিকের নামাযই পুনর্বার পড়তে হবে। অবশ্য সম্পূর্ণ নামায পুনরায় পড়া উত্তম।

৩. পানিয় কুয়ায় মরা ইঁদুর পাওয়া গেলো। কবে থেকে ইঁদুরটা মৃত অবস্থায় কুয়ায় পড়েছিল তা জানা গেলো না। এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর নীতির প্রেক্ষিতে যখন থেকে কুয়ার পানির অপবিত্র অবস্থা জানা গেছে তখন থেকেই তাকে নাপাক ঘোষণা করা হতে পারে। ফলে সে সময়ের আগে যারা এ কুয়ার পানিতে অযু করেছে তাদের নামায শুদ্ধ। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. তিন রাতের নামায পুনর্বার পড়া জরুরী গণ্য করেন। উল্লেখ্য, এ নীতির প্রয়োগ সব সময় হয় না, খুঁটিনাটি (جزئيات) বিষয়ে অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে এই নীতির বিপরীত বিধান দেয়া হয়। ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

সামগ্রিক নীতি : ১৯

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

"মূলত সব বস্তুই মুবাহ (مباح)" অর্থাৎ বৈধ।"

শরীয়তে যে সব জিনিস সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই কেবলমাত্র সেগুলোর সাথেই এই নীতির সম্পর্ক রয়েছে।

রসূলুল্লাহ স. বলেন :

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, এই দু'য়ের মাঝখানে কিছু বিষয় আছে যেগুলো সন্দেহযুক্ত (অর্থাৎ যেগুলো সম্পর্কে কোন হুকুম নেই)।"[৯৬]

কাজেই যেসব বিষয়ের হালাল ও হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট হুকুম রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে কোনো সংশয়ের অবকাশই নেই। তবে যেগুলোর ব্যাপারে কোনো হুকুম নেই এবং কিয়াস, ইস্‌তিহ্‌সান ইত্যাদির সাহায্যে উদ্ভাবিত কোনো দলীলের ভিত্তিতেও কোনো একটি দিককে প্রাধান্য দেয়া যায় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত নীতি প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদেরকে মুবাহ হওয়ার হুকুম দেয়া হবে।

ফকীহগণ অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে এ নীতিটি ব্যবহার করেছেন। এমন কি কেউ কেউ এ নীতির বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেছেন :

---

৯৬. সহীহুল বুখারী, কিতাব : আল-বুয়ূ, বাব : আল-হালালু বায়্যিনুন ওয়াল হারামু বায়্যিনুন ওয়া বায়নাহুমা মুশতাবিহাত, হাদীস নং-১৯৪৬

www.pathagar.com

أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ

"সব বস্তুই মূলত হারাম।"

কিন্তু কুরআনের প্রখ্যাত তাফসীরকার আবু বকর জাস্‌সাস অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

أن الأشياء على الإباحة مما لا يحظره العقل فلا يحرم منه شيء إلا ما قام دليله

"সুস্থবুদ্ধি যে জিনিসে বাধা দেয় না তা সবই মুবাহ; যেগুলোর হারাম হবার ব্যাপারে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো ব্যতীত কোনো জিনিসই হারাম নয়।"[৯৭]

মোটকথা এ নীতির যথার্থ প্রয়োগের জন্য চাই গভীর ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি এবং ব্যাপক তথ্যানুশীলন।

কিন্তু কোনো নারীর ব্যাপারে হারাম বা হালাল হওয়া সন্দেহযুক্ত হলে নীতি হচ্ছে تحريم / হারাম-এর হুকুম দেয়া, যেমন ফকীহগণ বলেন :

الأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

"নারীর ব্যাপারে আসল বিষয় হচ্ছে হারাম হওয়া।"

নিছক প্রয়োজনের খাতিরে তাকে হালাল করা হয়েছে। তাই প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই তার ব্যাপকতা ও সংকীর্ণতার বিচরণ। মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন যাত্রা কখনো ব্যাপকতার আশ্রয় নিতে বাধ্য করে আবার কখনো এর প্রয়োজন হয় না। কারণ অবস্থার দাবী সব সময় সমান হয় না। তাই শরীয়ত আসলের (হারাম হওয়া) প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। আদলের (জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করা) শর্ত সহকারে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অবকাশ রেখেছে। আর এর প্রয়োজন না হলে একজনকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি তার কয়েকজন স্ত্রীর মধ্যে একজনকে তালাক দিল, কিন্তু কাকে তালাক দিয়েছে তা আর মনে থাকলো না। এ অবস্থায় কাউকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কারণ প্রত্যেকের ব্যাপারে সন্দেহ রয়ে গেছে এবং তালাকদত্তাকে চিহ্নিত করার উপায়ও নেই। তদ্রূপ এক ব্যক্তি তার এক স্ত্রীকে রেখে বাকি সব স্ত্রীকে তালাক দিল। যদি তালাকদত্তা স্ত্রীকে চিহ্নিত করার উপায় না থাকে তবে সব স্ত্রীই হারাম হয়ে যাবে। স্তন্যপানের বয়সে কোন ছেলে এবং মেয়ে একই নারীর স্তন্যপান করলে তাদের মধ্যে বিবাহ হারাম। স্তন্যপানের ব্যাপারে সন্দেহ উপস্থিত হলে, সন্দেহের ভিত্তিতে হুকুম হবে না, হুকুম হবে ইয়াকীন (يقين) (প্রত্যয়)-এর ভিত্তিতে অর্থাৎ যতক্ষণ পেটে দুধ পৌঁছে গেছে বলে প্রমাণ হবে না ততক্ষণ, শুধু স্তন শিশুর মুখে ধরে দিলেই হুরমত

৯৭. আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩০

www.pathagar.com

(বিবাহ হারাম হওয়া) প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ অনেক সময় মেয়েরা শিশুদেরকে ভুলাবার জন্য এমনটি করে থাকে, অথচ স্তনে দুধ থাকে না। যদি কোনো মহিলা বলে, আমার স্তনে আদৌ দুধই ছিল না, অমুক মেয়েকে/ছেলেকে ভুলাবার জন্য আমি তার মুখে আমার স্তন ধরেছিলাম মাত্র, তাহলে মহিলাটির কথা মেনে নেয়া হবে এবং তার গর্ভজাত সন্তানদের সাথে ঐ ছেলে/মেয়ের বিবাহ হারাম হবে না। যদি কোন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে দুধ-সম্পর্কের সন্দেহ হয় অথচ প্রমাণ করা সম্ভব না হয় তবে তাদের বিবাহ জায়েয হবে।

ফকীহগণের মতে, নারীর ব্যাপারে হুরমতই আসল, কিন্তু হালাল হবার জন্য প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে তারা একজন সাক্ষীকেই যথেষ্ট মনে করেন।

أَنَّ الْبُضْعَ ، وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ فِيهِ الْحَظْرَ يُقْبَلُ فِي حِلِّهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ

"আসল হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু এক ব্যক্তির খবর দেয়ায় হালাল হওয়া প্রমাণিত হবে।"[৯৮]

সামগ্রিক নীতি : ২০

الْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ

"সন্দেহের কারণে হুদূদ[৯৯] মুছে যায়।"

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেছেন :

ادْرَءُوا الْحُدُودَ ، وَالْقَتْلَ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"আল্লাহ্‌র বান্দাদের ওপর থেকে যতদূর সম্ভব হুদূদ ও হত্যা মুছে (হটিয়ে) দাও।"[১০০]

একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বলেন :

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

"যতদূর সম্ভব মুসলিমদেরকে হুদূদ থেকে রক্ষা করো। যদি কোনো মুসলিমের জন্য বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাও তাহলে তার পথ ছেড়ে দাও। বিচারকের পক্ষে ভুল করে খালাস দেয়া ভুল করে শাস্তি দেয়ার চাইতে উত্তম।"[১০১]

উপর্যুক্ত উপধারাটি উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে প্রণীত। চুরি, ব্যভিচারের অপরাধ ইত্যাদির কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত শাস্তিগুলো প্রদানের বেলায় রসূলুল্লাহ স. এবং

---

৯৮. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, পৃ. ৪৫

৯৯. حد-এর বহুবচন حدود অর্থাৎ কতিপয় অপরাদের শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি।

১০০. আল-মুজামুল কাবীর, বাব : আল-আইন, হাদীস নং-৯৬৯৫

১০১. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : আল-হুদুদ, বাব : দারউল হুদূদ, হাদীস নং-১৪২৪

www.pathagar.com

তাঁর সাহাবীগণ রা. যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি Benefit of doubt অর্থাৎ সন্দেহ তথা অকাট্য প্রমাণের অভাবের সুবিধা পাবে।

সন্দেহের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ

الشُّبْهَةُ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ ، وَلَيْسَ بِثَابِت

"সন্দেহ হচ্ছে, যা বাস্তব বা প্রতিষ্ঠিত নয় তাকে বাস্তব বলে ধারণা করা বা প্রতিষ্ঠিত বলে মনে উদয় হওয়া।"[১০২]

এইরূপ সন্দেহের বশে কোনো পাপকাজ করে ফেললে তার শাস্তি হতে পারে কিন্তু শরীয়তে নির্ধারিত হুদূদযোগ্য অপরাধ না হলে সে হদ্দ জারী হবে না।

উদাহরণ : এক ব্যক্তি কোনো মেয়েকে বিবাহ করলো কিন্তু বিবাহ শরীয়ত সম্মত হলো না। যেমন ধরা যাক, সাক্ষী ছিল না বা মেয়েটি তার জন্য হালাল ছিল না। এসব অবস্থায় যদি সে মেয়েটির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এই বিশ্বাসে যে, বিবাহ ঠিকই হয়েছে এবং মেয়েটি তার জন্য হালাল হয়ে গেছে, তাহলে তাকে ব্যভিচারের জন্য নির্ধারিত শাস্তি দেয়া হবে না। তার অজ্ঞতা বা অসাবধানতার জন্য ভিন্নতর শাস্তি হতে পারে। কিন্তু যদি হারাম মনে করা সত্ত্বেও এমনটি করে তাহলে হদ্দ জারী করতে হবে।

সামগ্রিক নীতি : ২১

الْقِصَاصُ كَالْحُدُودِ فِي الدَّفْعِ بِالشُّبْهَةِ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِمَا تَثْبُتُ بِهِ الْحُدُودُ

"কিসাস[১০৩] হদ্দ-এর মতো সন্দেহের দরুণ রহিত হয়ে যায়। হদ্দ প্রমাণের মত প্রমাণ না হলে কিসাস প্রমাণ হয় না।"[১০৪]

উদাহরণ :

১. ঘুমন্ত অবস্থায় কাউকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি বলে, মৃত অবস্থায় সে লোকটিকে যবাই করেছে, এ অবস্থায় কিসাস হবে না বরং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে 'দীয়াত' দিতে হবে। যদি হত্যার অকাট্য প্রমাণ না থাকে।

২. কিসাসের হুকুম শোনার পর হত্যাকারী যদি পাগল হয়ে যায় তা হলে সন্দেহ উপস্থিত হবে, সে হত্যার সময় সুস্থবুদ্ধি ছিল কিনা, সুতরাং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না বরং তার সম্পদ থেকে শোণিতপণ আদায় করা যাবে।

---

১০২. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর

১০৩. قصاص = হত্যা বা আঘাতের সমতুল্য শাস্তি।

১০৪. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর

www.pathagar.com

৩. এক ব্যক্তি অন্যজনকে বলে, তুমি আমাকে হত্যা করো। এতে সে তাকে হত্যা করে। এ অবস্থায়ও কিসাস অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড ওয়াজিব হবে না; কিন্তু হত্যাকারী অপরাধী গণ্য হবে।

ফকীহ্‌গণ কয়েকটি বিষয়ে কিসাসকে হদ্দ-এর সমপর্যায়ে গণ্য করেন না। উদাহরণ :

১. হদ্দ (حد) মাফ করা যেতে পারে না। বরং প্রমাণ পাওয়ার পর হদ্দ জারী করা জরুরী। কিন্তু কিসাসের ক্ষেত্রে যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা নিজেরাই মাফ করে দেয় তাহলে তা মাফ হয়ে যাবে।

২. সরকার অর্থাৎ বিচারক ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে কিসাসের ফায়সালা করতে পারেন কিন্তু হদ্দ-এর ফায়সালা এভাবে করা জায়েয নয়।

৩. হদ্দের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের দাবীর কোনো আলাদা মর্যাদা নেই অর্থাৎ তারা দাবীদার হলো বলেই হদ্দ জারী হবে না যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষী না পাওয়া যায়। কিন্তু কিসাসের দাবীদার হয় উত্তরাধিকারীরাই। কারণ এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি হাযির থাকে না।

৪. হত্যার ব্যাপারটি অনেক দিন পুরোনো হলেও তাতে কিসাসের দাবী রহিত হয় না। কিন্তু হদ্দের ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরানো হয়ে গেলে দাবী খতম হয়ে যায়। তবে হদ্দ কাযাফ (قذف / ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার শাস্তি)-র দাবী দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও সচল থাকে।

৫. বোবারা ইশারায় ব্যক্ত করলে বা লিখে দিলে কিসাস প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু 'হদ্দ' এভাবে প্রমাণিত হয় না।

৬. হদ্দের ব্যাপারে কোনো প্রকার সুপারিশ কবুল করা যায় না। কিন্তু কিসাসের ক্ষেত্রে ওয়ারিসদের সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, তারা মাফ করে দিলে কিসাস মাফ হয়ে যাবে।

৭. হদ্দের (অপবাদের শাস্তি ছাড়া অন্য শাস্তির) ব্যাপারটি প্রতিপক্ষের দাবীর ওপর নির্ভরশীল নয়, প্রমাণিত হলেই হলো; অন্যদিকে কিসাস দাবীর ওপর নির্ভরশীল।

সামগ্রিক নীতি : ২২

التَّعْزِيرُ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ ... يَثْبُتُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَالُ ... وَالْكَفَّارَاتُ تَثْبُتُ مَعَهَا أَيْضًا

"সন্দেহ থাকলেও তা'যীর (تعزير)[১০৫] প্রতিষ্ঠিত হয়।... যেরূপ প্রমাণে সম্পদের দাবী প্রমাণিত হয় (যেমন দুইজন সাক্ষী) তাতে তা'যীরও প্রমাণিত হয়। ...কাফ্‌ফারা (যেমন কসমের কাফ্‌ফারা) সন্দেহ সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়।"

---

১০৫. تعزير অর্থ শাস্তি দেয়া। তবে এ শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ কুরআন ও হাদীসে নির্ধারিত নয় যেমন হুদূদ নির্ধারিত হয়েছে। এ শাস্তি হুদূদ-এর চাইতে লঘুতর। এই শাস্তি সমাজ

www.pathagar.com

তবে রমযানের সওমের কাফ্‌ফারা আবার এই নীতির বাইরে। কেননা তা সন্দেহের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যায়, যেমন বিস্মৃতি ও ভুল ত্রুটির ফলে কাফ্‌ফারা বাতিল হয়ে যায়।

সামগ্রিক নীতি : ২৩

إذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ،وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الآخَرِ غَالِبًا

"একই শ্রেণীর দু'টি বিষয় যখন একত্র হয়ে যাবে এবং উভয়ের উদ্দেশ্যও হবে এক তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করার (বিলীন হওয়ার) হুকুম দেয়া হবে।"

উদাহরণ :

১. গোসল ওয়াজিব হয়েছে দু'টি কারণে। এ অবস্থায় প্রত্যেক কারণের প্রেক্ষিতে ভিন্ন গোসল করতে হবে না, একবার করাই যথেষ্ট হবে।

২. মসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তি দু' রাকআত নামায পড়লো-তা সুন্নত হোক বা ফরয; যাই হোক তাতে দু'টো উদ্দেশ্য পূর্ণ হল; এক. মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (تحية المسجد), দুই. শরীয়তের সংশ্লিষ্ট হুকুমটি পালন। সুতরাং আলাদাভাবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর নিয়তে কোনো নামায পড়ার আবশ্যকতা নেই।

৩. নামাযের মধ্যে একাধিকবার এমন ভুল হয়ে গেছে যাতে সিজদা সাহু (سجدة السهو) ওয়াজিব হয়ে যায়। এ অবস্থায় একাধিক ভুলের জন্য নামাযের শেষে একবার মাত্র সিজদা সাহু করা যথেষ্ট হবে।

৪. একই হারাম কাজ যেমন ব্যভিচার বা মদ্যপান কয়েকবার করা হয়েছে। এজন্য একবার হদ্দ জারী করলে যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি হদ্দ জারী করার পর পুনরা সেই একই অপরাধ করা হয়ে থাকে তাহলে পুনরা হদ্দ জারী হবে। অথবা যদি বিভিন্ন ধরনের অপরাধ করা হয়ে থাকে এবং তাদের শাস্তিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় তবে প্রত্যেক অপরাধের পৃথক পৃথক হদ্দ জারী করা হবে। যদি কেউ কোনো অবিবাহিত মহিলার সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তারপর তাকে হত্যা করে, এ অবস্থায় ব্যভিচারের জন্য বেত্রদণ্ড জারী হবে এবং হত্যার জন্য (যদি প্রমাণে সন্দেহ থাকে) শোণিতপণ আদায় করা হবে।

ও রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জনগণের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধি (Penal code)-এর আওতায় বা বিচারকের এখতিয়ার অনুযায়ী হতে পারে।

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ২৪

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

"খারাজ অর্থাৎ লাভ জামানতের প্রতিবদল।"[১০৬]

এটা রসূলুল্লাহ স.-এর একটি হাদীস এবং বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে খারাজ-এর সংজ্ঞা জানতে হবে। খারাজ হলো,

كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خَرَاجُهُ ؛ فَخَرَاجُ الشَّجَرَةِ ثَمَرُهُ ، وَخَرَاجُ الْحَيَوَانِ دَرُّهُ وَنَسْلُهُ

> "কোনো জিনিস থেকে যা বেরিয়ে আসে সেটিই তার খারাজ (উৎপাদিত লভ্য)। কাজেই গাছের খারাজ হচ্ছে তার ফল এবং পশুর খারাজ হচ্ছে তার দুধ ও শাবক।"[১০৭]

তাই হাদীসের অর্থ হচ্ছে, লাভের মালিক হবে সেই যে বস্তুর যামীন[১০৮] বা মালিক হবে। যেমন, একটি পশুর ক্রেতা তার মালিকানার সময়ে যে দুধ বা লোম লভ্য রূপে পেয়েছে সে তার প্রকৃত মালিক। কোন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লে যদি পশুটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে হয় তা হলে প্রাপ্ত দুধ বা লোম ফেরৎ দিতে বা তার মূল্য আদায় করতে হবে না।

সামগ্রিক নীতি : ২৫

مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ

"যা নেয়া হারাম তা দেয়াও হারাম"

যেমন : সুদ, গণকের পারিশ্রমিক, ঘুষ ইত্যাদি। তবে কয়েকটি অবস্থায় এর ব্যতিক্রমও জায়েয :

১. যদি অনাহার চলতে থাকে এবং সুদে ঋণ নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই না থাকে তাহলে প্রয়োজনমাফিক সুদী ঋণ নেয়া যেতে পারে।
২. যদি প্রাণ ও সম্পদ নষ্ট হবার জোর আশঙ্কা থাকে, তাহলে ঘুষ দিয়ে প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করা জায়েয।
৩. বিনা দোষে যদি কারা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তাহলে ঘুষ দিয়ে মুক্তি লাভ করা জায়েয।
৪. সম্পদের ব্যবস্থাপক বা অভিভাবক (অছি/وصى) তার কাছ থেকে সম্পদকে জবরদস্তি ছিনিয়ে নেয়া ও অন্যায়ভাবে হস্তগত করার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ঘুষ দিতে পারে।

---

১০৬. সুনানুত তিরমিযী, কিতাব : আল-বুয়ূ, বাব : ফীমান ইরাশতারিল আবদা ..., হাদীস নং-১২৮৫

১০৭. আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, পৃ. ১১০

১০৮. ضامن = দায়িত্ব বহনকারী।

www.pathagar.com

যে কাজ করা হারাম অন্যের কাছে তার দাবী করাও হারাম

مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ

"যে কাজটি করা হারাম, অন্যের কাছে তা করার দাবী করাও হারাম।"

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো জায়েয :

১. কোনো ব্যক্তির কাছে ঋণ বা এ জাতীয় কিছুর দাবী রয়েছে। কিন্তু অন্যপক্ষ তা অস্বীকার করছে। এ অবস্থায় তাকে শপথ করানো জায়েয।

২. অমুসলিমের কাছে জিযিয়ার (ধন-প্রাণ হেফাজতের বিনিময়) দাবী করা জায়েয। অথচ মুসলিম হিসেবে নিজে আদায় করে না।

সামগ্রিক নীতি : ২৬

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ

"যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বে কোনো জিনিস অর্জন করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে তাকে বঞ্চনার শাস্তি দেয়া হবে।"

হত্যাকারী একারণেই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

সামগ্রিক নীতি : ২৭

مَنْ أَخَّرَ الشَّيْءَ بَعْدَ أَوَانِهِ ، فَلْيَتَأَمَّلْ فِي الْحُكْمِ

"যে ব্যক্তি সময়ের পরে কোনো জিনিসকে পিছিয়ে দিয়েছে তার হুকুমের (ফায়সালা) ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত।"

যেমন : কোনো ব্যক্তি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হবার পর নিজের স্ত্রীকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার জন্য তিন তালাক দিয়ে দেয়, এর ফলে স্ত্রী পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না। বরং আইনত তার যা পাওনা হয় সে তার হকদার হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, যদি মহর (مهر) অনাদায়ী থাকে তবে অন্য ঋণের মতো মহরের ঋণও পরিশোধ করতে হবে। ঋণ আদায়ের পরই উত্তরাধিকার বণ্টন হবে।

সামগ্রিক নীতি : ২৮

لا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ

"যে অনুমানের ভুল হওয়া সুস্পষ্ট তার বিবেচনা হবে না।"

১. যে ব্যক্তির ইশা'র নামায ফাউত (فوت) হয়ে গিয়েছিল সে ফজরের নামায আদায় করলো এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, সময়ের মধ্যে উভয় নামাযের অবকাশ নেই। কিন্তু পরে দেখা গেলো, সময়ের মধ্যে অবকাশ ছিল। এ অবস্থায় ফজরের নামায বাতিল হয়ে যাবে। এ হুকুমটি এমন ব্যক্তির জন্য যে তরতীবের অধিকারী (صاحب ترتيب)

www.pathagar.com

অর্থাৎ যার ওপর নামায ফরয হবার পর থেকে কোনোদিন পরপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায কাযা হয়নি। আর যদি কখনো কাযা হয়েও থাকে তাহলে তা সে পরবর্তীতে ঠিকমতো পড়েও নিয়েছে।

২. যে ব্যক্তি পানিকে অপবিত্র মনে করে তা দিয়ে অযু করেছে, পরে জানতে পেরেছে যে পবিত্র ছিল। এ অবস্থায় তার অযু জায়েয হবে।

৩. কোনো ব্যক্তিকে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যাকাত দেয়া হয়েছে যে সে হকদার নয়। পরে জানা গেছে, সে হকদার ছিল। এ অবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে গেছে।

এ নীতির ব্যতিক্রমও আছে। যেমন :

১. কোনো ব্যক্তিকে যাকাতের হকদার মনে করেই যাকাত দেয়া হয়েছে। তারপর জানা গেছে সে বিত্তবান ছিল অথবা তার পুত্র বিত্তবান ছিল। এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে যাকাত আদায় হবে না। অন্যদিকে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে আদায় হয়ে যাবে।

২. কাপড় অপবিত্র মনে করেই তাতে নামায পড়ে নিয়েছে কিন্তু পড়ে জানা গেছে, কাপড় পবিত্র ছিল। এ অবস্থায় পুনর্বার নামায পড়ে নিতে হবে।

৩. অযু ছাড়াই নামায পড়া হয়েছিল। পরে মনে হয়েছে তার অযু ছিল। এ অবস্থায় আবার নামায পড়তে হবে।

৪. সময় হবার আগেই নামায পড়া হয়েছিল। তারপর জানা গেলো, আসলে তখন সময় হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় পুনর্বার নামায পড়তে হবে ইত্যাদি।

ফকীহগণ বিধান উদ্ভাবন করার সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শুধুমাত্র একটি দিক দেখার পক্ষপাতি নন বরং তাঁদের মতে তার সমস্ত দিক চোখের সামনে থাকা উচিত। অনেক সময় একদিক দিয়ে একটি হুকুম প্রমাণিত হয় আবার অন্যান্য দিক তার বিরোধী হুকুম দাবী করে। এ অবস্থায় প্রমাণের প্রাবল্য বিচারে হুকুম দিতে হবে।

সামগ্রিক নীতি : ২৯

ذِكْرُ بَعْضِ مَا لا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ

"যে জিনিসের কোনো খণ্ড হতে পারে না তার কোনো অংশের উল্লেখ করলে সমগ্রের উল্লেখের সমান হবে।"

www.pathagar.com

যেমন- "অর্ধেক তালাক" বা "স্ত্রীর অর্ধেককে তালাক"-এর কথা বললে পূর্ণ এক তালাক হবে। কারণ তালাক খণ্ডিত হতে পারে না এবং স্ত্রীও খণ্ডিত হয় না।

সামগ্রিক নীতি : ৩০

إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ أُضِيفَ الْحُكْمُ إِلَى الْمُبَاشِرِ

"যখন কোনো কাজের কারক (مباشر) এবং কাজটির কারণ (مسبب) অর্থাৎ উৎসাহ-প্রেরণা-ইঙ্গিত-আদেশ ইত্যাদি একসাথে থাকে তখন কাজটি সম্পর্কিত হবে কারকের সাথে, কারণের সাথে নয়।"

১. এক ব্যক্তি লোক চলাচলের পথে কুয়া খনন (سبب) করলো। দ্বিতীয় ব্যক্তি একজনকে কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। এ অবস্থায় নিক্ষেপকারী (مباشر) প্রাণনাশের খেসারত দেবে।

২. এক ব্যক্তি চোরকে পথ দেখালো এবং চোর চুরি করলো। এক্ষেত্রে চোর চুরির অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হবে, তবে যদি চোরকে এমন সম্পদের ব্যাপারে পথ দেখায় যা পথ প্রদর্শকের কাছে আমানত ছিল এবং চোর সে সম্পদ চুরি করলো, তাহলে এক্ষেত্রে পথ প্রদশর্নকারীও দণ্ডপ্রাপ্ত হবে। কেননা সে আমানতের হেফাজতে ত্রুটি দেখিয়েছে।

সামগ্রিক নীতি : ৩১

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"আদত (عادة) বা প্রচলিত রীতি বিধায়ক রূপে স্বীকৃত।"

'ফিক্‌হের উৎস' অধ্যায়ে 'আদত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা হলো। ফকীহগণ দুই প্রকার عادة-এর বর্ণনা দিয়েছেন :

১. عادة كلية বা ব্যাপক (কায়েমী) 'আদত;
২. عادة غير كلية বা অ-ব্যাপক (অ-কায়েমী) 'আদত।

১. عادة كلية-এর বিবরণ নিম্নরূপ :

العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال كالأكل والشرب والفرح والحزن والنوم واليقظة والميل إلى الملائم والنفور عن المنافر وتناول الطيبات والمستلذات واجتناب المولمات والخبائث وما أشبه ذلك

"এমন ধরনের সাধারণ রীতি যা কোনো যুগে, কোনো স্থানে, কোনো অবস্থায় বদলে যায় না। যেমন খাওয়া, পান করা, আনন্দ, দুঃখ, নিদ্রা, জাগরণ, অনুকূলের প্রতি আকর্ষণ, প্রতিকূলে বিকর্ষণ, পবিত্র ও স্বাদযুক্ত বস্তু গ্রহণ, কষ্টদায়ক ও নাপাক জিনিস বর্জন এবং অনুরূপ সব জিনিস عادة كلية-এর অন্তর্ভুক্ত।"[১০৯]

---

১০৯. আল-মুওয়াফাকাত, পৃ. ২৯৭

www.pathagar.com

وضعت عليها الدنيا وبها قامت مصالحها فى الخلق

"সুতরাং عادة كلية-এর ওপর দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সমূহের কল্যাণ এরি মধ্যে নিহিত।"[১১০]

এই প্রকার আদতে কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই এবং এর অবকাশও নেই।

২. عادة غير كلية-এর বর্ণনা হচ্ছে :

العوائد التى تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال كهيآت اللباس والمسكن واللين فى الشدة والشدة فيه والبطء والسرعة فى الأمور والأناة والاستعجال وما كان نحو ذلك

"যেসব আদত কাল, স্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন পোশাকের ধরন, বাসগৃহের গঠন, কঠিনতার মধ্যে কোমলতা, কোমলতার মধ্যে কঠিনতা, কাজে বিলম্ব বা দ্রুতগতি এবং অনুরূপ সব রীতি-এ সবইعادة غير كلية -এর শামিল।"[১১১]

এ বিষয়গুলোর ওপর বস্তুগত ও নৈতিক পরিবেশ, আবহাওয়া, মওসুম ইত্যাদির যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। তাই প্রতি যুগে, প্রতি দেশে ও প্রত্যেক অবস্থায় এর মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না এবং পাওয়া যেতেও পারে না। এহেন অবস্থায় যদি এসব ব্যাপারে একই কর্মপদ্ধতির অনুসৃতিকে অপরিহার্য গণ্য করা হয় তাহলে সংকট ও সংকীর্ণতা (حرج - ضيق) দেখা দেবে। তাই ফকীহগণ অবস্থা, স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তারা এক জায়গার হুকুম অন্য জায়গার লোকদের ওপর চাপিয়ে দেন না এবং এক যুগের হুকুমকে চিরকালের জন্যে ওয়াজিবও গণ্য করেন না।

فإذا كان كذلك لم يصح أن يحكم بالثانية على من مضى لاحتمال التبدل والتخلف بخلاف الأولى

"যেখানে এই ধরনের অবস্থা সেখানে দ্বিতীয় ধরনের অভ্যাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের হুকুম দেয়া যেতে পারে না যেমন পূর্বের লোকদের হুকুম দেয়া হয়েছিল। কেননা হতে পারে অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এসে গেছে এবং তার বিরোধী হুকুমের প্রয়োজন। বিপরীত পক্ষে প্রথম ধরনের অভ্যাসের মধ্যে এই ধরনের পরিবর্তনের প্রশ্নই দেখা দেয় না।"[১১২]

কয়েক প্রকারের পরিবর্তনশীল অভ্যাস

ফকীহগণ কয়েক প্রকারের পরিবর্তনশীল অভ্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন :

---

১১০. প্রাগুক্ত

১১১. প্রাগুক্ত

১১২. আল-মুওয়াফাকাত, পৃ. ২৯৮

www.pathagar.com

১. অভ্যাসের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো কথাকে ভালো মনে করা হয় আবার কোথাও অন্য কোনো কথাকে ভালো মনে করা হয়। যেমন, পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে খোলা মাথায় থাকাকে গাম্ভীর্য ও সততা বিরোধী মনে করা হয়ে থাকে। আবার পশ্চিম দেশসমূহে তা মনে করা হয় না।

فالحكم الشرعي يختلف لإختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق قادحا فى العدالة وعند أهل المغرب غير قادح

"এহেন অবস্থায় বিরোধের কারণে শরয়ী হুকুম বিভিন্ন ধরনের হবে। প্রাচ্য দেশসমূহে খোলা মাথায় থাকা সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সভ্যতা বিরোধী হবে এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে তা হবে না।"[১১৩]

যখন কোনো যুগে পূর্ব ও পশ্চিমের এই পার্থক্য শেষ হয়ে যাবে অথবা পূর্বদেশে অভ্যাস বদলে যাবে এবং পশ্চিমদেশ তার বিপরীতে অবস্থান করবে তখন সেই অনুপাতে হুকুমও বদলে যেতে থাকবে। মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়াবলীর ভিত্তি এই পরিবর্তনের ওপরই স্থাপিত হবে। কাজেই ইউরোপীয়দের জন্য খোলা মাথায় নামায পড়া এবং খোলা মাথায় ঘোরাফেরা করায় কোনো দোষ নেই। আর এশিয়াবাসীদের জন্য (যতদিন অভ্যাস বদলে না যায়) তা দোষণীয়। তবে এ ধরনের জিনিস যদি এশিয়ারও অভ্যাসের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাদের জন্যও আর এটা দোষণীয় হবে না।

২. উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে লোকদের অভ্যাস বিভিন্ন হয়ে থাকে। এক দেশের লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্যে একভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে এবং অন্য দেশের লোকেরা অন্যভাবে। এ অবস্থায় যেখানে যে ধরনের অভ্যাস গড়ে ওঠেছে সেখানে সেই অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে। যেমন তালাকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট শব্দের মধ্যে পার্থক্য থাকে। কোথাও একটি শব্দ সুস্পষ্ট তালাকের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে আবার কোথাও ঐ একই শব্দ প্রচ্ছন্ন তালাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক জায়গার ব্যবহার রীতিকে যদি অন্য জায়গার লোকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সংকট ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে লেনদেনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও স্থানের পার্থক্যের প্রেক্ষিতে পার্থক্য দেখা দেয়। কসমের ক্ষেত্রেও এই ফারাক প্রকাশিত হয়। যদি তাদের সমাধানের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও রীতি-পদ্ধতির দিকে নজর

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

www.pathagar.com

না দেয়া হয় তাহলে তাতে ইলাহী হিকমত তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধাচরণ অনিবার্য হয়ে ওঠবে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়বে।

৩. বিভিন্ন পেশাদারদের নিজের নিজের পেশার ব্যাপারে বিভিন্ন পরিভাষা হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক পেশাদারের অভ্যাস ও রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী তার ফায়সালা করতে হবে।

৪. লেনদেনের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গার লোকদের কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন হয়। যেমন, বিবাহের ক্ষেত্রে কোথাও 'মাহরে মু'আজ্জাল' (নগদ মোহরানা) এর প্রচলন রয়েছে আবার কোথাও আছে "গায়রে মু'আজ্জাল" (বিলম্বে আদায়)-এর প্রচলন। অথবা কেনাবেচার ব্যাপারে কোথাও নগদ লেনদেনের রেওয়াজ থাকে আবার কোথাও এর সময়কাল নির্ধারিত থাকে এবং তার মধ্যে কমবেশী করার অবকাশ থাকে না। এই ধরনের যাবতীয় অবস্থায় রেওয়াজ ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে।

৫. মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও বিকাশ সাধনে বিভিন্ন জিনিসের প্রভাব পড়ে। আবহাওয়া, উত্তাপ, শীতলতা, খাদ্য, গৃহ ও গৃহের বাইরের পরিবেশ ইত্যাদি সব কিছুই তার শারীরিক প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণে স্থান ও অবস্থার প্রেক্ষিতে বালেগ হওয়া সময়কালের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। শরীয়ত এর যেসব আলামত নির্ধারণ করেছে সেগুলো প্রকাশ হওয়ার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুব একটা কঠিন মনে হয় না। তবে আলামতগুলো প্রকাশিত হবার অবস্থায় বয়স ও সালের প্রেক্ষিতে সময়কাল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সমস্ত জিনিসের প্রতি নজর রাখা অপরিহার্য হবে। অবস্থা ও স্থানের মধ্যে পার্থক্যের প্রেক্ষিতে বালেগ হওয়ার সময় নির্ধারণের মধ্যেও অনিবার্যভাবে পার্থক্য দেখা দেবে। বালেগ ও নাবালেগ হওয়ার সাথে জড়িত সমস্ত মাসায়েল এই পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠবে।

৬. রোগ ও আঘাতজনিত কারণে কোনো ব্যক্তির কোনো অভ্যাস সাধারণ অভ্যাসের বিরোধী হয়ে গেলে তার কথা বিবেচনা করাও জরুরী হবে। যেমন, যদি কারোর মলমূত্র দ্বার বন্ধ হয়ে যায় এবং পেশাব বিকল্প ব্যবস্থায় সরবরাহ করে অথবা যদি কারোর পানাহারের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং নলের সাহায্যে খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি ভেতরে পৌছানো হয়।

সারকথা হচ্ছে এই যে, ফকীহগণ নির্ধারিত নিয়ম-কানুন অনুযায়ী অভ্যাসকে অত্যন্ত উঁচু স্থানে বসিয়েছেন। আর এ কারণে তারা স্থান ও

www.pathagar.com

অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছেন। কারণ শরীয়ত অভ্যাসজনিত বিষয়সমূহের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে এবং এইসব বিষয়ের ওপর প্রবর্তিতও হয়।[১১৪]

সামগ্রিক নীতি : ৩২

الاجْتِهَادُ لا يُنْقَضُ بِالاجْتِهَادِ

"এক ইজতিহাদ অন্য ইজতিহাদের দ্বারা ভেঙে পড়ে না অর্থাৎ বাতিল হয়ে যায় না।"

যেমন, এক মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো হুকুম দিলেন, অন্য একজন মুজতাহিদও ইজতিহাদের ভিত্তিতে ভিন্ন বা প্রতিকূল হুকুম দিলেন। এই দ্বিতীয় হুকুমের ফলে প্রথম হুকুমটি বাতিল হয়ে যাবে না। বরং স্ব স্ব স্থানে উভয় হুকুম বহাল থাকতে পারে যদি অবস্থা ও মাস্‌লাহাত ভিন্ন ভিন্ন হয়। উমর রা. কোনো কোনো বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে আবু বকর রা.-এর হুকুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা দেন। কিন্তু তাঁর হুকুমকে বাতিল গণ্য করেননি।

এক অনন্যোপায় ব্যক্তি নিজের চিন্তা-ভাবনা (تحری) অনুযায়ী কিবলা মনে করে একদিকে মুখ করে এক রাকআত নামায পড়লো। তারপর তার সিদ্ধান্ত বদলে গেলো এবং দ্বিতীয় রাকআতটি সে অন্যদিক মুখ করে পড়লো। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত দু'টিও এভাবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দরুণ ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ করে পড়লো। এভাবে সে চার রাকআত চারদিকে মুখ করেও যদি পড়ে তার নামায ঠিক হবে। কারণ তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত বা ইজতিহাদ পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদকে বাতিল করে দেবে না।

কথাকে অর্থহীন গণ্য করার চাইতে কার্যকর করাই উত্তম

إعْمَالُ الْكَلام أوْلَى مِنْ إهْمَالِه

"কথাকে কার্যকর করা তাকে অর্থহীন গণ্য করার চাইতে অনেক বেশী ভালো।"

কিন্তু একথা সুস্পষ্ট, উক্ত কথা যখন প্রভাবশালী ও কার্যোপযোগী হবার ক্ষমতাসম্পন্ন হবে একমাত্র তখনই এটা হতে পারবে। অন্যথায় তাকে নিরর্থক ও উদ্ভট গণ্য করা হবে।

সামগ্রিক নীতি : ৩৩

التَّابِعُ تَابِعٌ

"অনুগামী অনুগামীই থাকবে অর্থাৎ সে স্বতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করবে না।"

---

১১৪. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ২৮৫

www.pathagar.com

১. পশুর গর্ভস্থিত বাচ্চা পশুর কেনাবেচার মধ্যে শামিল হবে। পৃথকভাবে তার কেনাবেচা বা দান করা জায়েয নয়।

২. পথের সবকিছু জমির কেনাবেচার অন্তর্ভুক্ত হবে। সেগুলোকে বিক্রিত জমি থেকে পৃথক করে আলাদাভাবে লেনদেন করা ঠিক হবে না।

নিম্নোক্ত ধরনের বিষয়গুলো এই নীতির ব্যতিক্রম :

যেমন, গর্ভস্থিত সন্তানের জন্য অসীয়্যাত (وصية) ও অঙ্গীকার করা সঠিক হবে যদিও সন্তান স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করেনি।

সামগ্রিক নীতি : ৩৪

التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ

"যার অনুগমন করা হয় (কর্তা) তা বাতিল হয়ে গেলে অনুগামী (অধীন) ও বাতিল হয়ে যাবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৩৫

পাগলামীর কারণে যখন ফরয নামায মাফ হয়ে গেছে তখন সুন্নাতও মাফ হয়ে যাবে। এর নিকটবর্তী প্রবচন হচ্ছে :

يَسْقُطُ الْفَرْعُ إِذَا سَقَطَ الأَصْلُ

"কাণ্ড (আসল) পড়ে (নাকচ হয়ে) গেলে শাখাও পড়ে (নাকচ হয়ে) যায়।"

এ নীতির ভিত্তিতেই ফকীহগণ বলেন :

إِذَا بَرِئَ الأَصِيلُ بَرِئَ الْكَفِيلُ

"যখন মূল ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় তখন তার (নিয়োজিত) জামিনও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।"

কিন্তু কখনো এর বিপরীতও হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি বললো খালিদের কাছে যায়েদ হাজার টাকা পায় এবং আমি খালিদের জামিন। কিন্তু খালিদ অস্বীকার করলো। সে বললো, যায়েদ-এর কোনো পাওনা আমার ওপর নেই। এখন যদি যায়েদ টাকা দাবী করে যদিও তার কোনো সাক্ষী নেই, তবে যে ব্যক্তি জামিনদার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে এই ঋণ পরিশোধ করা তার ওপর বর্তায়। এক্ষেত্রে কথিত ঋণ গ্রহণকারী রূপে খালিদ হচ্ছে 'আসীল'(اصيل) আর তৃতীয় এক ব্যক্তি হচ্ছে স্বঘোষিত 'কাফীল' (كفيل)। খালিদ অস্বীকার করে গেলো; কাফীল ফেঁসে গেলো।

সামগ্রিক নীতি : ৩৬

الْحُرُّ لا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

"স্বাধীন ব্যক্তি কারোর অধীন (দাস) হবে না।"

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৩৭

لا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ

"যে ব্যক্তি নীরব থাকে তার প্রতি কোনো কথার আরোপ করা যাবে না।"

১. কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নিজের সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে দেখে নীরব থাকলে এ নীরবতাকে অনুমতি বলে ধরে নেয়া যাবে না এবং এ কথা ধরে নেয়া যাবে না যে, এই ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছে, যে কারণে সে তার হস্তক্ষেপ দেখে নীরব রয়েছে।

২. শাসক বা বিচারক কোনো ছোট বালক বা তার সম্পদে হস্তক্ষেপের (বেচাকেনা ইত্যাদি করা) অনুমতি নেই এমন কোনো ব্যক্তিকে বেচাকেনা করতে দেখে এবং নিশ্চুপ থাকে, এ অবস্থায় এ নিশ্চুপ থাকাকে শাসকের পক্ষ থেকে অনুমতি বলে মনে করা হবে না।

তিনটি বিষয়ে নফল ফরয থেকে শ্রেয়

اَلْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ

"ফরয নফল থেকে শ্রেয়।"

কিন্তু নিচের কতিপয় বিষয় এর ব্যতিক্রম :

১. কপর্দকহীন ঋণগ্রস্তকে সময় দেবার পরিবর্তে যা ওয়াজিব, তাকে ঋণমুক্ত করাই শ্রেয়।

২. সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু সালামের সূচনা করা অর্থাৎ সালাম দেয়া তার জওয়াব দেয়ার চাইতে শ্রেয়।

৩. নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর অযু করা ফরয। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগে অযু করা ওয়াক্ত হওয়ার পর অযু করার চাইতে উত্তম।

আরো কতিপয় উসূল (মূলনীতি) ও কুল্লীয়াত (সামগ্রিক নীতি)

সামগ্রিক নীতি : ৩৮

اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ

"যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করার অনুমতি আছে"

অর্থাৎ যুদ্ধের মধ্যে দুশমনের সাথে মোকাবিলার সময় কূটকৌশল অবলম্বন করার অনুমতি আছে।

সামগ্রিক নীতি : ৩৯

الاجتهاد لا يعارض النص

"ইজতিহাদ সুস্পষ্ট নসের (কুরআন ও হাদীসের বিধান) বিরোধী হয় না।"

www.pathagar.com

যে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নস রয়ে গেছে সে ব্যাপারে ইজতিহাদের অনুমতি নেই। অনুরূপভাবে যে ইজতিহাদের ফায়সালা সুস্পষ্ট নসের বিরোধী তাও জায়েয নয়।

সামগ্রিক নীতি : ৪০

لا ينبغي الحكم على الموهوم خصوصا فيما يجب فيه الأخذ بالاحتياط

"কাল্পনিক কথার ভিত্তিতে হুকুম দেয়া সঙ্গত নয়, বিশেষ করে যেখানে সতর্কতার ভিত্তিতে কাজ করা জরুরী হয়।"

সামগ্রিক নীতি : ৪১

حرمة الملك باعتبار حرمة المالك

"মালিকের মর্যাদার প্রেক্ষিতে মালিকানার মর্যাদা বিবেচিত হবে।"

এই নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে কারোর নামে বা চরে বেড়াবার জন্য যে পশুকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হবে তা যদি অন্য কোনো লোক ধরে নিয়ে যায় তাহলে সে তার মালিক হবে না। কারণ পশুর নিজের মধ্যে মালিক হবার যোগ্যতা নেই। আর অন্যদিকে মালিক নিজে উপস্থিত। কাজেই তার মালিকানার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা জরুরী।

নিচে আরো কতিপয় কুল্লীয়াতের উল্লেখ করা হচ্ছে। কিন্তু বেশী দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের আওতাধীনে আংশিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করা হয়নি।

সামগ্রিক নীতি : ৪২

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"উরফ ও রেওয়াজের মাধ্যমে যে কথা প্রমাণিত হয় তা নসের মাধ্যমে প্রমাণিত হবার মতো।"

সামগ্রিক নীতি : ৪৩

ان البناء على الظاهر فيما يعتذر الوقوف على حقيقة جائز

"যে অবস্থায় প্রকৃত সত্যে পৌছানো কঠিন হয় সেখানে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে ফায়সালা করা জায়েয।"

সামগ্রিক নীতি : ৪৪

يجب الأخذ بالاحتياط عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح

"যেখানে বিভিন্ন দিকের সজ্ঘাত দেখা দেয় এবং কোনো এক দিককে প্রাধান্য দেয়া সম্ভব হয় না সেখানে যে দিকটির ওপর আমল করলে সতর্কতা রক্ষিত হবে সে দিকটির ওপর আমল করা ওয়াজিব।"

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৪৫

العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه

"প্রচলিত রীতি ও অভ্যাস অনুযায়ী এমন অবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে যা সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী নয়।"

সামগ্রিক নীতি : ৪৬

البناء على الظاهر واجب ما لم يتبين خلافه

"যতক্ষণ বাহ্যিক অবস্থার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না থাকে ততক্ষণ তার ভিত্তিতে ফায়সালা করা ওয়াজিব।"

সামগ্রিক নীতি : ৪৭

بين الناس شركة عامة فى الكلأ والماء

"ঘাস ও পানির মধ্যে সবার সমান অংশীদারত্ব রয়েছে।"

(অবশ্য যদি সাধারণ্যের চারণভূমি বা জলাধার হয়। শক্তিমানরা যেন অন্যদের অধিকার খর্ব বা হরণ না করে)।

সামগ্রিক নীতি : ৪৮

الانسان من جنس قوم ابيه لا من جنس قوم امه

"মানুষকে তার বাবার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে, মায়ের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে না। (অর্থাৎ বংশধারা বাবার মাধ্যমেই চলবে)।"

সামগ্রিক নীতি : ৪৯

الثَّابتَ بالْبَيِّنَة كَالثَّابت بالْمُعَايَنَة

"প্রমাণের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠিত হয় তা প্রত্যক্ষের মতো।"

সামগ্রিক নীতি : ৫০

التعريف بالاسم كالتعريف بالإشارة

"নামের মাধ্যমে পরিচিতি ইশারার সাহায্যে পরিচিতির মতো।"

সামগ্রিক নীতি : ৫১

خبر الواحد لا ينفك عن الشبهة

"খবরে ওয়াহেদ সন্দেহমুক্ত হয় না।"

সামগ্রিক নীতি : ৫২

خبر الواحد فيما يرجع الى امر الدين حجة

"খবরে ওয়াহেদ দীনী ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত।"

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৫৩

مطلق الكلام بتقيد بدلالة الحال

"মুতলাক তথা সকল প্রকার বাধনমুক্ত বক্তব্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে বাধা মনে করা হবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৫৪

المعلق بالشرط يثبت لوجود الشرط

"যে কথা শর্তের সাথে সম্পৃক্ত তা শর্ত পাওয়া গেলেই প্রমাণিত হবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৫৫

المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط

"শর্তের সাথে সম্পৃক্ত কথা শর্ত পাওয়া যাওয়ার আগে ধর্তব্য হয় না।"

সামগ্রিক নীতি : ৫৬

يسقط اعتبار دلالة الحال اذا جاء التصريح بخلافها

"অবস্থার বিরুদ্ধে যখন সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকে তখন অবস্থার প্রামাণ্যতা গ্রহণ যোগ্য নয়।"

সামগ্রিক নীতি : ৫৭

الاتفاق على الحكم يعتبر لا الاختلاف في السبب

"দুই দল যেখানে হুকুমের ব্যাপারে একমত এবং তার কারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত সেখানে কারণের বিভিন্নতা প্রণিধানযোগ্য নয়।"

যেমন ধরুন, যায়েদ অঙ্গীকার করলো, খালেদের কাছে আমি এক হাজার টাকা ঋণী। অন্যদিকে খালেদ বললো, ঋণ নয় বরং এক হাজার টাকা তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছো। এ অবস্থায় যায়েদের জন্য খালেদকে এক হাজার টাকা পরিশোধ করা অপরিহার্য হবে। উভয়ের কারণের (ঋণ ও ছিনতাই) মধ্যে পার্থক্যের ফলে আসল হুকুমের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।

সামগ্রিক নীতি : ৫৮

لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين

"দু'টি ভিন্ন ভিন্ন হুকুমের ক্ষেত্রে মুতলাককে (শর্তহীন কথা) মুকাইয়েদের (শর্তাধীন কথা) অর্থে গ্রহণ করা হবে না।"

সামগ্রিক নীতি : ৫৯

الشركة الخاصة لا تمنع الملك في الملك المشترك بخلاف الشركة العامة

"বিশেষ অংশগ্রহণ অংশীদারদেরকে সংযুক্ত সম্পদের মালিকে পরিণত করে, সাধারণ অংশগ্রহণে এমনটি হয় না।"

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৬০

সাধারণ অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বায়তুল মাল, গনীমতের মাল ইত্যাদি। যেখানে সবার অধিকার থাকে।

সামগ্রিক নীতি : ৬১

العام كالنص فى اثبات العارض قبل حصول المقصود بالشئ كالمقترن باصل السبب

"সাধারণ শব্দটি যে যে বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকবে, উদ্দেশ্য অর্জিত হবার আগে যখন প্রতিবন্ধক দেখা দেবে তখন আসল শব্দের সাথে প্রতিবন্ধকযুক্ত হলে যেমন হয় তার অবস্থা ঠিক তেমন হবে (অর্থাৎ তার প্রভাব হুকুম ও ফায়সালার মধ্যে প্রকাশ হবে)।"

সামগ্রিক নীতি : ৬২

المختلف فيه بامضاء الامام باجتهاده يصير كالمتفق عليه

"শাসক (কাযী) নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে যে বিতর্কিত বিষয়টির মীমাংসা করে দেন সে মীমাংসা হয় সর্বসম্মত বিষয়ের পর্যায়ভুক্ত।"

সামগ্রিক নীতি : ৬৩

مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال

"মুসলিমদের সম্পদ মুসলিমদের জন্য কোনো অবস্থাতেই গনীমত (غنيمة / যুদ্ধে লব্ধ সামগ্রী) সম্পদ হয় না।"

সামগ্রিক নীতি : ৬৪

لا يجوز مخالفة الاجماع

"ইজমা' অনুষ্ঠিত হবার পর তার বিরোধিতা জায়েয নয়।"

সামগ্রিক নীতি : ৬৫

العادة معتبرة فى تقييد مطلق الكلام

"মুতলাক বাক্যকে মুকাইয়েদ করার ব্যাপারে অভ্যাস ও প্রচলিত রীতি প্রণিধানযোগ্য হবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৬৬

ما عرف قيامه فالاصل بقائه ما لم يعلم الهلاك

"যে জিনিসটির অস্তিত্ব জানা যাবে, যতক্ষণ তার লয়প্রাপ্তি জানা না যাবে, ততক্ষণ তাকে বিদ্যমান মনে করা হবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৬৭

ببعض العلة لا يثبت شئ من الحكم

"কোনো কোনো 'ইল্লাত পাওয়া গেলেই হুকুম প্রমাণিত হবে না।"

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৬৮

ما يفعل عن اجتهاد ونظر يكون محمولا على الصواب مهما امكن

"ইজতিহাদ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির মাধ্যমে যে ফায়সালা করা হবে যতদূর সম্ভব তা সঠিক ধরা হবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৬৯

الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان

"হক (অধিকার) যখন একবার প্রমাণিত হয়ে যায় তখন বিলম্ব করাতে যেমন সে অধিকার বাতিল হয় না, লুকিয়ে রাখলেও হবে না।"

সামগ্রিক নীতি : ৭০

عند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم

"একাধিক অধিকার (দাবী) একত্র হয়ে গেলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটির বিবেচনা দিয়ে শুরু করা হবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৭১

نقل الثقات الأخبار حجة شرعية في وجوب العمل

"আমল ওয়াজিব হবার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের খবর বর্ণনা করা শরয়ী প্রমাণ হিসাবে পরিগণিত।"

সামগ্রিক নীতি : ৭২

لا يجوز ترك الواجب للاستحباب

"মুসতাহাব কাজের জন্য ওয়াজিব বাদ দেয়া জায়েয নয়।"

সামগ্রিক নীতি : ৭৩

المصير إلى البدل عنه فوات الأصل لا مع قيامه

"প্রতিবদলের দিকে ফিরে যাওয়া যাবে এমন এক অবস্থায় যখন আসল নিঃশেষ হয়ে যাবে। আসলের উপস্থিতিতে যাওয়া যাবে না।"

সামগ্রিক নীতি : ৭৪

إنما يتبنى الحكم على المقصود لا على ظاهر اللفظ

"আসল উদ্দেশ্যের ওপর হুকুমের ভিত গড়ে ওঠে; শব্দের বাহ্যিক অবয়বের ওপর নয়।"

সামগ্রিক নীতি : ৭৫

العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه

"প্রচলিত রীতি ও রেওয়াজ বিরোধী জিনিসের নাম যখন প্রচলিত হয়ে যায় তখন প্রচলিত রীতি ও রেওয়াজের নির্ভরযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়।"

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৭৬

المباح يملك بالإحراز

"মুবাহ্ জিনিসের (যার উপর কারো মালিকানা নেই) হেফাজত করার মাধ্যমে তার ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"

সামগ্রিক নীতি : ৭৭

يجب العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة

"প্রকৃতের ওপর আমল করা যখন কঠিন হয়ে পড়ে তখন অপ্রকৃতের ওপর আমল করা ওয়াজিব নয়।"

সামগ্রিক নীতি : ৭৮

الكتاب ممن نأى كالخطاب ممن دن

"নিকটবর্তী লোকের সাথে কথা বলা যে পর্যায়ে, দূরবর্তী লোকের সাথে চিঠিপত্র যোগাযোগও ঠিক তেমনি পর্যায়ের।"

সামগ্রিক নীতি : ৭৯

الولد يتبع خير الأبوين دينا

"পিতামাতার মধ্যে দীনের বিচারে যে শ্রেষ্ঠ হবে সন্তান তার (ধর্মের) অনুসারী হবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৮০

من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الاسلام كالميت

"যে ব্যক্তি দারুল হারবে অবস্থান করছে তাকে দারুল ইসলামে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য মৃত মনে করা হবে।"

সামগ্রিক নীতি : ৮১

لا تصح إجازة الباطل

"বাতিল কাজের অনুমতি বৈধ নয়।"

সামগ্রিক নীতি : ৮২

شرط صحة الصدقة التمليك

"যাকাত আদায় নির্ভুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে যাকে দেয়া হচ্ছে তাকে যাকাতের মালের মালিক বানিয়ে দেয়া।"

সামগ্রিক নীতি : ৮৩

التبرع في المرض وصية

"মৃত্যুরোগে দান অসিয়াতের পর্যায়ভুক্ত (অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে)।"

www.pathagar.com

সামগ্রিক নীতি : ৮৪

ما كان على وجه التبرع يستوي فيه الغني والفقير

"যে জিনিসটি মুবাহ্‌র পর্যায়ে থাকে তার মধ্যে ধনী-গরীব সবাই সমান।"

সামগ্রিক নীতি : ৮৫

خير الأمور أوسطها

"সব ব্যাপারে মধ্যপন্থাই উত্তম।"

সামগ্রিক নীতি : ৮৬

قول الواحد العدل فى امر الدين مقبول كما يقبل فى الاخبار عن طهارة الماء ونجاسته كما يقبل فى هلال رمضان وكما يقبل فى رواية الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"দীনের ব্যাপারে একজন ন্যায়নিষ্ঠ (عدل) ব্যক্তির খবর গ্রহণীয় হবে, যেমন হয় পানির পাক ও নাপাক হওয়া সম্পর্কে, রমযানের নতুন চাঁদ দেখা ব্যাপারে এবং রসূলুল্লাহ্ স.-এর হাদীস বর্ণনায়।"

এগুলো ছাড়া আরো বহু সামগ্রিক নীতি ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হের কিতাবগুলোতে দেখা যায়, যার অনুধাবন কঠিন ও জরুরী এবং এগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গেলে পুস্তকের কলেবর বেড়ে যাবে বলে এখানেই ক্ষান্ত করা হলো।

মূল নীতি ও সামগ্রিক নীতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক নির্দেশ

এইসব উসূল (মূলনীতি) ও কুল্লীয়াত (সামগ্রিক নীতি) ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মূলগতভাবে দু'টো বিষয় অপরিহার্য :

১. স্থান ও কালের সাথে সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য। অর্থাৎ ফকীহগণ কোন কোন জায়গায় ও কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করেছেন।

২. সামগ্রিকভাবে উসূল ও কুল্লীয়াতের জ্ঞান এমন পর্যায়ের হবে না যার ফলে একটি উসূলের সাহায্যে মাসআলা উদ্ভাবন করতে গেলে অন্য উসূলের বিরোধিতা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ফিক্হী বিধানের লঘুকরণ

এই অধ্যায়ে যেসব বিধানের লঘুকরণের বর্ণনা হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলো পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন উপলক্ষে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে সেগুলোর পুনরাবৃত্তির অজুহাত হচ্ছে এই যে, পাঠক বিধানগুলো এক নজরে দেখতে পাবেন।

ফকীহগণ আল্লাহ্র হিকমত ও সাধারণ উদ্দেশ্যের আওতাধীনে এই ধরনের আটটি কারণ বর্ণনা করেছেন।

১. সফর
২. রোগ
৩. ইকরাহ বা বলপ্রয়োগ
৪. নিসয়ান বা ভুলে যাওয়া
৫. জাহ্ল বা অজ্ঞতা
৬. উস্র বা কঠিন হওয়া ও সংকটাবর্তে পড়ে যাওয়া (ভিতরে আলোচনা নেই)
৭. উমূমুল বাল্ওয়া বা সাধারণভাবে লোকদের আক্রান্ত হওয়া
৮. নাক্স বা স্বাভাবিক অভাব ও কমতি।

এদের প্রত্যেকের বিস্তারিত বিবরণ এখন আলোচনা করা যায়।

০১. সফরের (سفر) কারণে বিধানের তাখফীফ[১]

সফর দুই ধরনের :

১. শরীয়তের চাহিদায় সফর, যথা হজ্জ ও জিহাদের সফর। এটি কমপক্ষে ৪৮ মাইলের সফর হয়। মুসাফির এ সফরে বের হবার সময় থেকে (গন্তব্যে উপনীত হবার পূর্বেও) শরীয়ত তাকে যে সব সুবিধা দেয় তা হচ্ছে : চার রাকআতের পরিবর্তে দুই রাকআত নামাযের অনুমতি, সুন্নাতের বাধ্যবাধকতা না থাকা, রমাযানের সওম পরবর্তীতে রাখার অনুমতি, চামড়ার মোজার ওপর তিন দিন ও তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ (مسح / ভেজা হাত বোলানো) করার অনুমতি, طاهر (পবিত্র) অবস্থায় যদি মোজা পরিহিত হয়ে থাকে-অর্থাৎ পা ধোয়া থেকে রেহাই পাওয়া ;

---

১. تخفيف = হালকা করা, تسهيل = সহজসাধ্য করা, رخصة = শিথিল করা।

www.pathagar.com

কুরবানীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি (অবশ্য হজ্জের দরুণ যে কুরবানী ওয়াজিব হয় তা থেকে সফরের কারণে অব্যাহতি মিলে না) ইত্যাদি।

২. বৈষয়িক অর্থাৎ সাধারণ জাগতিক ব্যাপারে সফর। এ সফর ৪৮ মাইল দূরত্বের শর্তে বাঁধা নয়। প্রতিদিনের কারবারের জন্য মানুষ স্বদেশ ও স্ব এলাকা থেকে কিছু দূরে চলে যায় আবার তাড়াতাড়ি ফিরেও আসে। এইরূপ সফরের ছাড়ের (রুখ্‌সাতের / رخصة) মধ্যে জুমুআর নামায, দুই ঈদের নামায ও জামাআত বাদ দিতে বাধ্য হলে তার অনুমতি আছে। তদুপরি পানি এক মাইল দূরে থাকলে তায়াম্মুম করে নামায পড়া এবং পশুর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় কিবলার (قبلة) চিন্তা না করে যে দিকে চলেছে সে দিকে মুখ করে নফল নামায পড়া ইত্যাদির অনুমতি রয়েছে।

০২. রোগের কারণে বিধানের তাখফীফ বা রুখ্‌সাত

রুগ্ন অবস্থায় রুখ্‌সাতের মধ্যে রয়েছে : অযু ও গোসল করলে রোগ বেড়ে যাবার সম্ভাবনায় অথবা রোগ সারতে বিলম্বের আশঙ্কায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা; রোগগ্রস্ত অবস্থায় বসে শুয়ে বা ইশারায় যেমন করে সুবিধা নামায পড়ে নেয়ার অনুমতি; রমযানের রোযা অন্য সময় রাখার অনুমতি; ইতিকাফ (اعتكاف) অসম্পূর্ণ রেখে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসা; হজ্জের জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেয়া; নাপাক জিনিস যথা শরাব ইত্যাদির সাহায্যে চিকিৎসা করা বা করানো; হুলকুম (حلقوم / কণ্ঠাভ্যন্তর)-এ কোনো জিনিস আটকে গেলে হারাম-হালাল যে কোনো পানীয়ের মাধ্যমেই সম্ভব গলা পরিষ্কার করা; ডাক্তার ও ধাত্রীকে যথাপ্রয়োজন গোপন অঙ্গ দেখতে দেয়া ইত্যাদি।

তবে এই অনুমতিকে প্রয়োজন ছাড়াই কাজে লাগানো, প্রয়োজনের সীমা পার হয়ে যাওয়া অথবা প্রয়োজনের অযথা ব্যবহার এ সব অবস্থাই নিষিদ্ধ। তবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌র শরীয়তের যেসব রুখ্‌সাত ও সুবিধা দেখা দেয় তা সব প্রয়োজনের সীমা পর্যন্তই নির্ভরযোগ্য এর চেয়ে বেশীর কোনো অবকাশই নেই।

০৩. জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ (اكراه)-এর ক্ষেত্রে রুখ্‌সাত

জবরদস্তীর প্রকারভেদ রয়েছে। যে ব্যক্তি জবরদস্তী করেছে (مكره) তার আদেশ অমান্য করলে :

১. যদি প্রাণনাশ বা অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে; এ অবস্থায় মুকরাহ مكره / যার ওপর জবরদস্তী করা হয়-এর স্বাধীন ইচ্ছা বা এখতিয়ার কিছুই থাকে না যদি প্রাণ বা অঙ্গ বাঁচাতে হয়;

www.pathagar.com

২. যদি প্রাণনাশ বা অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কা না থাকে কিন্তু দীর্ঘ বন্দীদশার আশঙ্কা দেখা দেয়; এ অবস্থায়ও মেনে নিতে কেউ রাযী হয় না ঠিকই তবে তার এখতিয়ার অবশ্যই থাকে, প্রথমোক্ত অবস্থার মতো মুকরাহ একেবারে অনন্যোপায় নয়;

৩. যদি ব্যক্তিগত কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে কিন্তু পিতা, পুত্র বা নিকট আত্মীয়দের ক্ষতির প্রশ্ন দেখা দেয়; এটি তৃতীয় স্তরের ইকরাহ, এতেও কেউ রাযী হবে না কিন্তু এখতিয়ার থাকে অর্থাৎ জবরদস্তীমূলক আদেশ অমান্য করতে পারে।

জবরদস্তী বনাম তাকলীফ[২]

ফকীহগণের মতে নীতিগতভাবে কোনো ধরনের জবরদস্তীর ফলে মানুষ আল্লাহ্‌র আহকাম মেনে চলার দায়িত্ব (تكليف / তাকলীফ) থেকে একেবারে মুক্ত হয় না। জবরদস্তী যে পর্যায়েরই হোক না কেন, সব অবস্থায়ই সে শরীয়তের বিধান সমূহের মুকাল্লাফ (مكلف) থেকে যায়। তবে জবরদস্তীর দরুণ কৃতকর্মের পরিণাম কে ভোগ করবে, তাতে কতটা রুখ্‌সাত পাওয়া যাবে তা নির্ভর করবে অবস্থা এবং জবরদস্তীর প্রকারভেদের ওপর।

জবরদস্তী (اكراه) হতে পারে :

১. কোনো কথা বলার জন্য, কিংবা

২. কোনো কাজ করার জন্য অর্থাৎ মানুষকে কোনো কথা বলতে বাধ্য করা অথবা কোনো কাজ করতে বাধ্য করা। যেসব অবস্থায় কোনো মানুষ অন্যের ক্রীড়নক হতে পারে। যেমন, কাউকে হত্যা বা কারো সম্পদ নষ্ট করার ব্যাপারে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে পারে, এক্ষেত্রে অপরাধী হবে জবরদস্তীকারী, যার ওপর জবরদস্তী করা হলো সে পরিত্রাণ পাবে। আসলে রাইফেলটা চালিয়েছে অথবা ঘরে আগুন লাগিয়েছে জবরদস্তীকারী, কিন্তু অপরের হাত দিয়ে যাকে সে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করেছে। সুতরাং কিসাস বা দীয়াত হবে বল প্রয়োগকারীর দায়িত্ব। অন্যপক্ষে যদি কেউ তার দাসকে ব্যভিচারে কিংবা তার দাসীকে দেহ ব্যবসায়ে বাধ্য করে তবে সে তার দাস বা দাসীকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে পারে না। কারণ ব্যভিচারে দাস ও দাসীর যৌন অঙ্গের ব্যবহার অপরিহার্য যা

---

২. تكليف = শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের দায়িত্ব।

www.pathagar.com

অপরের হাতের হাতিয়ার হতে পারে না [তদুপরি ব্যভিচারের দোসর আর এক নারী এবং পুরুষ এতে সম্পৃক্ত] এরূপ ক্ষেত্রে জবরদস্তীকারী সরাসরি ব্যভিচারী নয়, ব্যভিচারের শাস্তিও তার প্রতি প্রযোজ্য নয়, অন্য শাস্তি (تعزير) দেশের আইনের আওতায় সে পাবে। সরাসরি ব্যভিচারের জন্য দায়ী যার ওপর জরবদস্তী করা হয়েছে সে। তবে সে রুখ্‌সাত পেতে পারে এবং আল্লাহ্ তাকে মাফ করতে পারেন।

কোনো কথা বলতে জবরদস্তীর ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ আর একটি বিবেচনার উল্লেখ করেছেন। কথাটি যদি এমন পর্যায়ের হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বক্তার সম্মতির অপেক্ষা রাখে না, বরং শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণেই বক্তব্য বাস্তবে পরিণত হয়, যে কথার পরিণাম (effect) কখনও বিলীন হয় না। যেমন তালাক, 'ইতাক[৩], জোর-জবরদস্তীর কারণে তালাক এবং 'ইতাকসূচক বাক্য উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যাবে বা দাস মুক্ত হয়ে যাবে। যিহার (ظهار), ঈলা (ايلاء), কসম ও (قسم / শপথ) এই পর্যায়ের অর্থাৎ উচ্চারণই যথেষ্ট, উচ্চারণকারীর সম্মতির উপর নির্ভরশীল নয়। তালাকের পর রাজাআত[৪]-এর ক্ষেত্রেও এই বিধান। এমনি যদি বলে আমি আমার ছেলের হত্যার দণ্ড (قصاص)-এর দাবী ছেড়ে দিলাম বা হত্যাকারীকে মাফ করে দিলাম উচ্চারণ মাত্রই হত্যাকারী মুক্ত হয়ে যাবে যদিও জবরদস্তী কোনো ওয়ারিছ বা ওয়ালী (ولى/وارث)-এর মুখ দিয়ে কথাগুলো বলা হয়। শরীয়ত অনুযায়ী এ জাতীয় কথার ফাস্‌খ[৫] (প্রত্যাহার) জায়েয নয়।

অন্যপক্ষে জবরদস্তীমূলক যে কথাটি বলানো হলো তা যদি এমন পর্যায়ের হয় যা শরীয়ত অনুযায়ী ফাস্‌খ বা প্রত্যাহার করা চলে এবং যার পরিণতি বক্তার সম্মতির ওপর নির্ভরশীল, যথা বিবাহের ইজাব (ايجاب / প্রস্তাবনা) ও কবুল (قبول / প্রস্তাব গ্রহণসূচক বাক্য), বেচা-কেনার চুক্তিমূলক বাক্য ইত্যাদি যে চুক্তি বক্তার সম্মতি ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হয় না- জবরদস্তীর কারণে এ সব বাক্য উচ্চারণ করলেও বিবাহ, বেচা-কেনা, ভাড়া অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু তা ফাসিদ (فاسد / ত্রুটিযুক্ত) হবে; পরবর্তীতে, যাদের ওপর জবরদস্তী করা হয়েছে (এক বা উভয় পক্ষ) তারা চাইলে চুক্তি অব্যাহত রাখতে পারে এবং না রাখতে চাইলে ফাস্‌খ করে দিতে পারে।

---

৩. عتاق = দাস-দাসীর মুক্তিদান।

৪. رجعة = প্রত্যাগমণ অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদ (عدة)-এর মধ্যে কথায় বা কাজে তালাক নাকচ করা।

৫. فسخ = প্রত্যাহার, Withdraw করা।

www.pathagar.com

কাজ দুই প্রকার :

১. এমন কোনো কাজ করতে বল প্রয়োগ করা হয়েছে যা সাধারণত অন্যের যন্ত্র থেকে হতে পারে না। যেমন, পানাহার করা। একথা সুস্পষ্ট যে, অন্যের মুখ দিয়ে নিজের পানাহার করার কথা কল্পনাই করা যায় না। অথবা কারোর বল প্রয়োগে ব্যভিচার করা। এতেও অন্যের যন্ত্রের কোনো দখল থাকে না। মানুষ নিজেই নিজের দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যেই একাজ করে। এসব অবস্থায় যার ওপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে তাকেই দায়ী করা হবে। সওম রাখা অবস্থায় যদি কাউকে জোর করে খাওয়ানো হয় তাহলে যে খাইয়েছে তার সওম ফাসেদ বা নষ্ট হবে না। বরং যে খেয়েছে তার সওম নষ্ট হবে। আর ব্যভিচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যভিচারকারীকে শাস্তি দেয়া হবে, আদেশ প্রদানকারীকে নয়। তবে যে সব অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দেবার প্রশ্ন আসবে যেমন অন্যের খাবার খাওয়ার ব্যাপারে বল প্রয়োগ করা হয়েছে, এ অবস্থায় বল প্রয়োগকারীকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২. যে কাজে অন্যের যন্ত্রে পরিণত হতে পারে। যেমন কাউকে মেরে ফেলা, কারোর সম্পদ নষ্ট করে দেয়া ইত্যাদি। এসব অবস্থায় যে ব্যক্তি কাজ করে সে দায়মুক্ত হবে। বল প্রয়োগকারীই আসল অপরাধী সাব্যস্ত হবে। যেমন উপরে বলা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, কারোর হাত ধরে অন্যের গলায় ছুরি চালিয়ে দেয়া, কারোর হাতে বন্দুক রেখে অন্যকে গুলি করে খতম করে দেয়া অথবা কারোর হাত ধরে অন্যের সম্পদ ছিনতাই করার কাজে লাগিয়ে দেয়া ইত্যাদি এমনসব অবস্থা যেগুলো সম্ভব এবং এভাবে মানুষ অন্যের যন্ত্রকে ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অন্যদিকে বল প্রয়োগের কারণে এ ব্যক্তি এমনটি করতে বাধ্য হয়।

রুখ্সাত পরিণামের প্রেক্ষিতে

জবরদস্তীর পরিণাম ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমিত থাকলে সেক্ষেত্রে উদারভাবে রুখ্সাত দেয়া হয়, কিন্তু জবরদস্তীর কারণে কৃত কর্মটির পরিণাম যদি ব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে অন্যদের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়, সে ক্ষেত্রে রুখ্সাতের ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হয়। যেমন :

১. কোনো ব্যক্তিকে ব্যভিচার করতে বাধ্য করা হলেও শরীয়ত তাকে এই কাজ করার অনুমতি দেয় না, কারণ এতে বংশ বিভ্রাট ঘটে এবং

www.pathagar.com

সম্ভাব্য শিশুর ভাগ্য বিড়ম্বনা বহু দূর গড়াতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজটি হত্যার সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

২. কোনো ব্যক্তিকে হত্যা বা তার অঙ্গচ্ছেদ করতে বাধ্য করা হলেও শরীয়ত তাকে এ কাজের অনুমতি দেয় না, কারণ এ কাজের অশুভ পরিণতি মৃত বা অঙ্গচ্ছেদিত ব্যক্তির পরিবার বর্গের ওপর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোটা সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়। অধিকন্তু ইসলামী শরীয়তে নিজের প্রাণ দিয়ে অপরের প্রাণ রক্ষার আদেশ রয়েছে, নীতিগতভাবে এর বিপরীত কর্ম অনুমোদন করে না।

অন্যপক্ষে যেসব ক্ষেত্রে রুখ্‌সাত মিলে তার কতিপয় উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. মৃত ও হারাম জিনিস খাওয়ার ব্যাপারে জবরদস্তী করা হলে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তা আহার করা জরুরী, না করে প্রাণ হারালে শরীয়ত তাকে অপরাধী গণ্য করবে।

২. কুফরী কথা বলার জন্য জবরদস্তী করা হলে মুখে তা উচ্চারণ করার অনুমতি রয়েছে। কুরআন মাজীদের স্পষ্ট বাক্য

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ "তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাকে কুফরিতে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তর ঈমানের দ্বারা প্রশান্ত"[৬] অনুসারে যদি তার অন্তরে স্থির নিশ্চিত ঈমান বজায় থাকে। উল্লেখ্য, রুখ্‌সাত থাকা সত্ত্বেও যদি সে কুফরী কথা উচ্চারণ না করে এবং তাকে হত্যা করা হয় তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার পাবে। এই দু'টি অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের কারণে হারাম জিনিস খাওয়া মুবাহ (مباح / বৈধ) হয়ে গিয়েছিল। মুবাহ্ পরিত্যাগ করার দরুণ জীবন বা অঙ্গহানি ঘটলে সে গুনাহগার হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যাপার হলো, কুফর বা কুফরী কথা কোনো অবস্থাতেই মুবাহ হয় না। উচ্চারণ করলে সে রুখ্‌সাত পাবে, উচ্চারণ না করে প্রাণ দিলে সে 'আযীমাত[৭]-এর পর্যায়ে কাজ করলো, সুতরাং গুনাহগার হবে না, বরং পুরস্কারের হকদার হবে।

০৪. বিস্মৃতির কারণে রুখ্‌সাত

ভুল করে কোনো অযথা বা বেঠিক কথা বললে বা কাজ করলে কোনো গুনাহ্ হয় না। রসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নোক্ত হাদীসে একথাই বলা হয়েছে।

---

৬. আল-কুরআন, ১৬ : ১০৬

৭. عزيمة = রুখ্‌সাতের বিপরীত, যেমন ঈমানে অবিচল থাকা।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ

"আল্লাহ আমার উম্মতের ওপর থেকে ভুল ও বিস্মৃতি নামিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ ভুলক্রমে কোনো অন্যায় করে ফেললে তাকে রুখ্সাত দেয়া হবে।"[৮]

ফকীহ্দের মতে ভুলে যাওয়া মানবের প্রকৃতিগত একটি অক্ষমতা হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে ভুলে যাওয়া নীতিগতভাবে এমন গ্রহণযোগ্য ওযর (عذر/অজুহাত) নয়। ভুলে যাওয়ার পরিণামে কারো ক্ষতি হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ থেকে রুখ্সাত পাবে না। উদাহরণ :

১. বিস্মৃতির ফলে কোনো ব্যক্তি ফরয/ওয়াজিব নামায পড়তে ভুলে গেলো অথবা রমযানের সওম রাখতে বা কোন বছর যাকাত দিতে ভুলে গেলো- এমনসব অবস্থায় কাযা (قضاء / পরবর্তীতে পালন) ওয়াজিব হবে। রুখ্সাত হলো তার কোনো গুনাহ হবে না যদি কাযা করে দেয়।

২. বিস্মৃতির ফলে কোন নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললো। যেমন কারো সম্পদ নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। রুখ্সাত এইটুকু যে, সত্যিকার বিস্মৃতি প্রমাণিত হলে সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।

৩. কোন রুখ্সাত পাবে না যদি ভুলে স্ত্রীকে তালাক দেয় কিংবা দাসকে মুক্ত করে দেয়। কারণ, যেমন জবরদস্তীর বেলায় বলা হয়েছে, এই জাতের কতিপয় ব্যাপারে মুখের উচ্চারণই যথেষ্ট, ফাস্খ-এরও অবকাশ নেই- সে ভুলেই উচ্চারণ করুক বা জেনে শুনে করুক।

৪. যদি কেউ বলে নামাযের মধ্যে বেখেয়ালে আমি পানাহার করেছি বা কারো সাথে কথা বলেছি, তার এ অজুহাত শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না, তার নামায বাতিল (باطل) হয়ে যাবে অর্থাৎ নতুন করে আদায় করতে হবে। কারণ, নামাযের আনুষ্ঠানিক পরিবেশ এ জাতের ভুলের অবকাশ রাখে না। তা ছাড়া নামাযী তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণ করে নামায ব্যতীত অন্য সব কর্ম ও কথা সজ্ঞানে হারাম করে নেয়। এ অবস্থায় আহার বা বাক্যের প্রবৃত্তি জাগা অস্বাভাবিক, সুতরাং সে কোন রুখ্সাত পাবে না। তবে প্রকৃতিগত ভাবে যে ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে রুখ্সাত পাওয়া যাবে। যেমন- সওম পালনের অবস্থায় ভুলে কিছু পানাহার করে ফেললে সওম বাতিল হয়ে যাবেনা।

---

৮. সুনানু ইবনি মাজাহ, কিতাব : আত-তালাক, বাব : তালাকুল মুকরাহ ওয়ান নাসী, হাদীস নং-২০৪৫

www.pathagar.com

যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের অবশিষ্ট সময়ে পানাহার না করে বা সওম ভঙ্গের অন্য কারণ না ঘটে। অনুরূপভাবে যবাই করার সময় বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে যবাই করা প্রাণী হারাম হয়ে যাবে না। প্রাণী বধের আতঙ্ক বা তৎপ্রতি প্রকৃতিগত অনীহাও এমন ভুলের কারণ হতে পারে। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর ব্যক্তির পক্ষে পানাহারের প্রতি আকর্ষণও অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং রুখ্‌সাতের ব্যবস্থা রয়েছে।

০৫. জাহ্‌ল[১]-এর ক্ষেত্রে রুখ্‌সাত

ফকীহ্‌গণ কয়েক প্রকারের জাহ্‌ল-এর (অজ্ঞতা) বর্ণনা করেছেন এবং প্রয়োজনীয় তাখ্‌ফীফ বা রুখ্‌সাতের ব্যবস্থা করেছেন :

১. ইসলামের মৌলিক শিক্ষা (তাওহীদ, রিসালাত ইত্যাদি) সম্পর্কে অজ্ঞতা পার্থিব ব্যাপারে ও আদালতে বিবেচিত হবে বটে কিন্তু আখিরাতের জবাবদিহি থেকে সে রেহাই পেতে পারবে না। ফকীহ্‌দের মতে অমুসলিমগণও ইসলামী শরীয়তের মুকাল্লাফ (مكلف) অর্থাৎ দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার অজুহাত আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেশের আদালতে ওজর রূপে গৃহীত হবে, কারণ আল্লাহ্‌র শরীয়তে দীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তির অবকাশ নেই। এর বিপরীত হচ্ছে দেশের আইন এই আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতা অজুহাত রূপে গৃহীত হয় না।

২. যেসব বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ আছে তেমন কোন বিষয় সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত জানা না থাকলে এমন অজ্ঞতা ওজর হিসেবে গৃহীত হবে। যেমন, কেউ মনে করলো রক্ত মোক্ষণের জন্য সিঙ্গা লাগালে সওম নষ্ট হয়ে যায়। এই ধারণার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে সওমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না, কাযা করতে হবে। কেননা কোনো কোনো ইমামের সুস্পষ্ট মতে সওম ভঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আওযা'ঈ এই মতের সমর্থক। তবে অধিকাংশের মতে সিঙ্গা লাগালে সওম নষ্ট হয় না।

আসল ওলী অর্থাৎ অভিভাবককে (বাবা ও দাদা) না জানিয়ে অন্য কোনো আত্মীয় একটি মেয়ের বিবাহ দিয়ে দিলো। জানার পর বিবাহ ভেঙ্গে দেবার (فسخ) এখতিয়ার ওলীর থাকবে। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, বাবা ও দাদা (আসল অভিভাবক)

---

১. جهل = না জানা বা অজ্ঞতা।

www.pathagar.com

ব্যক্তি স্বার্থে কোনো মেয়ের বিবাহ দিলে মেয়ে যখন জানতে পারবে তখন সে বিবাহ ফাস্খের দাবী করতে পারবে এবং অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য অজুহাত হবে।

০৬. উস্‌র (عسر) ও উমূমুল-বালওয়া (عموم البلوى)-এর দরুণ রুখ্সাত

'উস্‌র' অর্থ 'সংকট ও কঠিন পরিস্থিতি'। দৈনন্দিন জীবনে সবাইকে সাধারণভাবে যে সঙ্কট বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং যার হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাকেই বলা হয় 'উমূমুল বাল্ওয়া (সঙ্কটের ব্যাপকতা)। এ দু'টি অবস্থায়ও আল্লাহ্‌র শরীয়তের বিধান হালকা ও সহজ হয়ে যায়। কারণ আল্লাহর বাণী :

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারো ওপর তার ক্ষমতার বাইরে দায়িত্ব চাপান না।"[১০]

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে যা সহজ তাই চান যা কঠিন তা চাননা।"[১১]

ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট ঔদার্য প্রদর্শন করেছেন। নিচে উদাহরণস্বরূপ কতগুলো ইজতিহাদী বিধানের উল্লেখ করা হচ্ছে : পবিত্রতা-অপবিত্রতার ক্ষেত্রে নাজাসাত (অপবিত্র বা নাপাক বস্তু)-কে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তথা নাজাসাতে-গালীযা (نجاسة غليظة / গাঢ় নাপাক বস্তু) যথা প্রস্রাব, রজঃস্রাব ইত্যাদি এবং নাজাসাতে-খাফীফা (نجاسة خفيفة / হালকা নাপাক বস্তু) যথা মল, বিষ্ঠা ইত্যাদি।

এ দুই প্রকারের অপবিত্র বস্তুর গুরুত্ব-লঘুত্বের বিবেচনায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের রুখ্সাত দেয়া হয়েছে অর্থাৎ গায়ে বা কাপড়ে সে পরিমাণ লেগে গেলে তাতে অপবিত্র হবে না।

মশা ও ডাঁশের রক্ত, রাস্তার কাদা, কবুতর, চড়ুই ইত্যাদির বিষ্ঠা কাপড়ে বা শরীরে লেগে গেলে তাতে অপবিত্র হবে না। অনুরূপভাবে পেশাবের ছিঁটা যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যেমন সুঁইয়ের অগ্রভাগের মত তাও নগন্য। নাপাক জিনিসের ধোঁয়া এবং এমনসব প্রাণীর পেশাব-পায়খানায়ও রুখ্সাত রয়েছে যেগুলোর শরীরে প্রবহমান রক্ত নেই। ইঁদুরের এক আধটা লেদী (বিষ্ঠা) দুধে পড়ে গেলে এবং ভেঙে যাবার আগেই তা বের করে নিলে সে দুধ অপবিত্র বিবেচিত হবে না। গোসলখানার দেয়াল যদি অপবিত্র থাকে এবং তার গা ছুঁয়ে টপকানো

---

১০. আল-কুরআন, ২ : ২৮৬
১১. আল-কুরআন, ২ : ১৮৫

www.pathagar.com

সামান্য পানি লেগে যায়, ঘর বানাবার জন্য তৈরী এমন ধরনের কাদা যাতে অপবিত্র মাটি বা পানি মেশানো হয় এবং তার সামান্য লেগে যায়, ছিটানো পানি লেগে পা ভিজে যায় ইত্যাদি এবং এই ধরনের সামান্য রকমের অপবিত্রতায় রুখ্‌সাত দেয়া হয়, কারণ মানুষ সাধারণত এ ধরনের অপবিত্রতা বাঁচিয়ে চলতে পারে না, বাঁচিয়ে চলা সহজ সাধ্যও নয়।

ঘরে অবস্থানকালেও চামড়ার মোজার ওপর মাস্‌হ্ করার অনুমতি রয়েছে। কোনো পানি পবিত্র হওয়া সম্বন্ধে প্রবল ধারণার (ظن غالب) ভিত্তিতে তা দিয়ে অযু-গোসল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদি সে পানিতে অপবিত্র হওয়ার কোনো নিদর্শন না থাকে। প্রবল ধূলিঝড় কিংবা বৃষ্টির কারণে জামাআত বাদ দেয়ার রুখ্‌সাত রয়েছে। মেয়েদের রজঃস্রাবের দিনগুলোর নামাযের কাযা নেই। একদিন ও এক রাতের বেশী সময় বেঁহুশ থাকলে নামায মাফ হয়ে যায়।

অভিভাবক, মুতাওয়াল্লী ও অছি (وصى) নিজেদের পরিশ্রমের হিসাবে ইয়াতীমের সম্পদ থেকে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ গণ্য করা হয়েছে। খোস-পাঁচড়ার বেদনা লাঘবের জন্য অথবা যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে পুরুষদের জন্য রেশম ব্যবহার করা জায়েয। বেচা-কেনার ব্যাপারে বিবাদ এবং ক্ষতি এড়াবার জন্য নানা প্রকারের খিয়ার (خيار/বিক্রয় বা লেনদেন নাকচ করার অধিকার)-এর ব্যবস্থা, যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে-এ সবও রুখ্‌সাতের শামিল।

বিবাহের সাক্ষীদের ব্যাপারে আদালত (عدالة/সত্যনিষ্ঠা, দীনদারী ইত্যাদি নির্ভরযোগ্যতার গুণাবলী)-এর খুব উঁচু মান নির্ধারণ করা হয়নি। কারণ এমন উঁচু দরের সাক্ষী সব সময় পাওয়া যায় না, দু'জন পুরুষ সাক্ষীর অভাবে একজন পুরুষ এর সাথে দু'জন মহিলার উপস্থিতিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে। নেহায়েত অপ্রীতিকর বিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্তি দানের জন্য শরীয়ত তালাক, তাফবীযে তালাক (تفويض طلاق / স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার অর্পণ) ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছে।

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অসিয়্যত (وصية) করতে পারে, এর বেশীর অসিয়্যত করলে উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি। তাই বেশীর অনুমতি নেই। মোটকথা ফিক্‌হের বিরাট পরিমণ্ডলের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত বহুবিধ মাসায়েলে কষ্ট দূর করার ও 'উমূমু'ল বাল্‌ওয়ার প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

০৭. নাকস্-এর ক্ষেত্রে রুখ্সাত

নাক্স (نقص) অর্থ ন্যূনতা, কমতি, হীনতা, যাতে অক্ষমতা সৃষ্টি হয়, যা নিবারণ করা মানুষের অসাধ্য বা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই নাক্স শব্দের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যথা: অক্ষমতা যেমন হায়য (حيض/মাসিক), নিফাস (نفاس/প্রসবের পর স্রাব), মস্তিষ্ক বিকৃতি, সংজ্ঞা লোপ, অপ্রাপ্ত বয়স্কতা (নাবালিগ অবস্থা), সফর কালের নানা অসুবিধা, শারীরিক অসুস্থতা, ভ্রম, নিদ্রাবস্থা, উপায়হীনতা ইত্যাদি। ইত্যাকার পরিস্থিতিতে শরীয়ত যে-সব রুখ্সাতের ব্যবস্থা করেছে তা বিভিন্ন উপলক্ষে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত এবং পুনরুক্ত হয়েছে।

এভাবে সামগ্রিকভাবে শরীয়তভিত্তিক হালকা ও সহজ করার সাতটি ধরণ পাওয়া যেতে পারে :

১. ওজর পাওয়া গেলে হুকুমটিই বাতিল করে দেয়া হবে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নামায মাফ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি এরই অন্তর্ভুক্ত;

২. হুকুম হালকা করে দেয়া হবে। যেমন সফর অবস্থায় কসরের (চার রাকআতের জায়গায় দুই রাকআত) অনুমতি;

৩. একটি হুকুমের জায়গায় তার স্থলাভিষিক্ত অন্য হুকুম রেখে দেয়া হবে। অযু ও গোসলের স্থলে তায়াম্মুমের অনুমতির সম্পর্ক এরি অন্তর্গত;

৪. কোনো হুকুমকে অগ্রবর্তী করা হবে। যেমন আরাফতের ময়দানে আসরের নামায যোহরের সময় পড়ার হুকুম এবং বছর অতিক্রান্তের পূর্বেই যাকাত আদায় করার বৈধতা;

৫. কোনো হুকুমকে পিছিয়ে দেয়া হবে। মুযদালিফায় মাগরিবের নামায এশার সময় পড়ার হুকুম। রোগী ও মুসাফিরের জন্য সওম পিছিয়ে দেবার অনুমতি;

৬. রুখ্সাত দিয়ে দেয়া হবে। কণ্ঠনালীতে কোনো জিনিস আটকে গেলো এবং তা গিলে ফেলার কোনো উপায়ই নেই এ অবস্থায় মদের সাহায্যে তা নামিয়ে নেয়া জায়েয;

৭. হুকুম সংশোধন করা হবে। যেমন ভয়ের অবস্থায় নামায পড়ার হুকুম। সেসময় নামাযের নির্ধারিত নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে পরিবর্তনের অনুমতি আছে।[১২] ফকীহগণ হালকা ও সহজ করার আওতাধীনে যেসব মূলনীতি নির্ধারিত করেছেন সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলোর আলোকে হালকা ও সহজ করার অন্যান্য রূপ বের করা যেতে পারে।

---

১২. দেখুন, আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর এবং ফিক্হের অন্যান্য কিতাব।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফকীহগণের মতবিরোধের কারণ

বিরোধের দু'টি মৌলিক কারণ

নিচে ফকীহগণের মতবিরোধের কারণগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মতবিরোধের ফলে মাসায়েল উদ্ভাবন করার এবং ফিক্‌হের পরিসর বিস্তৃত করার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। এগুলোর মূলে প্রধানত দু'টি কারণ সক্রিয় রয়েছে :

১. সাহাবা রা. ও তাবেঈগণের মতবিরোধ এবং
২. অবস্থা ও চাহিদার তারতম্য।

সাহাবায়ে কিরামের সামনে ছিল কুরআন মাজীদের আয়াত ও রসূলুল্লাহ স.-এর জীবন তথা তাঁর ইবাদত, মুআমালাত, তাঁর ফতোয়া-ফায়সালা ইত্যাদি। সুতরাং বিধান দেয়ার ব্যাপারে সাহাবাকে সাধারণত কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো না। যেহেতু তখন পর্যন্ত হাদীসের কোনো সংকলন গ্রন্থ মুদ্রণ হয়নি এবং শুধু বাচনিকভাবে হাদীসের চর্চা ও শিক্ষা হতো, সুতরাং সব হাদীস সে যুগে সবার জানা ছিল না। থাকার কথাও নয়, এমতাবস্থায় কোনো সাহাবী কোনো ব্যাপারে কুরআনে কোনো হুকুম না পেয়ে হাদীসে কিছু আছে কিনা খোঁজ করেও ব্যর্থ হয়ে নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় দিলেন। অন্য এক সাহাবী একই ব্যাপারে ভিন্ন রায় দিলেন, কারণ তিনি একটি হাদীস জানতেন যাতে স্পষ্ট হুকুম পাওয়া যায়। সাহাবীদের মধ্যে এমন ইখ্‌তিলাফও হয়ে যেতো। এই হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞাত হবার পর অবশ্য প্রথমোক্ত সাহাবী রাজআত (رجعة) অর্থাৎ নিজের মত প্রত্যাহার করতেন। বিজয়ের ফলে বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থায় বহু নতুন প্রশ্নের সমাধান দিতে গিয়ে সাহাবাকে যখন বিস্তর ইজতিহাদ করতে হলো তখন মতপার্থক্যের অবকাশও বেড়ে গেল।

হাদীসের মধ্যে বহু বিপরীতার্থক হাদীসও রয়েছে। যারা হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন তারা বিপরীতার্থক বলে কোনো হাদীসকে তাদের সংগ্রহ থেকে বাদ দেননি, বরং নিষ্ঠার সাথে সনদসহ সব হাদীসই রেকর্ড করে গিয়েছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ, ফকীহগণ বিপরীতার্থক হাদীসগুলোর মধ্যে সম্ভব হলে সামঞ্জস্য বিধান (تطبيق) করেছেন অথবা দিরায়াত (دراية)-এর পন্থায় কোনোটিকে গ্রহণ এবং কোনোটিকে বর্জন করেছেন। এ ব্যাপারে তারা হাদীসের মতন (متن) এবং

www.pathagar.com

সনদ (سند/বর্ণনাকারীদের নাম পরম্পরা) উভয়ের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। এই ক্ষেত্রেও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

ক. হাদীস বিপরীতার্থক নয় কিন্তু তার ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য দেখা দিল, অথবা হাদীসের ভিত্তিতে কিয়াস (قياس)-এর ক্ষেত্রে 'ইল্লাত (علة) স্থির করার ব্যাপারে মতপার্থক্য হতে পারে। সাহাবীগণের কাজের বিস্তারিত বিবরণ, 'ইল্লাত অনুসন্ধান করে ইজতিহাদ অনুযায়ী হুকুম দেয়ার পর কতিপয় অবস্থার সৃষ্টি হয় :

(ক) একজন সাহাবী নিজের ইজতিহাদ থেকে কোনো হুকুম দিলেন। কিন্তু অন্য সাহাবীর কাছে এতদসংক্রান্ত সহীহ হাদীস ছিল। তাতে যে হুকুম ছিল তা ছিল ঐ প্রথমোক্ত সাহাবীর ইজতিহাদী হুকুমের বিরোধী। এ অবস্থায় প্রথমোক্ত সাহাবী হাদীসের ওপর আমল করেন এবং আগের ইজতিহাদী হুকুম প্রত্যাহার করেন।

খ. ইজতিহাদী হুকুমের বিরুদ্ধে প্রথমটির মতো সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায়নি ঠিকই কিন্তু ইজতিহাদের মোকাবিলায় ঐ হাদীসটি বেশী শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। এহেন অবস্থায়ও হাদীসের ওপর আমল করেন এবং ইজতিহাদী হুকুম পরিহার করেন।

গ. ইজতিহাদী হুকুমের বিরুদ্ধে এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি যা মনে নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি এবং পূর্ববর্তী রায়ের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী মত গঠন করতে পারে। এক্ষেত্রে ইজতিহাদী হুকুমকেই অপরিবর্তিত রেখেছেন এবং হাদীসের ওপর আমল করেননি।

ঘ. হাদীস থাকা সত্ত্বেও অনেক সাহাবীর কাছে তা পৌঁছেনি। এই হাদীস না জানার অবস্থায় নিজেদের মাধ্যমে তারা হুকুম বিবৃত করেছেন এবং তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন।

এক. রায় ও ইজতিহাদের মাধ্যমে হুকুম দেবার পর মতবিরোধের উপর্যুক্ত চারটি রূপ দেখা যায়। দু'টিতে আগের হুকুম প্রত্যাহার করা হয়নি। হাদীস বিশুদ্ধ না হওয়ার বা হাদীস না পৌঁছার কারণে এটা হয়। এই দু'টি অবস্থাই পরবর্তীকালে মতবিরোধের কারণ বলে গণ্য হয়।

দুই. স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো সাহাবী রসূলুল্লাহ স.-এর কাজকে আইনগত মর্যাদা দান করেন এবং কেউ কেউ আবার তাকে ঐচ্ছিক পর্যায়ে রাখেন। কেউ কেউ কাজকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তিত রাখেন এবং অবস্থা ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে তার মেয়াদ নির্ধারণ করে দেন। এই পার্থক্যও পরবর্তীকালে কোনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

তিন. রসূলুল্লাহ স.-এর কোনো কাজ দেখে কোনো সাহাবী তাকে কোনো বিশেষ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করেন এবং অন্য কোনো সাহাবী তাকে অন্য কোনো অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করেন। সেই কাজটিতে উভয় ধরনের সম্ভাবনারই অবকাশ ছিল। যেমন, হজ্জের কার্যাবলি দেখে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, রসূলুল্লাহ স. 'কারেন' (যিনি একসাথে হজ্জ ও উমরাহ সম্পাদন করার নিয়ত করেন) ছিলেন, কেউ মনে করেছিলেন, তিনি 'মুতামাত্তে' (প্রথমে উমরাহ ও পরে হজ্জ সম্পাদনকারী) ছিলেন, আবার কেউ মনে করেছিলেন, তিনি 'মুফরিদ' (শুধু হজ্জ সম্পাদনকারী) ছিলেন।

চার. স্থান ও কাল নির্ধারণের ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবী ভুল করে বসেন। ফলে তারা বিরুদ্ধে হুকুম দেন।

পাঁচ. আসল স্থান-কাল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেননি। যার ফলে হুকুম ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দেয়।

ছয়. হুকুমের 'ইল্লাত নির্ণয়ের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়। একজন এক 'ইল্লাত বের করেন। অন্যজন বের করেন অন্য একটি 'ইল্লাত। পরে এরি ভিত্তিতে মাসায়েল উদ্ভাবন করতে গিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

সাত. দু'টি ভিন্ন ভিন্ন হাদীসের স্থান-কাল নির্ধারণে মতবিরোধ হয়। কেউ প্রয়োজন অর্থে গ্রহণ করেন। আবার কেউ সাধারণ হুকুম প্রমাণ করেন। এর ফলে কোনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধের অবস্থা সৃষ্টি হয়।

তাবেঈগণের কাজের বিস্তারিত বর্ণনা

সাহাবাগণের পরে আসে তাবেঈগণের যুগ। তাঁরা রসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাতের সাথে সাহাবাগণের বিভিন্ন উক্তি ও ব্যাখ্যাও সংরক্ষণ করেন। নিত্য নতুন অবস্থা ও মাসায়েল উদ্ভাবনে তাঁরা রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কিরাম উভয়কেই নিজেদের পথপ্রদর্শক করেন। উভয়ের দেয়া আলো থেকে লাভবান হন।

একথা সুস্পষ্ট, সাহাবাগণের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। সমস্ত সাহাবার বিভিন্ন উক্তি একত্র করে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পার্থক্য সৃষ্টি করার সুযোগ সব তাবেঈর ছিল না। তবুও তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে বিভিন্ন উক্তি একত্র করেন এবং শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে তার মধ্যে কোনোটিকে কোনোটির ওপর অগ্রাধিকার দেন। যেসব উক্তি তাদের কাছে দুর্বল মনে হয় সেগুলো পরিহার করার জন্য তারা উৎসাহিত করেন, যদিও সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু ছিল যেগুলো বড় বড় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী বর্ণনা করেছিলেন। জ্ঞান ও অনুসন্ধানের একটি বিশিষ্ট জগত রয়েছে। আবেগ ও উচ্ছাসের জগত তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। উল্লিখিত মনীষীগণ জ্ঞান ও

www.pathagar.com

অনুসন্ধানের মানদণ্ডে পূর্ববর্তীকে যাচাই ও পর্যালোচনা করেন। আনুগত্য, ভক্তি ও প্রীতির আবেগে আপ্লুত থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে তাঁরা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

সাহাবায়ে কিরামের পরে একমাত্র তাঁরাই বিভিন্ন স্থানে মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবার যোগ্যতা রাখতেন। কাজেই যেখানেই তারা ছিলেন সেখানেই মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। কারোর খ্যাতি একটু বেশী হয়ে যায়। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে লোকেরা ফায়দা হাসিল করার জন্য তাদের কাছে আসতেন। তাদের কাছে ছিল রসূলের হাদীস, সাহাবাগণের জীবন এবং তাদের বাণী, ফতওয়া, ফায়সালা এবং অগ্রাধিকার দানের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ইত্যাদিসহ আরো বহু কিছু। এছাড়াও ছিল কিছু নতুন অবস্থা ও সমস্যা। এগুলোর ব্যাপারে তাদের স্বতন্ত্র মতামতও ছিল। ইজতিহাদ ও ইসতিম্‌বাতের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। জ্ঞান পিপাসুরা (অর্থাৎ তাবে-তাবেঈগণ) এসব কিছু থেকেই ফায়দা হাসিল করেন। এরপর তারা নিজেরা প্রত্যেকের আপন আপন জায়গায় ইলম ও ফায়দা হাসিলের স্বতন্ত্র কেন্দ্রে পরিণত হন।

এভাবে তারা ফিক্‌হের সংকলন, বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব সম্পাদন করেন। তাবেঈগণও ফিক্‌হ্‌ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাদের কারোর কারোর রচনা ও টীকা মওজুদ ছিল। এসব কিছু থেকেই এরা (অর্থাৎ তাবে-তাবেঈগণ) ফায়দা হাসিল করেন।

ফিক্‌হ্‌ লিপিবদ্ধ করার সময় ফকীহ্‌দের সামনে কয়েকটি জিনিস ছিল

ফিক্‌হ্‌ লিপিবদ্ধ করার সময় নিম্নোক্ত জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেঃ

১. কুরআন মাজীদ
২. রসূলের সুন্নাত
৩. সাহাবাগণের উক্তি
৪. সাহাবাগণের বিরোধমূলক মাসায়েল
৫. তাবেঈগণের রায়
৬. তাবেঈগণের বিরোধমূলক মাসায়েল
৭. অবস্থা ও চাহিদা
৮. অবস্থা ও চাহিদার বিরোধ।

এ ব্যাপারে পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ। কুরআন ও সুন্নাতের স্থান ও কাল নির্ণয় করতে গিয়ে তারা সাহাবায়ে কিরামের উক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন। তারপর তাবেঈদের

www.pathagar.com

দিকে ফিরতেন। এরপরও যদি সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব না হতো এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক অবস্থা বের করা সম্ভব না হতো তাহলে নিজেদের শায়খবৃন্দ (শিক্ষক মণ্ডলী) ও নিকটবর্তী অন্যান্য আলেমগণের উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে মাসায়েল উদ্ভাবন করতেন। এই কর্মপদ্ধতিতে ঐক্য সত্ত্বেও মতবিরোধের নিম্নোক্ত রূপ সমূহ দেখা যেতো।

সাহাবাগণের মতবিরোধ ভিত্তিক কতিপয় অবস্থা

এক. অর্থ অনুধাবন করার ব্যাপারে সাহাবাগণের মতবিরোধ। যেমন কুরু (قروء) শব্দটিকে একজন এক অর্থে এবং অন্যজন অন্য অর্থে নিয়েছেন।

দুই. কুরআন ও সুন্নাতের স্থান ও কাল নির্ধারণ করার ব্যাপারে সাহাবাগণের মতপার্থক্য।

তিন. সুন্নাতকে আইনগত মর্যাদা দান এবং গ্রহণ করার শর্তাবলীর ক্ষেত্রে মতপার্থক্য।

চার. সাহাবাগণের বিভিন্ন উক্তি বিভিন্ন তাবেঈর মাধ্যমে জনসমক্ষে আসা এবং নিজ নিজ তথ্য জ্ঞানের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারের একটি রূপ ছিল এবং অন্যজনের কাছে ছিল অন্য একটি রূপ।

পাঁচ. নিজের শায়খবৃন্দ ও নিকটবর্তী লোকদের থেকে ফায়দা হাসিল করা এবং তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেয়া।

ছয়. বিরোধী বিষয় সমূহে নিজের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী ফায়সালা করা।

সাত. এমন হাদীসের সন্ধান লাভ, যা তাবেঈদের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছেনি। এ অবস্থায় হাদীসকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং তাবেঈগণের উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা। তারপর আবার কারোর কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে এবং কারোর কাছে পৌঁছেনি।

আট. একটি হাদীস একজনের কাছে এমন ধরনের মাধ্যমে পৌঁছে যা তার নিকট নির্ভরযোগ্য ছিল এবং অন্যজনের কাছে সেই সূত্রে পৌঁছেনি। একারণে একজন তা গ্রহণ করেছেন এবং অন্যজন করেননি।

নয়. কোনো কোনো হাদীসের মোকাবিলায় সাহাবাগণের উক্তির দিকে ফিরে যাওয়া। কোনো ফকীহের হাদীসের ওপর আমল করা এবং সাহাবাগণের উক্তির ওপর আমল করা।

দশ. সাহাবাগণের উক্তি ও কর্মের ক্ষেত্রে স্থান কাল নির্ধারণে বিরোধ।

এগার. তাবেঈগণের নিজেদের উক্তি ও কর্মের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত ধরনের বিরোধ।

www.pathagar.com

অবস্থা ও চাহিদাভিত্তিক মতবিরোধের কতিপয় অবস্থা

এ বিরোধগুলো তো ছিল সাহাবা ও তাবেঈগণের মতবিরোধভিত্তিক। অন্যদিকে অবস্থা ও চাহিদার ভিত্তিতে বিরোধগুলো ছিল নিম্নরূপ :

এক. হুকুমের 'ইল্লাতের মধ্যে বিরোধ। এর একটি ছিল সাহাবাগণের বিরোধভিত্তিক এবং অন্যটি ছিল অবস্থা ও চাহিদাভিত্তিক।

দুই. নতুন নতুন অবস্থা ও সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনের জন্য বিভিন্ন মূলনীতি প্রণয়ন করা এবং নির্ধারিত নীতির আওতায় তাদের সমাধান বের করা। একজন এর জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করেন অন্যজন করেন আর একটি নীতি।

তিন. অবস্থা ও প্রয়োজনের ধরন ও চরিত্রের ব্যাপারে বিরোধ এবং তাকে কোনো মূলনীতির আওতাধীন করা না করার মধ্যে বিরোধ।

চার. প্রমাণ উপস্থাপন ও মাসায়েল উদ্ভাবনের পদ্ধতি সমূহের মধ্যে বিরোধ।

পাঁচ. পূর্ববর্তী শরীয়ত। কোথাও কোনো শরীয়তের বাকি আহ্‌কাম মজুদ ছিল। আবার কোথাও কারোর ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ছিল।

ছয়. 'উরফ ও রেওয়াজের মধ্যে বিরোধ।

সাত. দেশজ আইনের মধ্যে বিরোধ।

মোটকথা এইসব কারণে বিভিন্ন ফকীহের বিভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারোর মাযহাব খতম হয়ে গেছে। কারোর উন্নতির গতিধারা শ্লথ থেকেছে। আবার কারোর অনেকের বেশী উন্নতি সাধিত হয়েছে। এভাবে অনেক ফকীহ্‌কে বাস্তব প্রয়োজনের বেশী মুখোমুখি হতে হয়েছে। অনেককে কম মুখোমুখি হতে হয়েছে। আবার অনেক মুখোমুখি হতে হয়েছে একেবারেই সামান্য। যদি সাধারণভাবে তাদের সরাসরি আইনের বাস্তব প্রয়োজনের মুখোমুখি হতে হতো তাহলে নিশ্চিতভাবে সামগ্রিক ফিক্‌হের মধ্যে বর্তমানের চাইতে বেশী ব্যাপকতা থাকতো। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. প্রমুখের কিতাবুল খারাজ ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তাছাড়া পূর্ববর্তী ফকীহগণের মধ্যে যে পরিমাণ ব্যাপকতা পাওয়া যায় পরবর্তীগণের মধ্যে বিভিন্ন কারণে তা অনুপস্থিত দেখা যায়।

মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ পরস্পর বিরোধী ছিলেন না

সবশেষে মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কাজের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্যটাও অনুধাবন করা উচিত। এভাবে উল্লিখিত মতবিরোধ অনুধাবন করা সহজ হবে। আসলে এই দল দু'টি পরস্পরের প্রতিযোগী ও বিরোধী ছিল না। বরং তাদের কাজের ধরনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। এক দলের সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ফিক্‌হের বিন্যাস ও লিপিবদ্ধ করার কাজে। অন্যটির কাজ ছিল হাদীসের

www.pathagar.com

সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা। তাই অনিবার্যভাবে আহকাম ও মাসায়েল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এক পর্যায়ে পার্থক্য দেখা দেয়। কিন্তু এমন একজন ফকীহও নেই যিনি সহীহ্ হাদীসের উপস্থিতিতে এবং তার কাছে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তা পৌঁছে যাবার পরও নিজের রায় ও ইজতিহাদকে তার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। অনুরূপভাবে এমন কোনো মুহাদ্দিসও নেই যিনি অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হুকুম আহকাম ও সমস্যার সমাধান বের করেননি। অবশ্য ফকীহ্ নিজের নির্ধারিত নিয়ম ও মূলনীতির আওতায় সমস্যার সমাধান বের করার জন্য অনুসন্ধান চালান। অন্যদিকে মুহাদ্দিস উপরের কোনো সনদ ও হাদীসের মাধ্যমে তার জবাব দেন। মুহাদ্দিসের সামনে যেহেতু অন্যান্য রায়গুলো অনেকটা রুদ্ধ তাই অনিবার্যভাবেই রেওয়ায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি হন ব্যাপক উৎসাহের অধিকারী। অন্যদিকে ফকীহের সামনে অন্যান্য রায়ও ছিল তাই তিনি বেশী যাচাই বাছাই করে রেওয়ায়াত গ্রহণ করেন।

মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি

এ ছাড়া উভয়ের মেজাজ ও প্রকৃতিতেও পার্থক্য রয়েছে। একজনের ওপর থাকে বর্ণনা পরম্পরার প্রাধান্য এবং অন্যজনের ওপর থাকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের প্রাধান্য। অবস্থা ও মাসায়েল নির্ণয়ের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। যেমন, সুন্নাত থেকে মাসায়েল উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে ফকীহগণ এর থেকে যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন কিনা এবং সাহাবাগণের আমল প্রতিষ্ঠিত কিনা মুহাদ্দিসগণ এর কোনো পরোয়া করেন না। মোটকথা হাদীসের উপস্থিতিতে মুহাদ্দিস কোনো সাহাবীর উক্তি এবং কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না। তবে যদি চরম প্রচেষ্টা চালাবার পরও কোনো নির্দেশ না পাওয়া যায় তখন তিনি সাহাবা ও তাবেঈগণের উক্তির প্রতি নজর দেন। তার মধ্যেও তারা কোনো শহর বা কোনো শ্রেণীর বিশেষত্বের কথা ভাবেন না। তবে উক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তারা তারই উক্তিকে প্রাধান্য দেন যিনি বেশী জ্ঞান রাখেন, বেশী আল্লাহকে ভয় করেন, বেশী স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও বেশী পরিচিত।

যদি উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে কোনো রকমে কার্যোদ্ধার হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে কুরআন ও সুন্নাতের হুকুমের ব্যাপকতা থেকে ইকতিযা (উপযোগিতা) ও কিনায়াহ (ইঙ্গিত)-এর পদ্ধতিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক অবস্থা সৃষ্টি করেন। অথবা নতুন সমস্যা হলে তার সমাধান অনুসন্ধান করেন। এতেও কাজ না হলে বাধ্য হয়ে কোনো সদৃশ বিষয়ে সরাসরি দৃষ্টিপাত করে অনুরূপ হুকুম জারী করেন। কিন্তু ফকীহ্গণের নির্ধারিত উল্লিখিত কিয়াসের ফিক্হভিত্তিক নীতি-নিয়ম তারা মেনে চলেন না।

www.pathagar.com

হাদীস লিপিবদ্ধ হওয়ায় একটি বড় ফিতনার দ্বার রুদ্ধ হয়েছে

মুহাদ্দিসগণ হাদীস লিপিবদ্ধ করার কারণে মুসলিম উম্মাহ্ সেসময় একটি বড় ফিতনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। রায় ও বুদ্ধিবৃত্তির দরজা খুলে দেয়ার পর তাকে নিয়ম-কানুনের অনুগত করা বড় কঠিন ছিল। উম্মতকে ভারসাম্যের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল যারা বুদ্ধিবৃত্তি ও রায়ের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরোধিতা করবে এবং সীমিত পদ্ধতিতে বুদ্ধি ও রায়ের ওপর নির্ভর করে কাজ চালিয়ে দেয়া যায়, একথা বাস্তবে প্রমাণ করে দেবে।

মুহাদ্দিসগণ যে সুউচ্চ হিম্মত ও উন্নত হৃদয়বত্তার সাহায্যে হাদীস লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেন ইতিহাসে তার কোনো নজীর নেই। মূলত এটি ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি ব্যবস্থা। আল্লাহ্‌ই তাদের একাজে নিয়োজিত করেন। তাদের প্রচেষ্টা ও সাধনার বদৌলতে এমন ধরনের বহু হাদীসও লিপিবদ্ধ হয়ে সাধারণ্যে পরিচিত হয়ে গেছে যেগুলো কোনো কোনো ফকীহ্‌র কাছে পৌঁছেনি অথবা যেগুলোর দিকে বেশী দৃষ্টি দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে যারা অনুসন্ধানী গবেষক ছিলেন তারা হাদীসবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ দান করেন। তার নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করেন। হাদীস যাচাই ও পর্যালোচনা করার পদ্ধতি চিহ্নিত করেন। হাদীসের স্তর বিন্যাস করেন। এসব আলোচনা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পর্যায়ের। এগুলো অধ্যয়ন করার পরই কেবল মানুষ এর সৌন্দর্য ও মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবে।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

তাফসীর

০১. আবু মুহাম্মদ রোযবাহান বিন আবী নাসব আল-বাকলী আশ-শীরানী আস-সূফী, আরা য়িসুল বায়ান ফী হাকায়িকিল কুরআন

০২. হাফেয আবুবকর জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর আস-সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১হিঃ), আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, আল-মাকতাবাতুত্ব তুজ্জারীয়া, মিসর

০৩. আবুল কাসেম মাহমূদ ইবনে উমর আল-খাওয়ারিযামী আয-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হিঃ), আল-কাশশাফ আন হাকায়েকিত তানযীল ও উয়ূনিল আকাবীল ফী উজূহিত তাবীল, মাতবাআতুল লাইসী, কতিকাতা, ১২৭৬ হিঃ

০৪. আল-কাযী নাসিরুদ্দীন আল বায়যাবী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তাবীল, মাতবা আহমদী, দিল্লী, ১২৬৮ হিঃ

০৫. আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, আল-মাতবাআতুল বাহীয়াহ, মিসর, ১৩৪৭ হিঃ

০৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর আল আনসারী আল আন্দালুসী আল কুরতুবী, আল'জামি' লি আহকামিল কুরআন, দারুল কুতুব আল মিসরীয়া, কায়রো, ১২৫২ হিঃ

০৭. ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব (আত তাফসীরুল কাবীর), আল-মাতবা'আতুল আসেরাতুশ শারফীয়া, মিসর, ১২২৪ হিঃ

০৮. নিআমুল কুরআন

০৯. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তরজুমানুল কুরআন

হাদীস ও ভাষ্যগ্রন্থ

০১. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু ইবনি কাছীর, বৈরূত, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.

০২. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনি ঈসা আত-তিরমিযী, আস-সুনান, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা.বি.

www.pathagar.com

০৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনি ইয়াযিদ, আল-কাযভীনী, আস-সুনান, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, দারুল ফিকর, বৈরূত

০৪. আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমাদ আত-তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, আল-মুসিল, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি.

০৫. আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান আদ-দারিমী, আস-সুনান, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হি.

০৬. আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরূত, ১৪১০ হি.

০৭. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আল-মুসনাদ, মুযাসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরূত, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি.,

০৮. মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর, জামিউল উসূল ফী আহাদীছির রসূল, মাকতাবাতু দারিল বায়ান, ১৩৮৯ হি./ ১৯৬৯ খ্রি.,

০৯. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খাতীব আত-তিবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.,

১০. আবূ বকর আব্দুর রাযযাক ইবনু হুমাম আস-সানসানী, আল-মুসান্নাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত, ১৪০৩ হি.

১১. আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ আল-হানাফী আয-যায়লাঈ, নাসাবুর রায়া লি আহাদীছিল হিদায়াহ, দারুল হাদীস, মিসর, ১৩৫৭ হি.

১২. আবুল হাসান আলী ইবনু ওমর আদ্‌দারাকুতনী, দারা কুতনী

১৩. ফাতহুল মুলহিম বি-শারহে সহীহ মুসলিম

১৪. তরজুমানুস সুন্নাহ

ফিকহ ও আইন

০১. হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হিঃ), আল আশবাহ ওয়াল নাযাইর, মক্কা ও মিসরের বিভিন্ন প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত

০২. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবী সাহল আস-সারাখ্‌সী (মৃত : ৪৮৩ হিঃ), আল-মাবসূত, মাতবা সা'আদাহ, কায়রো, ১৩২৪ হিঃ

০৩. ইবনে কাউয়্যিম শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ওরফে ইবনে কায়্যিম আল-জওযী, ইলামুল মুআককিঈন আর-রাব্বিল আলামীন, আশরাফুল মাতাবে দিল্লী, ১৩১৪ হিঃ

www.pathagar.com

০৪. সপ্তদশ শতকে বাদশাহ আলমগীরের নির্দেশে হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে রচিত, ফাতাওয়া আলমগীরী

০৫. মুহাম্মদ আমীন ওরফে ইবনে আবেদীন, রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার, মাতবাআ উসমানীয়া, মিসর, ১৩২৭ হিঃ

০৬. খুসূসী কানুনে রূমা

০৭. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ

০৮. কিতাবুল আমওয়াল

উসূলে ফিকহ্

০১. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মূসা আশ-শাতিবী, আল-মাওয়াফিকাত ফী উসূলিশ শরীয়াহ, আল-মাতবাআতুর রহমানীয়াহ, মিসর থেকে শায়খ আবদুল্লাহ দাররাজের টীকা ও সংযোজন সহকারে মুদ্রিত

০২. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ শাওকানী (১২৫০হিঃ), ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসূল, মাতবাআতুস সাআদাহ, মিসর, ১৩৩৭ হিঃ

০৩. আশ-শায়খ আহমদ ওরফে মোল্লা জীয়ূন, নূরুল আনওয়ার

০৪. নিযামুদ্দীন আল-আনসারী, শারহে মুসাল্লামুস সুবুত, মাতবায়া আমীরীয়া, মিসর, ১৩২২ হিঃ

০৫. শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরাহ (১৯৮৫ ঈসায়ী), উসূলিল ফিকহ, মিসর থেকে ১৩৭৭ (১৯৮৫ঈঃ) সনে প্রকাশিত

০৬. স্যার জন্ সামনড, উসূলে কানূন

০৭. ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আশ-শাফী, উসূলুশ শাশী

০৮. সাদ্দুদ্দীন তাফতাযানী, আত তালবীহ্ শারহুত তাওযীহ্

০৯. আল্লামা মুহাম্মদ আমীন ইবনু উমর আফিদি ইবনু আবিদীন, নাশরুল উরফ ফী বিনায়ি বাযিল আহকামি আলাল উরস

হিকমতে দীন

০১. শাহ্ ওলীউল্লাহ আশ শায়খ আহমদ আল মা'রূফ শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, আল-ইনসাফ ফী বায়ানে গায়াতে সাবাবিল ইখতিলাফ, ইউনিয়ন প্রিন্টিং প্রেস, দিল্লী

০২. শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজহিতাদি ওয়াত তাকলীদ

www.pathagar.com

০৩. শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ, ইউনিয়ন প্রিন্টি প্রেস, দিল্লী

ইতিহাস ও জীবনচরিত

০১. ইবনুল জওযী, কিতাবুল মানাকিব

০২. শায়খ মুহাম্মদ আল-খিদরী, তারীখুত্ তাশরীঈল ইসলামী, ১৩৫৮ হিঃ মিসর

০৩. জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনু আবু বকর আসসুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা

০৪. উবাইদুল্লাহ আস-সিন্ধী (১৮৭২-১৯৪৪ খ্রি.), আত-তামহীদ লি-তা'রীফি আয়িম্মাতিত্ব তাজদীদ

০৫. শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খোলাফা

অভিধান

০১. আবুল কাসেম হুসাইন মুহাম্মদ ওরফে রাগিব আল-ইসফাহানী (৫০২ হিঃ), মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন

০২. জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে মনযূর আল আকিকী (৬৩০-৭১১ হিঃ), লিসানুল আরব, ২০ খণ্ডে মিসর থেকে প্রকাশিত

অন্যান্য

০১. আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল গাযালী, ইহ্য়া-উ উলূমিদ দীন, দারুল কুতুবিল আরাবীয়াতুল কুবরা, মিসর, ১৩৩৪ হিঃ

০২. আল-কাযী নাসিরুদ্দীন আল বায়যাবী, মিনহাজুল উসূল

০৩. আত-তাকরীর ওয়াত তাজীর

০৪. আবু ইসহাক আশ-শাতিবী, আল-ই'তিসাম

০৫. আল মীযান

০৬. জামে আহলিল ইলম

০৭. তাহযীবুল আখলাক

০৮. বাহরুল উলূম

০৯. হুসামী

১০. শারহে তওহীদ

১১. ইবনে আবেদীন, মাজমুআয়ে রাসায়েল

১২. উর্দূ মাসিক পত্র, ইসলামী কানুন নম্বর মাসিক্‌ চেরাগে রাহ, করাচী

www.pathagar.com

Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
55/B, Purana Paltan, Noakhali tower, suite-13/B, (12th Floor), Dhaka-1000
Phone : 9576762, Mobile : 01761-855357